Vol. 4 | No. 1 | 1960

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

মুসলিম কবির পদ-সাহিত্য

Volume	4
Issue	1
Year	1960
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	আহমদ শরীফ
Published online	June 15, 1960
DOI	10.62328/sp.v4i1.4
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v4i1.4
Pages	101-304
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

মুসলিম কবির পদ-সাহিত্য

Check for updates

॥ সূচীপত্র ॥

প্রথম চরণ	পদকার	ক্রমিক সংখ্যা
॥ রূপ ॥		
দেখ সখি তরুমূলে ঐ না নাগর রে	নাসির মোহাম্মদ	১
হের হো নিলগিরি রাজহি	সালেহ বেগ	২
নাগরী, নাগরী, নাগরী	ঐ	৩
সই দেখরে রঙ্গ কেলি	সৈয়দ আইনুদ্দিন	৪
খোস না লাগে মোর গৃহের বেভার	ঐ	৫
বিনোদিয়া জলদ-বরণ কালা গো সই	ঐ	৬
হালিমা তুয়া বর ভাগ্য এ বিশেষ	খান গয়াস	৭
দেখ সখি ও নাগর মন মোহনিয়া	নজর মোহাম্মদ	৮
বাহির হইয়া দেখরে রাধা বিনোদ রাঁয় সাজে	গয়াস	৯
হরির অরিপতি তাহান সন্ততি	মোহাম্মদ পরাণ	১০
হের দে কালারে নয়ন ভরিয়া রূপ দেখি	রেয়াছক	১১
ওকি অপরূপ পেখিলুঁ বিপিন মাঝে	মোহাম্মদ	১২
মধুর মুররী ধ্বনি শুনিতে সুস্বর	মোহাম্মদ হানিফ	১৩
দেখ সই অপরূপ নন্দ গোপাল	ফকির হবিব	১৪
সখি দেখ নাগর ব্রজরায়	অজ্ঞাত	১৫
ধনি ধনি সুবদনী কর অবধান	ঐ	১৬
গা তোল গা তোল হরি জীবন আমার	ঐ	১৭
কেন আইলাম জলে সখি রে	ঐ	১৮
এথানে রহিও রাধা এথানে রহিও	ঐ	১৯
কংসশুর রাজভগ্নী তোমার নেতের অঞ্চলে	ঐ	২০
সখি প্রাণি হরিয়া নিল কানাইয়া	ঐ	২১
চলি গেল রসবতী ভেটিবারে শ্যাম	ঐ	২২
সখি সুন্দরি ও আস্থিক মঙ্গল দাতা	ঐ	২৩
অকি অপরূপ রূপের রমনী ধনি ধনি	শেখ কবীর	২৪
কালারূপ কেন উপজিল গোকুল কুলে	সৈয়দ মর্তুজা	২৫
না জানি ওরে গুণনিধি	ঐ	২৬
ভুবন মোহন রূপ অতি মনোহর	ঐ	২৭

প্রথম চরণ	পদকার	ক্রমিক সংখ্যা
বসে ঠামে ঠামে কে বলে কালিয়া ভোলা অন্তরে	সৈয়দ মর্তুজা	২৮
শ্যাম, আন না লয় মনে	ঐ	২৯
দারুণ কালা সবে বলে কালা কালা	ঐ	৩০
রাধা মাধব নিকুঞ্জ বনে	মীর ফয়জুল্লাহ্	৩১
দেখ সখি শ্যাম মোহনিয়া	ঐ	৩২
কত কত মোহন মোহনি জান	সৈয়দ সুলতান	৩৩
সইগণ বড় অপরূপ সাজে	আলাওল	৩৪
একি যিতা কি কহব মুই তুঝে ঠাম	ঐ	৩৫
না ল সজনি সই তুঝে বলম মুই নাকো	ঐ	৩৬
কালিয়া নাচেরে রমণী সমাজে ভাল	মীর্জা কাঙ্গালী	৩৭
নাচে কানু ঘুমি ঘুমি রমনীর সমাজে	মনোহর	৩৮
দেখরে সই কালিন্দীর কিনারে শ্যামরায়	অজ্ঞাত	৩৯
চলত রাম সুন্দর শ্যাম	নাসির মামুদ	৪০
ছোট না রাধিকা ভরণ কলসী	আলি মিয়া	৪১
কোন্ রসবতী লাগি চলিছ সাজিয়া	অজ্ঞাত	৪২
জয় জয় রাধে গোপাল গোপাঙ্গনা রে	সালেহ বেগ	৪৩
বিনোদিনী সাজিছে কতেক ভাতি	অজ্ঞাত	৪৪
বিনোদিনী ঐ সে কালিয়া কানু	ঐ	৪৫
কি রূপ দেখিলুম আজু গোপ শিরোমণি	নাসির মোহাম্মদ	৪৬

॥ অনুরাগ ॥

মুঞি কেনে পিরীতি রে কৈলুঁ	সৈয়দ মর্তুজা	৪৭
মজাইলুঁ রে জাতি রসিয়া নাগরের হাতে	ঐ	৪৮
প্রাণি হরি নিল কানাইয়া	ঐ	৪৯
হেলায় হারাইলুম বনমালী	ঐ	৫০
সুন্দরি, তুমি নাগর ভুলাইতে জান	ঐ	৫১
শ্যাম বন্ধু চিত নিবারণ তুমি	ঐ	৫২
বন্ধু আমার কালিয়া সোনা	ঐ	৫৩
দেখ সই কালিন্দী কিনারে শ্যাম রায়	ঐ	৫৪
আজু মুই কুলের বাহির হৈলুঁ	ঐ	৫৫
সখি নাগর কানাই বিনে আর জীব না	ঐ	৫৬

প্রথম চরণ	পদকার	ক্রমিক সংখ্যা
শ্যামল সুন্দর তনু দেখিলুঁ স্বপনে	সৈয়দ মর্তুজা	৫৭
সই বোলম মুই জীব না রে	সৈয়দ সুলতান	৫৮
সজনি সই কানু সে প্রাণ ধন মোর	মীর্জা ফয়জুল্লাহ্	৫৯
চল দেখি গিয়া রূপবন্ধু চল দেখি গিয়া	ঐ	৬০
রাই রাই কর অবধান	মীর ফয়জুল্লাহ্	৬১
ননদিনী ওরে রস বিনোদিনী	আলাওল	৬২
কি দেখিলাম যমুনার ঘাটে	ঐ	৬৩
রূপের নিছনি যাই	সৈয়দ আইনুদ্দিন	৬৪
আল রে মুই রূপের নিছনি মরি যাই	সৈয়দ নাসিরুদ্দিন	৬৫
আল রে পরাণের পোতলি	নাসিরুদ্দিন	৬৬
বন্ধুয়া মোর পরাণের পরাণ	আইনুদ্দিন	৬৭
আগ রাই কি করিমু রে	ঐ	৬৮
আগো সই, কি দেখিয়া কি শুনিয়া	আম্মাণ	৬৯
ওকি হালি ঢলি পড়ে রাধে	মনোহর	৭০
রৈয়া রৈয়া উঠে মনে ওহি বিনোদিয়া	ঐ	৭১
আজু সই কি দেখিলুঁ স্বপনে	ঐ	৭২
ওগো সখি, মুই কেন আইলাম জলে	ফাজিল নাসির	৭৩
হামো নারী অতি হরি-প্রেমের দাস	আলি রজা	৭৪
সই সই কহিতে থাঁথার পিয়ার বেভার	সিরতাজ	৭৫
কেন রে যমুনা আইলুম জল ভরিবার	নাসির মোহাম্মদ	৭৬
রাখিমু তোরে হিয়ার মাঝারে	চম্পা গাজী	৭৭
রাধার ভাবে কানুর মন	চাঁদারু	৭৮
কেনে রাধার বন্ধু ডাক মোর নাম ধরি	গয়াস	৭৯
শ্রীমুখ দহে বিরহ আগুনি	মোহাম্মদ হাসিম	৮০
মুরলী আনিয়া দেয় রাই মোরে	আবাল ফকির	৮১
আগ সই কানুর লাগি প্রাণ মোর কান্দে	নব বালক	৮২
আগ সই কি করি কোথায় যাইমু	অজ্ঞাত	৮৩
কার ঘরের রসবতী জলে নামিয়াছ	ঐ	৮৪
নিত্য নিত্য যাচ রে ভোমরা	ঐ	৮৫
শ্যাম বন্ধু মোর আয় রে আয়	ঐ	৮৬
সজনি বোল এমন হৈল বা কেনে	ঐ	৮৭

প্রথম চরণ	পদকার	ক্রমিক সংখ্যা
সোনা বন্ধুরে ওরে আমার প্রাণের ধন	অজ্ঞাত	৮৮
সজনি সই বন্ধুয়া বোলিমু কোন্ লাজে	ঐ	৮৯
শ্যাম বন্ধুরে হৃদে থাকি দেখা না দেও মোরে	ঐ	৯০
কেনে পরিহার প্রভু আপনার দাসী	বোলন	৯১
কে রে কে রে তরুয়া কদম্বতলে কে রে	অজ্ঞাত	৯২
সোনা বন্ধুর লাগিয়া সদায় পোড়ে হিয়া	ঐ	৯৩
রাধা কানু নিকুঞ্জ মন্দির মাঝে রে	ঐ	৯৪
সখিগণে লয়ে সঙ্গে রাধিকা চলিলা রঙ্গে	মোহাম্মদ আলি রজা	৯৫
প্রাণে ধৈরজ না মানে	কমর আলি	৯৬
চাহিলে না প্রাণ কেন আমার দহিছে জীবন	এবাদত	৯৭
ওগো সই, কে বলে কালিয়া সোনা	সৈয়দ মর্তুজা	৯৮
কেনে আইলুম যমুনার জলে	মির্জা কাঙ্গালী	৯৯
ওহে প্রাণনাথ মোরে নিদয়া হৈও না	এবাদত	১০০
পহুঁ মাধব পরিহর কৈতব বাদে	অজ্ঞাত	১০১
হাসিয়া বোলান দিতে অরে সোনার বন্ধু	ঐ	১০২
আমার কাঁচা সোনা রে	ঐ	১০৩
আল সজনি তরু অবলম্বনে কে	আলাওল	১০৪
॥ বংশী ॥		
বাঁশী বাজান জান না	চাঁদ কাজী	১০৫
নাগর যায় রে রাধার মন্দিরে	সৈয়দ মর্তুজা	১০৬
জানি জানি আগ রাই	ঐ	১০৭
বন্ধু মোরে ছুঁইওনা ছুঁইওনা রে	ঐ	১০৮
সজনি গো সই তুমি কি আমারে বোল	ঐ	১০৯
তোর নি বাঁশীর রব শুনি গো কালা	ঐ	১১০
রে শ্যাম তোমার মুরলী বড় রসিয়া	ঐ	১১১
ধাম না সহে সজনি রে	আফজল আলি	১১২
হা হা রে বন্ধুর বাঁশি চিকণ কাঁসি	আলাওল	১১৩
শ্যাম অঙ্গে বংশী রব হে অমিয়া তরঙ্গ	ঐ	১১৪
চলহ সখি নাগরী মান তুমি পরিহরি	নাসির মোহাম্মদ	১১৫
আ লো সজনি ও কে মুররী বাজায়	নাসির	১১৬
যশোয়া মাতা নিরোধ নন্দন আপনা	আইনুদ্দিন	১১৭

প্রথম চরণ	পদকার	ক্রমিক সংখ্যা
বদলে থুইয়া যাও বাঁশী রে রাধার বন্ধু	মীর্জা কাঙ্গালী	১১৮
বন্ধুয়া বলিমু কোন্ লাজে রে সজনি সই	মনোহর	১১৯
হরিয়া লই গেল জাতি কুল	আলী রজা	১২০
বংশী স্বরে পুরে যন্ত্র রাধা হৃদান্তরে	ঐ	১২১
বনমালী শ্যাম তোর মুররী জগপ্রাণ	ঐ	১২২
রাধা কানু সর্বতে বিলাসি	ঐ	১২৩
গোপী-শ্যাম প্রেমের রসাগার	ঐ	১২৪
কানু বিনে রাধার না লয় আন চিত	ঐ	১২৫
না জানোঁ না চিনোঁ কেবা যমুনার কুলে	মোহাম্মদ হাসিম	১২৬
কৈলে বঁধুর কথা কৈও	এর্শাদুল্লাহ	১২৭
ও মন দেখ রে সতত মুরলী ফুকে কে	সর্ফতুল্লাহ্	১২৮
শ্যামের মুররী আকুল কৈল রে	জীবন	১২৯
দেখা দিয়া জুড়াও পরাণ	বদিয়ুদ্দিন	১৩০
কহ সখি জীবনের উপায় রে	অজ্ঞাত	১৩১
বিনোদ কানাই শ্রীবৃন্দাবনে কানু গো রে	ঐ	১৩২
না বাজাইও না বাজাইও বাঁশি রে মুরারি	ঐ	১৩৩
শ্যামের বাঁশীএ মান রবে না	ঐ	১৩৪
নিকুঞ্জ বনে বাঁশী বাজিল	ঐ	১৩৫
প্রাণের সজনি সই রে	ঐ	১৩৬
জলে যাইও না যাইও না রাধা	ঐ	১৩৭
রূপ দেখি কেবা যাইব ঘরে	মোহাম্মদ হাসিম	১৩৮
॥ আক্ষেপ ॥		
ও কুলের বধুরে	সৈয়দ মর্তুজা	১৩৯
আহা রে যৌবন ফুল বৃন্দাবন	নাসিরুদ্দিন	১৪০
আ লো সজনি ঘরে গিয়া কি বোল বুলিমু	নাসির	১৪১
নাগর কানাই রে	মুহম্মদ আলি	১৪২
সোনা বন্ধুর কি হৈল বেয়াধি	সৈয়দ মর্তুজা	১৪৩
বল দেখি কি বুদ্ধি করিব	নাসির মাহ্মুদ	১৪৪
আরে মোর একি পরমাদ হইল	ফতন	১৪৫
কি করিল সখি সবে মোরে নিদে	লাল বেগ	১৪৬
ও সই করি হাউসে পিরীতি	ঐ	১৪৭

প্রথম চরণ	পদকার	ক্রমিক সংখ্যা
কালা চান্দে আকুল কৈল	কমর আলি	১৪৮
হায় রে মরি রে প্রেমের যন্ত্রণা	ঐ	১৪৯
ফুলের মালা গলেরে চম্পার মালা দোলে	হাসিম	১৫০
ভ্রমে অভাগিনী না চাহিলাম গুনমণি	শমসের	১৫১
ওরে প্রেম-তুফানে পড়ি আমার প্রাণ গেল	অজ্ঞাত	১৫২
লালসা দি যৌবন লুটিল	কমর আলি	১৫৩
প্রাণি মোর কান্দে	আলী রজা	১৫৪
প্রেম-নগরে আমারে লোকে বলে কলঙ্কী	অজ্ঞাত	১৫৫
॥ দান ॥		
আ ল সইরে চলিলুম হাটের কারণ	ঐ	১৫৬
চিকণ নাইয়া কানাইয়া রে পার কর তুমি	ঐ	১৫৭
বন্ধু বিনে না রহে জীবন	গয়াস	১৫৮
অকি সই না লো সই	মনোহর	১৫৯
পন্থ ছাড় হাটে যাই নিলাজ কানাই	শেখচান্দ	১৬০
মথুরার বাজারে যাই	মোসন আলি	১৬১
জাগ চল ঘরে যাই রে সুন্দরী রাধে	অজ্ঞাত	১৬২
সজনি সই কেনে আইলুঁ যমুনার ঘাটে	ঐ	১৬৩
আইস কদম্ব তলে বৈস বিনোদিনী রাধা	ঐ	১৬৪
॥ নৌকা ॥		
পার কর পার কর মোরে নাইয়া কানাই	সৈয়দ মর্তুজা	১৬৫
না যাইমু মুই মথুরার হাটে	পীর মো:হাম্মদ	১৬৬
ধীরে ধীরে নীরে কর পার	ছলা মিয়া	১৬৭
না যাইমু রে মুঞি মথুরার হাটে	অজ্ঞাত	১৬৮
॥ অভিসার ॥		
বিনোদ আজু যাও ঘর	সৈয়দ আইনুদ্দিন	১৬৯
নাইহরের বন্ধু রে দেখি আজু কেনে মান	ঐ	১৭০
কালা রে মোর মনোহর রসের গুণনিধি	ঐ	১৭১
কালা মনোহর বন্ধু রস গুণনিধি	সৈয়দ মর্তুজা	১৭২
এত রাতে কেন রাজ পন্থে রে	অজ্ঞাত	১৭৩
আজ নিশি যাইমু বন্ধুর বাড়ি	ঐ	১৭৪

প্রথম চরণ	পদকার	ক্রমিক সংখ্যা
বন্ধুর ভাবে জাগিতে চাপিল কাল ঘুমে	সৈয়দ মর্তুজা	১৭৫
ধীরে ধীরে বাড়াও	ঐ	১৭৬

॥ মিলন ॥

ঝামর দেখি নন্দের কানাই	ঐ	১৭৭
মনেতে আনন্দ অতি ঘরে কেহ নাই	সৈয়দ সুলতান	১৭৮
আজু সুখের নাহি ওর	আলাওল	১৭৯
বৃন্দাবনে রাধা-কানু রঙ্গের রঙ্গিয়া	সৈয়দ আইনুদ্দিন	১৮০
সই দেখরে রঙ্গ কেলি	ঐ	১৮১
আজু ল পহুঁ দেখিয়ে আনন্দ চিত	মনোহর	১৮২
বরজ কিশোরী ফাগু খেলত রঙ্গে	কবীর	১৮৩
গোকুলে আজু আনন্দ অধিক ভেল	আসাউদ্দিন	১৮৪
নিশি হৈল শেষ রে প্রাণের বন্ধু	ফকির ওহাব	১৮৫
শরমে শরমে পলায়ে গেল	গরীব	১৮৬
আলো রাই সঙ্গে নিবা নি মোরে	গোলাম হোসেন	১৮৭
বায়ে সখিগণ বিবিধ বাজন	সালেহ বেগ	১৮৮
কালা চান্দ কালা চান্দ চিকণ কালিয়া	অজ্ঞাত	১৮৯
ঝলক নাচে মোর রঙ্গ শ্যাম	আলাওল খান	১৯০
দেখ সখি আজু নিশি রঙ্গ	অজ্ঞাত	১৯১
আঁখি যুগ প্রভাকর সুন্দর বদন	ঐ	১৯২

॥ সম্ভোগ ॥

দুরে থাকি বাজাও বাঁশি ঘরে বসে শুনি	অজ্ঞাত	১৯৩

॥ মান ॥

তোর শরীরে দয়া নাই	কমর আলী	১৯৪
হাসি বুলি কণ্ঠ ধরি বাড়াই মিছা পিরীতি	বকসা আলী	১৯৫
শ্যাম কি করব তোর পিরীতে	কমর আলী	১৯৬
বড় কঠিন তোর হিয়া	ঐ	১৯৭
বসন্ত আইল প্রাণের বৈরী তোর	হাসমত	১৯৮
কামিনী না কর গুমান ধনি	মছনতাজ	১৯৯
শ্যাম, এই আছিল তোর মনেতে	অজ্ঞাত	২০০
গেলা গেলা অরে শ্যাম না গেলা বোলাই	সৈয়দ মর্তুজা	২০১
শ্যাম মোর বন্ধুয়া না রে	ঐ	২০২

প্রথম চরণ	পদকার	ক্রমিক সংখ্যা
সবাই বলে রাধার পরাণ কানাই	শেখ ভিখন	২০৩
রে শ্যাম বিশেষ চাতুরী ছোড়	আফজল	২০৪
সই সই কহিতে খাখার প্রিয়ের বেভার	সিরতাজ	২০৫
কিরে শ্যাম, এমন উচিত নহে তোমার	মীর্জা কাঙ্গালী	২০৬
মরম দগধে প্রেমবাণে	সৈয়দ আইনুদ্দিন	২০৭
মুনি মন মোহনে মানিনী মনে	পীর মোহাম্মদ	২০৮
কার ঘরের নাগর তুমি কালিয়া সোনা	পোতন	২০৯
বন্ধু কি কাজ তোমার	অজ্ঞাত	২১০
সখী সব নিদে তু জাগাই কি করিব মোরে	ঐ	২১১
এবে শুনিয়াছি কানু আরের বন্ধু হইলা	ঐ	২১২
॥ বিরহ ॥		
মন মোর কি দিয়া বান্ধিমু	সৈয়দ মর্তুজা	২১৩
সখি নাগর কানাই বিনে	ঐ	২১৪
মালিনি রে লই যা রে তোর ফুল	ঐ	২১৫
আড়ালা চাউলের ভাত ক্ষীর নদীর পানি	ঐ	২১৬
দারুণ প্রিয় হামো না বানাএ	ঐ	২১৭
কি আজু কুদিন ভেলিএ	মর্তুজা গাজী	২১৮
পলকে সখি রে, নিশি না পোহায়	মর্তুজা আলী	২১৯
আর নিবা কি বন্ধু রে আর নিবা কি	সৈয়দ মর্তুজা	২২০
ভজ সখি নন্দ কিশোর	ঐ	২২১
সব ঋতু সঙ্গে আইল রস রঙ্গ সহিত	আফজল	২২২
প্রাণ সই কি কহব হাম হতভাগী	ফতে খান	২২৩
আহা কৃষ্ণ প্রাণনাথ কে নিল হরিয়া	মীর ফয়জুল্লাহ্	২২৪
আ লো সখি কহ মুঝে কৈসে মিলায়ব কান	আলাওল	২২৫
উদ্দেশ না পাইলাম বন্ধু করিবারে সেবা	গয়াস	২২৬
পবনা হে গমনেত না করিও বাধা	ঐ	২২৭
কিরূপে ধরাইমু প্রাণ প্রিয়া নাহি ঘরে	আইনুদ্দিন	২২৮
না দেখি রহিতে নারি ছট ফট করে হিয়া	ঐ	২২৯
মলয়ানিল বন্ধুতে কহিও পরণাম	ঐ	২৩০
অ, কি মাধব আর রোষ ক্ষেমা কর মোহে	মনোহর	২৩১
নিল মোর নাগর কে হরিয়া	ঐ	২৩২

প্রথম চরণ	পদকার	ক্রমিক সংখ্যা
আ লো রে পরাণের সই	মির্জা কাঙ্গালী	২৩৩
কে মিলাইবো কে মিলাইবো	আম্মান	২৩৪
শুন লো সজনি কিছুই না জানি	শেখলাল	২৩৫
বল কি উপায়, সই রে বল কি উপায়	নাসির	২৩৬
বোল কি উপায় সই রে	নাসির মোহম্মদ	২৩৭
যাই কোন্ ঠাঁই, সজনি সই	এতিম নাসির	২৩৮
আর মুই ন পাসরিতে নারি	ঐ	২৩৯
জীবের ধন, আমায় ছাড়ি গেলা	নাসির মাহমুদ	২৪০
কি হৈল আমারে বন্ধু কি হৈল আমারে	ফকির ওহাব	২৪১
সহিমু কত বিরহে আগুনি	মোহাম্মদ হাসিম	২৪২
আরে শ্যাম গেলা কোন্ দেশ	ঐ	২৪৩
অরে বন্ধু না চিনিলুঁ তোরে	কাসিম	২৪৪
কানুরে দেখিলা নি যাইতে	অনন্ত	২৪৫
শুন সখী সার কথা মোর	আলি রজা	২৪৬
বনমালি, কি হেতু রাধারে ভাব ভিন	ঐ	২৪৭
বাঁকা শ্যামেরে কেও	দানেশ	২৪৮
তুই বন্ধুর সুরতের বালাই লৈয়া	চম্পাগাজী	২৪৯
ভাবি মনান্তরে কিছুই না পাই রে	নুর মহম্মদ	২৫০
শুন প্রাণনাথ নিবেদন পদে	আলি রজা	২৫১
কেনে মোরে দিলি অপমান	কমর আলী	২৫২
আল সই প্রেম-আনলে দহে হৃদেতে	ঐ	২৫৩
কান্দি কান্দি বলিতেছে শ্রীমতি রাই	ঐ	২৫৪
সই বোল কি উপায়	আলাওল	২৫৫
ধনি ধনি চলিতে খঞ্জন ধরএ	অজ্ঞাত	২৫৬
কানু হে নিকুঞ্জ মন্দিরে আইস	ঐ	২৫৭
সাঁজ হৈল বেলা গেল প্রতি ঘরে বাত্তি	সৈয়দ সুলতান	২৫৮
শুন সই রে কাহে লাগি	তুফানুদ্দিন	২৫৯
প্রথম বৈশাখ রাধার মনে শোক	হাসিম	২৬০
এই মোর কপালে ছিল	আলিমুদ্দিন	২৬১
সহন না যায় দুঃখ	এবাদুল্লা	২৬২
কোথা গেলে কালা চান্দের দেখা পাইব	কমর আলি	২৬৩

প্রথম চরণ	পদকার	ক্রমিক সংখ্যা
শ্যাম বিনে আঁধার আমার হইয়াছে বৃন্দাবন	কমর আলী	২৬৪
দহে শ্রীরাধিকার প্রাণ	ঐ	২৬৫
বিরহের জ্বালায় মরি	ঐ	২৬৬
শ্যাম বিনে বাঁচে না আর অবলার প্রাণ	ঐ	২৬৭
কালাচান্দে আকুল কৈল	ঐ	২৬৮
দহে শ্রীরাধিকার প্রাণ	ঐ	২৬৯
প্রাণনাথ ব্রজে না পাইল	ঐ	২৭০
কেবা রস রঙ্গে রঙ্গে অঙ্গে অঙ্গে ডালে	অজ্ঞাত	২৭১
ওরে সোনা বন্ধুরে কইও ওই রাঙা চরণে	ঐ	২৭২
আমি প্রাণে যদি না মরি	ঐ	২৭৩
আইল বসন্ত ঋতু হে	ঐ	২৭৪
কৈও কৈও প্রাণ-ঋত রাধার সংবাদ	কমর আলি	২৭৫
ছি ছি চান্দের তুলনা	অজ্ঞাত	২৭৬
ডুবাই এ দুঃখিনীরে তোর মা এই দুঃখিনীরে	ঐ	২৭৭
সখি হে কি কহব হামো অবোধে	ঐ	২৭৮
মোর কালিয়া যায় রে নিদারুণ হৈয়া	ঐ	২৭৯
কত না সাধ হি মান	ঐ	২৮০
অ বন্ধুর লাগিয়া একেলা বসিয়া রৈমুঁ	ঐ	২৮১
বোল সখি আর নি এমন হৈবে	ঐ	২৮২
বন্ধু মোরে কি করিল রে	ঐ	২৮৩
॥ আত্মবোধন ॥		
নাইহরের বন্দা কি লৈয়া যাইমু	সৈয়দ মর্তুজা	২৮৪
ওকি নাগর কালা বিনে	মর্তুজা গাজী	২৮৫
সাঁই এক বিনে মওলা এক বিনে	সৈয়দ মর্তুজা	২৮৬
সোনা বন্ধুর এদেশে বসতি	ঐ	২৮৭
সাধ নাই রে সাধ, এ ঘরের বসতি আল্লা	ঐ	২৮৮
ভরা কুলায় রে পান্থুয়া নাও	ঐ	২৮৯
কাহে কাহে ধনি রাগ বানায়া	সুলতান	২৯০
হাম ভিখারি পঁহু পরম দেব দাতা	ঐ	২৯১
রে মন কত না কহিমু কাত নিবেদিমু	ঐ	২৯২
সাধুর ভরারে ডুবাইলুম মনের বেহার	ঐ	২৯৩

প্রথম চরণ	পদকার	ক্রমিক সংখ্যা
ওরে নিরঞ্জন জাতে দরবেশ	সৈয়দ সুলতান	২৯৪
কি দোষে ছাড়িয়া যাইবা	ঐ	২৯৫
কত কত মোহন মোহনী জান	ঐ	২৯৬
কত পদ্ম ফুল অন্ত নাই	ঐ	২৯৭
যাইবানি রে মন সাঁচানি রে মন	ঐ	২৯৮
জাগ জাগ অরে মজুরা কত নিদ্রা যাও	মীর ফয়জুল্লাহ	২৯৯
গুণের নিধি তুয়া বিনে আর নাহি জানি	অজ্ঞাত	৩০০
কে কে যাইবা যমুনার জলে কার সঙ্গে	সৈয়দ মর্তুজা	৩০১
ভঙ্গহোঁ নজর কর বদর দেওয়ান	অনন্ত	৩০২
রঙ্গের বারই আর মুরশীদ	অজ্ঞাত	৩০৩
আল্লা ভয়াব, ভাব করিম, রহিম	ঐ	৩০৪
আয় মুরশীদ দিল নাই তোর	ঐ	৩০৫
বন্ধুয়া মোর কালিয়া সোনা	ঐ	৩০৬
পিরীতি অমূল্য ধন এবে সে জানলুম সই	ঐ	৩০৭
হাম নারী অভাগিনী নিদের কাতর	ঐ	৩০৮
কোন্ বোধে উড়িমু নাথ রে	ঐ	৩০৯
সামাল কাল সাহা কাতাল ভূপাল	সৈয়দ আফজল	৩১০
মন চেতাও আপনা	সৈয়দ আইনুদ্দিন	৩১১
সই রে কতদিন জীবনা	ঐ	৩১২
জাগরে অবোধ মন জাগরে	ঐ	৩১৩
কি কর কি কর ভাই, অবোধ চরিত	ঐ	৩১৪
জ্বালাইয়া রাখ রে বাতি জীবা যতদিন	ঐ	৩১৫
সোনা বন্ধুরে আমার প্রাণ বন্ধু	চম্পা গাজী	৩১৬
জাগরে জাগরে প্রিয়া নিদের কাতর	ঐ	৩১৭
রে মোর বনবাসে বাস	নাসিরুদ্দিন	৩১৮
দিনে নিনে আইসে রে নাথ মোর	নাসির মহম্মদ	৩১৯
করিম রহিম তোর নাম রে আল্লা	এতিম কাসেম	৩২০
চাকরির নাই মোর সাধ	ঐ	৩২১
কতকাল রাখিমু ভাও দিয়া বাণিজের নাও	ঐ	৩২২
মোর পিয়া বিনায়া অতি বেদনি সই রে	ঐ	৩২৩
তুই যদি না দিস রে দেখা	বহরাম	৩২৪

প্রথম চরণ	পদকার	ক্রমিক সংখ্যা
আরে ভরিয়া সুবর্ণের ভরা	বদিয়ুজ্জমা	৩২৫
মন মোর জোড়ল এই না গৃহ আপ	মনোহর	৩২৬
সঙ্গে নিতে নারিমু তোরে	রজব আলি	৩২৭
আবের পত্তন ঘর খাকের বন্ধন	গোলাম হোসেন	৩২৮
নবীর কলেমা পড় মুখে, মোমিন ভাই রে	হাসমত	৩২৯
কোন ঘড়ি চাপিয়া নারে ঐ সে মরম ডরে	আসক	৩৩০
রহিয়াছে প্রভু করতার	ফকীর শাহ্‌	৩৩১
পড়েছি বিষম পাকে, তুই আঁখি মোর দেখে	নুর মহম্মদ	৩৩২
পরাণ বেদনি সই	আবদুল মালী	৩৩৩
চেতাও আপনারে মনাই	আব্বাস	৩৩৪
চল রে মুমিন ভাই রূপ দেখি গিয়া	সুন্দর ফকীর	৩৩৫
কৈ যায কৈ যায মুঞিরে ননদীর আগুনে	মোহম্মদ হাসিম	৩৩৬
তোমা নাম ঠাযে ঠাযে রে নাম	ঐ	৩৩৭
হৃদয়ের মাঝে মন-ভোমরা	ঐ	৩৩৮
কিরূপে যমুনা হৈমু পার রে প্রভু দীননাথ	ফুলামিঞা	৩৩৯
ফুনিয়া আখের ফানা	অজ্ঞাত	৩৪০
আর তরিতে উপায় নাই নবীজির পদ বিনে	এর্সাদুল্লাহ	৩৪১
ভাবে ভুলি রৈবা কতকাল অবোধ মন	ঐ	৩৪২
কিরূপে যমুনা হইমু পার প্রভু	অজ্ঞাত	৩৪৩
অ সই কি লইয়া যাইমু নিজ ঘর রে	ঐ	৩৪৪
মজিলে তিলেক না দেয় ঠাঁই	ঐ	৩৪৫
অরে সুজন নাইয়া	ফকির ভেলা শাহ	৩৪৬
পন্থ চিনি না রে আরে মনা	ঐ	৩৪৭
খেবা বাঁকা ধরে নৌকা	হজরত	৩৪৮
আল্লা অন্তকালে কি বোল বুলিম	মানিক দাস	৩৪৯
পিরীতি অমূল্য ধন	কমর আলী	৩৫০
এ পন্থ দি' গেলে বুঝি এয়ার পাওজা রে	হাসমত আলী	৩৫১
গর বাঁচুজা রে মন-চোর প্রাণ প্রেয়সি	ঐ	৩৫২
জাগ মন, আলস ছাড়িয়া	সর্ফতুল্লাহ	৩৫৩
পাষাণ মন যে তুমি আমার কথা ধর	মোহাম্মদ আলী	৩৫৪
ভবে আসি হইলাম অপরাধী প্রভু	ঐ	৩৫৫

প্রথম চরণ	পদকার	ক্রমিক সংখ্যা
মুরশিদ মনেতে বড় ভয় লাগে রে	অজ্ঞাত	৩৫৬
বিপথ লোক রে ধর্মপন্থ করিলা লোপ	নওয়াজিস	৩৫৭
নবীজি প্রভুরে কহিবা মোর লাগি	ঐ	৩৫৮
কহিতে দুঃখে ফাটে বুক	খলিল	৩৫৯
আগে করহ মন দেহের নিরূপণ	অজ্ঞাত	৩৬০
ও মন পাগলা রে	ঐ	৩৬১
॥ আত্মনিবেদন ॥		
ওরে পরাণ বন্ধু তুমি	সৈয়দ মর্তুজা	৩৬২
বিনোদ আমার বাড়ি ত আয়	ঐ	৩৬৩
আমি সে তোমার নাথ আমি সে তোমার	ঐ	৩৬৪
তোমার মনের কালি দূর করি	কমর আলী	৩৬৫
॥ প্রার্থনা ॥		
শ্যাম মোরে করিও দয়া	সৈয়দ সুলতান	৩৬৬
প্রভু দয়াল হের লো মোরে	আলাওল	৩৬৭
আয় দীন বন্ধু এ দুঃখ সিন্ধু	ঐ	৩৬৮
দীন বন্ধু, কর পরিত্রাণ	ঐ	৩৬৯
করুণা সাগর পীর বদর আলামি	এতিম নাসির	৩৭০
আয় মাধব নিবেদহোঁ তোহে	আফজল	৩৭১
মা আমারে অভয় দিলি না	আকবর আলী	৩৭২
করুণা দধি কালার বরণি শ্যাম কালি	আলি রজা	৩৭৩
ক্ষেম অপরাধীর সর্ব দোষ করিম দাতা	এর্শাদুল্লাহ	৩৭৪
ভকতি করিএ তুয়া পায় করিম রহিম	ঐ	৩৭৫
দয়া কর দয়াময় আমি পাপী অধীনেরে	মমতাজ	৩৭৬
পার কর মোরে কল্পতরু	অজ্ঞাত	৩৭৭
জগপতি সেবকেরে দেখ একবার	নওয়াজিস	৩৭৮
অনাথের নাথ রে পরকালে করিবা পার	ঐ	৩৭৯
॥ বাৎসল্য ॥		
দুখিনীর যাদু আয়	অজ্ঞাত	৩৮০
যাদবে দেখিলানি যাইতে রাখোয়াল সব	ঐ	৩৮১
হায়মো নিলক্ষিনীর প্রাণ যাদুয়া চান্দ রে	ঐ	৩৮২
নন্দ তুমি আগ বড় রাগিয়া	ঐ	৩৮৩

প্রথম চরণ	পদকার	ক্রমিক সংখ্যা
॥ বিবিধ ॥		
কৈল অন্ধকার মেঘে কৈল অন্ধকার	সৈয়দ মর্ত্তুজা	৩৮৪
নিদ্রা তেজি উঠ প্রভাতে মুমীন ভাইরে	এর্শাদুল্লাহ	৩৮৫
হরি মাধব হে সদায় মিনতি তুয়া পায়	অজ্ঞাত	৩৮৬
আহা রে মোহাম্মদ	ঐ	৩৮৭
জীউ জীউ মেরে মনচোর গোরা	শাহ আকবর	৩৮৮
পিরীতি অমূল্য ধন এবে সে জানিলুম	অজ্ঞাত	৩৮৯
মুমীন ভাইরে না কর বড়াই	নওয়াজিস	৩৯০
দয়াল বিধিরে পরকালে দেখাইবা দায়	ঐ	৩৯১
মুমীনগণ রে প্রভুর পদে ভকতি করিবা	ঐ	৩৯২
তোমার পদে লইলুঁ শরণ	ঐ	৩৯৩
দে দে নবনী দে খাই যশোয়া মা রে	অজ্ঞাত	৩৯৪
গা তোল পরাণের বন্ধু গা তোল জাগিয়া	ঐ	৩৯৫
জানিলাম জানিলাম বন্ধু	ঐ	৩৯৬
কি কহিব অয়ি সখি কালা গুণবিধি	সৈয়দ মর্ত্তুজা	৩৯৭
কেনে আ ল জলে রে	মীর ফয়জুল্লাহ	৩৯৮
যৌবন গেল মোর রে	সৈয়দ মর্ত্তুজা	৩৯৯
বিনোদ রায়, আর দিন আসিতে	অজ্ঞাত	৪০০
তুয়া বিনে আর নাহি জানি রে	সৈয়দ মর্ত্তুজা	৪০১
কোথায় রাখিমু লুকাইয়া রে	আলি রজা	৪০২

		পৃষ্ঠা
পরিশিষ্ট :—	ক রূপপ্রতীক	২৭২
	খ পদসংকলন গ্রন্থপঞ্জী	২৭৩
	গ পদকার পরিচিতি	২৭৬
	ঘ বর্ণানুক্রমিক পদ-সূচী	
	ঙ সংযোজন	

॥ গ্রন্থপঞ্জী ॥

[যে-সব গ্রন্থের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাহায্য নিয়ে ভূমিকা রচিত]

শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ—দর্শনে ও সাহিত্যে—ডঃ শশিভূষণ দাসগুপ্ত
Obscure Religious Cults as Background of Bengali Literature—ঐ
ভারতীয় সাধনার ঐক্য— ঐ
ভারতীয় দর্শনের ভূমিকা—ডঃ সুরেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত
বেদান্তদর্শন—ডক্টর রমা চৌধুরী
ভারতদর্শন সার—উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য
বেদান্ত দর্শন (১ম খণ্ড)—আশুতোষ শাস্ত্রী
লোকায়ত দর্শন—দেবী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
Post Chaitanya Sahajia Cults of Bengal—মণীন্দ্রমোহন বসু
The Theology and Philosophy of Bengal Vaisnavism—ডঃ সুশীলকুমার দে
The Vaisnava Faith & movement— ঐ
Vaisnavism, Saivism and minor Religious Systems—R. G. Bhandarkar
Muslim thought and its Sources—Syed Muzaffaruddin Nadvi.
Kashful Mahjub (tran.)—R. A. Nicholson.
The Doctrine of the Sufis—Arthur John Arberry.
প্রাচীন বাঙলা ও বাঙালী—ডঃ সুকুমার সেন
মধ্যযুগের বাঙলা ও বাঙালী—ঐ
বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড পূর্বার্ধ)—ঐ
মধ্যযুগে ভারতীয় সাধনার ধারা—ক্ষিতিমোহন সেন
জাতিভেদ— ঐ
মধ্যযুগে হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত সাধনা— ঐ
জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য—সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়
বাঙলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা— ঐ
ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ—ডক্টর সুশীল কুমার গুপ্ত
Influence of Islam on Indian Culture—Tarachand
বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত—অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
বাঙলার নবজাগৃতি—বিনয় ঘোষ
ভক্ত কবীর—উপেন্দ্র কুমার দাস
কীর্তন পদাবলী—অর্পণাদেবী ও সুধীরচন্দ্র রায়

পদকল্পতরু (১-৫ খণ্ড)—সতীশচন্দ্র রায়
অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী— ঐ
মুসলমান বৈষ্ণব কবি—রমণী মোহন মল্লিক
,, (১-৪ খণ্ড)—ব্রজসুন্দর সান্যাল
বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবি—যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য
বৈষ্ণব পদাবলী—খগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রমুখ সম্পাদিত (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)
বঙ্গে সুফীপ্রভাব—ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক
পুর্ব পাকিস্তানে ইসলাম— ঐ
মুসলিম বাঙ্গালা সাহিত্য— ঐ
পুথি পরিচিতি—আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ
বাঙলার বাউল ও বাউলগান—উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
Vaisnavism in South India—S. N. Ayenger
কলমী পুথির তালিকা—আলি আহমদ
আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের নানা প্রবন্ধ
তোহ্ফা—আলাউল—আহমদ শরীফ সম্পাদিত
সত্যকলি বিবাদ সংবাদ—মুহম্মদ খান—ঐ
নাথধর্ম ও সাহিত্য—প্রফুল্ল চরণ চক্রবর্তী
নাথ সম্প্রদায়ের ইতিহাস—দর্শনে ও সাধন প্রণালীতে—ডঃ কল্যাণী মল্লিক।
Materials for the study of the Early History of Vaisnava sect :
Dr. Hem Chandra Roy Chowdhury.

মুসলিম কবির পদ-সাহিত্য

ভূমিকা

॥ ১ ॥

বৈদিক তথা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম প্রবর্তিত ধর্ম নয়। নানা সময়ে বিভিন্ন কবি-রচিত কবিতা বা শ্লোকের ভাব নিয়ে গড়ে উঠা মত।[১] কাজেই ব্যক্তি-বিশেষের প্রবর্তিত ও প্রচারিত পৃথিবীর আর আর ধর্মের সঙ্গে এর মৌলিক তফাৎ রয়েছে। ব্যক্তি প্রবর্তিত ধর্মের প্রতিপাদ্য বিষয়ে এবং আদর্শে, উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্যে অসঙ্গতি কিংবা জটিলতা কম। কিন্তু বহু মনীষী-মতের সমবায়ে গড়ে উঠা ধর্মে জটিলতা থাকাই স্বাভাবিক। ফলে হয়েছেও তাই। আদি বেদের নাম ঋক্। বিভিন্ন কবির (কবি শব্দের অর্থ ক্রান্তদর্শী) কবিতা, কবিতাংশ ও শ্লোকের সংকলন গ্রন্থ এটি। কবিতা বা শ্লোককে বলা হয় মন্ত্র। আর কয়েকটি মন্ত্রের সমবায়ে গড়ে উঠে এক একটি সূক্ত, এই সূক্ত-সমষ্টিরই নাম সংহিতা। এ কারণে বেদের অপর নাম সংহিতা। ছন্দে রচিত বলে এর নাম ছন্দ এবং মুখে মুখে রচিত বেদ-কথা শুনে শুনে মনে রাখতে হতো বলে একে শ্রুতিও বলা হয়। পরে ঋগ্বেদকে দু'ভাগ করে পৃথক গ্রন্থ তৈরী হয়, ঋগ্বেদের গানের সংকলনকে বলে সামবেদ বা সাম সংহিতা আর যজ্ঞাদির বিধি-বিধানগুলোর সমষ্টিকে বলে যজুর্বেদ। অথর্ব বেদ মৌলিক রচনা এবং এটি ঋগ্বেদের অনেক পরে রচিত।

যজ্ঞাদির নিয়ম পদ্ধতির ব্যাখ্যা গ্রন্থকে বলা হয় ব্রাহ্মণ। এগুলো মুখ্যত গদ্যে রচিত। বানপ্রস্থ কালে অরণ্যবাসী ঋষিদের কাল্পনিক আচার অনুষ্ঠানগত ধ্যানের নিয়ম-নীতি সম্বলিত গ্রন্থকে বলে আরণ্যক। আর এই বৈদিক শাস্ত্রের স্বরূপ বিশ্লেষণ ও তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা মূলক গ্রন্থগুলোকে বলে উপনিষদ বা বেদান্ত। এগুলোও যুক্তি-তর্ক ভিত্তিক রচনা নয়—মূলত কাব্যই। পুরোনো বলে স্বীকৃত উপনিষদ এগারটি—ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মণ্ডুক, মাণ্ডুক্য, ঐতেরেয়, তৈত্তিরীয়, বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য ও শ্বেতাশ্বতর।[২] এ ছাড়া অর্বাচীন উপনিষদ বা বেদান্তের সংখ্যা বহু এবং রচনা কাল খ্রীষ্টীয় সতের শতক অবধি। উপনিষদের তাৎপর্য

১—২ ভারতীয় দর্শনের ভূমিকা—সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত পৃঃ ৬

সূত্রাকারে গ্রথিত করে এক গ্রন্থ লেখেন বাদরায়ণ (ব্যাস)। এ গ্রন্থের নাম ব্রহ্মসূত্র। এবং গীতাকেও উপনিষদের সারমর্ম অনুগ রচনা বলে স্বীকার করা হয়। গীতা কারো মতে মহাভারতেরই একটি অধ্যায়, আবার কেউ কেউ মনে করেন গীতা মূলত স্বতন্ত্র রচনা, পরে মহাভারতের সঙ্গে সংযোজিত হয়েছে। উপনিষদগুলো খ্রীঃ পূঃ সপ্তম বা ষষ্ঠ শতকে রচিত বলে অনুমান করা হয় আর গীতা খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম বা চতুর্থ শতকের এবং ব্রহ্মসূত্র খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের রচনা বলে বিশ্বাস করা হয়।[৩] গীতা এবং ব্রহ্মসূত্র থেকেই বেদান্ত দর্শনের শুরু। আট শতকের শঙ্করাচার্য, নয়-দশ শতকের ভাস্কর, বার শতকের রামানুজ, বার-তের শতকের নিম্বার্কাচার্য, তের শতকের মধ্বাচার্য, ষোল শতকের বল্লভাচার্য ও চৈতন্যদেব এই বেদান্ত দর্শনেরই মনোময় ব্যাখ্যার ভিত্তিতে নিজ নিজ মত প্রবর্তন ও প্রচার করেন। এ সব মত উত্তর মীমাংসা (বেদান্ত) শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

বেদবাক্যের পূর্বোক্ত তাত্ত্বিক আলোচনার নাম উত্তর মীমাংসা (বেদান্ত); আর যাগ-যজ্ঞাদির ফলাফল প্রভৃতি আচারিক দিকের আলোচনার নাম পূর্ব মীমাংসা। এগুলো ব্রাহ্মণের ভাষ্য স্বরূপ; জৈমিনি, শবরস্বামী, কুমারিল ও প্রভাকর এ ধারার শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা। তাঁদের পারস্পরিক মতে কিছু কিছু অনৈক্য আছে। মীমাংসার মত ব্রাহ্মণগুলোর আরো তিন শাখার আলোচনা-গ্রন্থ রয়েছে—শ্রৌতি-গৃহ্য ও ধর্মসূত্র। এগুলোর সাধারণ নাম স্মৃতি। এদের রচয়িতা অশ্ব, শঙ্খ, বুধ প্রভৃতি। কাজেই স্মৃতিও পূর্ব মীমাংসা শ্রেণীর গ্রন্থ। আর স্মৃতি শাস্ত্রই ব্রাহ্মণ্যবাদীর আচারিক ধর্ম নিয়ন্ত্রণ করে। বৈদিক আর্য ধর্ম ও দর্শনের প্রত্যক্ষ অনুক্রম কেবল স্মৃতি ও পূর্ব মীমাংসাতেই বর্তমান।

কপিল সাংখ্য ও পাতঞ্জল যোগ নামে দু'টো দর্শনও ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে প্রভাবিত করেছে। সাংখ্য নিরীশ্বর এবং যোগ ঈশ্বরবাদী। 'পুরুষ' (চৈতন্য) ও 'প্রকৃতি' (উপাদান) তত্ত্বই সাংখ্যদর্শনে বিবৃত; আর যোগে দেহ শুদ্ধির মাধ্যমে চিত্ত শুদ্ধির প্রক্রিয়া বর্ণিত। ঈশ্বর কৃষ্ণের সাংখ্য কারিকাই সাংখ্যমতের প্রাচীন গ্রন্থ। আর পতঞ্জলির যোগের প্রাচীন ভাষ্য হচ্ছে ব্যাস রচিত ব্যাসভাষ্য। উপনিষদ থেকে শুরু করে সব শাস্ত্রেই যোগ স্বীকৃত। কিন্তু পাতঞ্জল যোগ, গীতার যোগ, বৌদ্ধ-যোগ ও জৈন যোগের মধ্যে মত ও পদ্ধতির পার্থক্য রয়েছে। যোগ একান্তভাবে অনার্যসংস্কার ও আচার থেকেই উদ্ভূত। মহেনজো-দাড়োতে পাওয়া এক মূর্তির দৃষ্টি

৩ ভারতীয় দর্শনের ভূমিকা—সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত পৃঃ ৯

নাসাগ্রে নিবদ্ধ। এতে পণ্ডিতগণ অনুমান করেন ওটি যোগী মূর্তি। সাংখ্যও আর্য প্রভাবিত অনার্য দর্শন।[৪] সাংখ্যভিত্তিক ও যোগপ্রভাবিত আর একটি মতবাদ আছে—তার নাম তন্ত্র।[৫] মুখ্যত উক্ত তিন ধারার মতবাদের পারস্পরিক প্রভাবে, মিশ্রণে ও সমন্বয় প্রয়াসে ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র অত্যন্ত জটিল হয়ে উঠেছে। বস্তুত ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রের ইতিহাস যুগ যুগান্তরের মানস বিবর্তন ও বিকাশেরই ইতিকথা। যতই দিন গেছে জ্ঞানী-পণ্ডিতের চর্চার ফলে তা নানা ধারায় বিচিত্রভাবে অভিব্যক্তি পেয়ে পেয়ে পারম্পর্যহীন জটিল ও পরস্পর বিরোধী অসংখ্য মতবাদের জন্ম দিয়েছে। বিজ্ঞান-ভিত্তিক সাংখ্য ও যোগতত্ত্ব ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে বৌদ্ধ ও জৈন নিরীশ্বর ও নৈরাত্ম্যবাদ। আবার এ সবের পরোক্ষ প্রভাব রয়েছে ব্রাহ্মণ্য মতবাদগুলোর বিবর্তনে ও বৈচিত্র্য সাধনে।

আর দুটো দর্শন—ন্যায় ও বৈশেষিকের পরিচয় এখানে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। স্রষ্টা নয়—বেদের অপৌরুষেয়তা ও প্রামাণিকতা স্বীকৃত হয়েছে বলেই সাংখ্য ও যোগকে আস্তিক্যদর্শন বলে। আস্তিক্য দর্শন ছয়টি ঃ—মীমাংসা, বেদান্ত, সাংখ্য যোগ, ন্যায় ও বৈশেষিক। এদের প্রবর্তক যথাক্রমে জৈমিনি, বাদরায়ণ (ব্যাস) কপিল, পতঞ্জল, গৌতম ও কনাদ। জৈন, বৌদ্ধ ও লোকায়ত দর্শনগুলো বেদ-বিরোধী বলে নাস্তিক্যদর্শন নামে পরিচিত।

বিদ্বানদের অনুমান আর্যেরা ঋগ্বেদের কতেকাংশ সাথে করেই ভারতে প্রবেশ করেছিলেন। ঋগ্বেদীয় আর্যধর্ম একান্তভাবে প্রকৃতি প্রতীক। সূর্য, বরুণ ও ইন্দ্রাদি দেবতার এক একজন প্রাকৃত শক্তির প্রতীক রূপে কল্পিত। আর দেবতার সঙ্গে মানুষের সম্পর্কও স্রষ্টা-সৃষ্টির ছিল না। জীবন-জীবিকার বৈষয়িক চুক্তির সম্পর্কই ছিল। দেবতাদের প্রতিনিধি জাতদেবের (অগ্নির) মাধ্যমে অর্থাৎ যজ্ঞের মারফত নর ও দেবতায় যোগাযোগ ঘটত। "(পূর্ব)-মীমাংসকরা জগতকে সত্য বলিয়া মানেন এবং তাঁহারা কোন ঈশ্বর মানেন না।…যাগযজ্ঞে নানা দেবতার উল্লেখ

৪ ক, লোকায়ত দর্শন—দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় পৃঃ ৪৯৪—৫১৬
১১৭—১২১

খ, বাংলার সাধনা—ক্ষিতিমোহন সেন পৃঃ ৩০—৪১

গ, ভারতীয় দর্শনের ভূমিকা—সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত পৃঃ ৪১

ঘ, ভারতদর্শনসার পৃঃ ২৪, ৩৫।

৫ লোকায়ত দর্শন—পৃঃ ৪৭৮—৮২

পাওয়া যায় কিন্তু মীমাংসকেরা সেই সমস্ত দেবতার স্বতন্ত্র সত্তা মানেন না। উচ্চারিত মন্ত্রের মধ্যেই তাঁহাদের সত্তা। যথাযথ ভাবে মন্ত্র উচ্চারিত হইলে এবং যজ্ঞীয় অনুষ্ঠান সম্পাদিত হইলে এই অনুষ্ঠানের ফলে যজ্ঞফল—যথা স্বর্গলাভ, পুত্রলাভ ইত্যাদি লাভ করা যায়। কোনো দেবতার অনুগ্রহে ও বিদ্বেষে কোনো সুফল বা কুফল হয় না; কাজেই স্বতন্ত্র দেবতা মানিবার কোন প্রয়োজন নাই।"[৬] অতএব বৈদিক আর্যধর্ম একান্তভাবে কর্মকাণ্ড ও আচারসর্বস্ব এবং পার্থিব জীবন-জীবিকার বাসনা ভিত্তিক। কোন প্রকারের ভাবপ্রবণতা ভক্তি-শ্রদ্ধা আকারে তখনো প্রবিষ্ট হয়নি। তাহলে একদিকে অদ্বৈতবাদ, মায়াবাদ, ভেদাভেদবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, শুদ্ধাদ্বৈতবাদ ও অচিন্ত্য দ্বৈতাদ্বৈতবাদ এবং অপর দিকে পুরুষ-প্রকৃতি, শক্তি-শক্তিমান, মায়া-ব্রহ্ম, লক্ষ্মী-বিষ্ণু, শিব-শিবানী, রাধা-কৃষ্ণ, ঈশ্বর-নিরীশ্বর, আত্মা-অনাত্ম প্রভৃতি তত্ত্বের কি করে উদ্ভব ও বিকাশ হল, তা খুঁজতে হয়।

॥ ২ ॥

আর্যপূর্ব যুগে ভারতে সম্ভবত দ্রাবিড়রা বিশেষ প্রভাব প্রতিপত্তি শালী ছিল। তারা সংখ্যায় যেমন অধিক ছিল, দণ্ডশক্তি এবং সংস্কৃতিতেও ছিল তেমনি সর্বশ্রেষ্ঠ। কাজেই মনে করা যেতে পারে আর্যপূর্ব যুগে ভারতে যে সভ্যতা ও সংস্কৃতি বর্তমান ছিল তা বাহ্যত ও মুখ্যত দ্রাবিড় সভ্যতা, হয়তো মহেনজোদাড়ো ও হরপ্পা সভ্যতা —অন্যকথায় সিন্ধু উপত্যকার প্রখ্যাত সভ্যতা তাদেরই মনন, কৃতি ও কীর্তির পরিচায়ক। জীবন-জীবিকার সুব্যবস্থা ও সহজতার ফলে বোধ করি তারা কায়ার চেয়ে ছায়ার মায়ায় ক্রমশ অভিভূত হয়ে পড়েছিল। এই হৃদয়ধর্মী অনার্যদের কাছে সৃষ্টি-সম্ভবা প্রকৃতি নারী-রূপিণী হয়ে পূজা পেতে থাকে, তার সঙ্গে রইল প্রজনন সহায় পুরুষ—সম্ভবত শিব কিংবা সূর্য। পুরুষ ও প্রকৃতির সহযোগে সৃষ্টি পূর্ণাঙ্গ হলেও জননী-রূপিণী নারীমহাত্ম্যেই গুরুত্ব আরোপিত হয়। ঋগ্বেদে দু'চার জন নারী[৭] দেবতা থাকলেও পূজনীয় দেবী একান্ত ভাবেই অনার্য মানস প্রসূত। এক সময় জীবনবাদের চেয়ে জীবনমুক্তিই দ্রাবিড়দের সাধ্য-সাধনার মুখ্য

---

৬ ভারতীয় দর্শনের ভূমিকা—সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত পৃঃ ৪১।

৭ শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ—পৃঃ ৬—৭

লক্ষ্য হয়ে উঠল। ভোগবাদ যেখানে বৈরাগ্যের কাছে হার মানে, সেখানে নিষ্ক্রিয়তা ও ভাবপ্রবণতা বিশেষ প্রশ্রয় পায়। বাহ্যজগতের প্রতি বিরাগ আর মনোজগতের প্রতি এই অনুরাগই তাদের তাত্ত্বিক করে তুলল। আর এদিকে নির্বোধ বিষয়ী করে রাখল। দৃশ্য জগৎকে তুচ্ছ করে, অদৃশ্য জগৎকে উচ্চ করে তার সাধনায় দ্রাবিড়গণ যখন বিভোর, তখন ভারতে এল আত্মপ্রত্যয়-শীল, সংগ্রামী, পশুজীবী ও জীবনবাদী যাযাবর-প্রায় আর্য। প্রথমে বিজেতা বিজিতে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত চলতে থাকে। বিজেতার গৌরব-গর্বী আর্যরা প্রথমে এদের খুব অবজ্ঞাই করত। এ জন্যে বিভিন্ন গোত্রের অনার্যদের এরা দস্যু, রাক্ষস, যক্ষ, নাগ, পক্ষী, কুকুর, দৈত্য প্রভৃতি নামে আখ্যাত করে সীমাহীন তাচ্ছিল্য দেখিয়েছে। তবু বিভেদ-মিলনের বিচিত্র ধারায় আর্য-অনার্যের মিশ্রণে একক সমাজ গড়ে উঠল। দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ, রাক্ষসকুলে রাবণ, নাগকুলে বাসুকী-জরৎকারু, যক্ষকুলে কুবের প্রভৃতির কাহিনীর মধ্যে এই তথ্যেরই ইঙ্গিত পাচ্ছি। এক সময় অভিজাত অনার্যেরা আর্য সমাজে মিশে গেল, আর সাধারণেরা সমাজের প্রান্তে পড়ে রইল দাস, মজুর ও অন্ত্যজরূপে।

অনার্যেরা যে আর্যদের চেয়ে সভ্যতায়ও উন্নত ছিল তার প্রমাণ কেবল মহেনজো-দাড়ো ও হরপ্পার আবিষ্ক্রিয়া নয়, আর্য ধর্ম ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও তার আভাস পাচ্ছি। মহাভারতে বর্ণিত 'ময়' দানবের কৌরব-সভা সাজানোর কাহিনীটি অনার্যশিল্প ও সভ্যতার উৎকর্ষের আভাস দিচ্ছে। ঋগ্বেদের আলোকে উত্তরকালের আর্য শাস্ত্রগুলো যাচাই করলেই আমরা দেখতে পাব সেখানে কেবল যে অনার্য দেবতারাই ভীড় জমিয়েছেন তা নয়—জ্ঞান ও ভক্তিবাদ, যোগ আর সাংখ্য দর্শনও গড়ে উঠেছে, যা' একান্তভাবে অনার্য প্রভাব প্রসূত।[৮]

ভক্তিবাদের আদি উদ্গাতা শুক, নারদ, প্রহ্লাদ ও ব্যাসদেব অনার্য রক্ত সম্ভূত। 'নবঘনশ্যাম' কৃষ্ণ আর 'নবদূর্বাদল শ্যাম' রামও হয়তো অনার্য রক্তে ঋণী। বলেছি, আর্য দেবতা প্রকৃতির প্রতীক। আর অনার্য দেবতা গুণ ও ভাবকল্পের প্রতিমূর্তি। এ ভাবে আমরা নানা সূত্রে আর্যদের উপর অনার্যদের সাংস্কৃতিক বিজয়ের আভাস ও পরোক্ষ প্রমাণ পাচ্ছি। আরণ্যকেই প্রথম ভাববাদী অনার্যের প্রভাব লক্ষণীয়।

---

৮ ক, লোকায়ত দর্শন—২য়-৩য় অধ্যায়।
খ, বাংলার সাধনা—পৃঃ ৩০, ৪১
গ, ভারত দর্শন সার—পৃঃ ২৬—৬৭, ২৯২

ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্তও বলেন, "কিন্তু একদল পণ্ডিত মনে করেন, এই শক্তিবাদ এবং শক্তি পূজার বহুল প্রসারে আর্যেতর ভারতীয় আদিম অধিবাসিগণের দানই মুখ্য।··· দেবী পূজার উল্লেখ প্রাচীন ইতিহাস-পুরাণ-কাব্যে যাহা পাওয়া যায় তাহাতে দেবীর পার্বত্য, বন প্রদেশের আর্যেতর অধিবাসিগণ কর্তৃক পূজিত হইবার সমর্থন যথেষ্ট মিলে। ···আসলে আমরা আজকার দিনে হিন্দুধর্ম বলিয়া যে ধর্মকে অভিহিত করি, তাহা একটি জটিল মিশ্রধর্ম ; বহুদিকের বহুধারা আসিয়া একত্র হইয়া তাহার বর্তমান বহু বিচিত্ররূপ সম্ভব করিয়া তুলিয়াছে।··· আর্যেতর জাতিগণ বিশ্বাস, সংস্কার, কল্পনা, পূজা-প্রকরণ প্রভৃতি তথ্য সরবরাহ করিয়াছেন আর আর্য দার্শনিক-প্রতিভা তাহাতে নিরন্তর উচ্চ দার্শনিক তত্ত্ব এবং অধ্যাত্ম অনুভূতি সংযুক্ত করিয়াছেন। এই জন্যই কালী তারা প্রভৃতি দেবীর দশমহাবিদ্যারূপ একাধারে অসংস্কৃত আদিম সংস্কারের আবার অন্যদিকে গভীর আধ্যাত্মিক তত্ত্বের— প্রতীকরূপে আমাদের নিকট দেখা দিয়াছে। এই জটিল মিশ্রণ আমাদের সমাজ ও ধর্মের সর্বত্রই বিদ্যমান।"[৯] এ ভাবে অনার্য মানস সংস্কৃতির কাছে বাহু বলে বলীয়ান আর্যগণ আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হল, যেমন রোমকগণ করেছিল গ্রীকদের কাছে আর আরবগণ করেছিল ইরানিদের কাছে।

॥ ৩ ॥

অনার্যেরা গুণময় (প্রাকৃতিক নয়) শক্তির পূজারী ছিল। সে শক্তিও মূলত নারী-স্বরূপা যার নাম আদ্যাশক্তি, এর থেকে পরম পুরুষের উৎপত্তি। এ শক্তির সঙ্গে অবিনাবদ্ধ হয়ে পুরুষ হয় শক্তিমান। শক্তি ও শক্তিমান তাত্ত্বিক কল্পনায় এক সময় অদ্বয়, অভিন্ন বা অদ্বৈত সত্তা রূপেও কল্পিত হয়, আবার দ্বৈতরূপেও তার প্রকাশ সম্ভাবনা অস্বীকৃত হয় নি। ফলে, মায়া-ব্রহ্ম, শিব-শিবানী, পুরুষ-প্রকৃতি বিষ্ণু-লক্ষ্মী প্রভৃতি আদ্য শক্তিরূপে কল্পিত হয়েছে। এখানেই সৃষ্টি সম্ভব 'মিথুন তত্ত্বের' উদ্ভব। মৈথুন মাধ্যমে সৃষ্টি প্রক্রিয়ার অভিজ্ঞতা এই নারী-পুরুষ তত্ত্ব-ভাবনায় তথা মিথুনতত্ত্ব কল্পনায় প্রচুর প্রেরণা দিয়েছে। তবু এ তত্ত্বে গুরুত্ব ও আভিজাত্য দানের জন্যে ক্ষীণসূত্র ও সাদৃশ্য ধরে ঋগ্বেদে এর সমর্থন খোঁজা হয়েছে এবং দেবী-সূক্ত, রাত্রি-সূক্ত ও শ্রীসূক্তে মনোময় ব্যাখ্যা আরোপ করে এ

৯ শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ—দর্শনে ও সাহিত্যে পৃঃ ৬—৭

তত্ত্বধারায় পারম্পর্য, আর্যতা ও প্রাচীনতা দানের প্রয়াস আছে বেদান্ত ও পুরাণাদিতে। আর এ 'তত্ত্বের স্থ' ধারায় জটিলতর বিকাশ ঘটেছে 'পঞ্চরাত্র' সংহিতায় এবং কাশ্মীরী শৈব শাস্ত্রে। সেও প্রায় খ্রীষ্টীয় পাঁচ থেকে আট শতকের কথা। এ সব তত্ত্বের তথ্য-নির্ভর বিস্তৃত ও মনোজ্ঞ আলোচনা মিলবে ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্তের 'শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ—দর্শনেও সাহিত্যে' গ্রন্থে।

সমাজতাত্ত্বিক পদ্ধতি প্রয়োগেও এ মনন ধারার ব্যাখ্যা সম্ভব। প্রকৃতির প্রসাদ-নির্ভর আদিকালের অজ্ঞ অসহায় মানুষ কল্পনাশ্রয়ী না হয়েই পারেনি। আজো দুর্বল চিত্তে তুক-তাক ও শুভাশুভ প্রতীকের প্রভাব অপরিমেয়। নিজের মনোবাঞ্ছা সিদ্ধির অনুকূল পরিবেশ পেলে যে-কোন মানুষ তার প্রয়াসে ও বাঞ্ছায় সিদ্ধি সম্বন্ধে আশান্বিত হয়ে উঠে। বাহ্য নিদর্শন ঘিরে এই যে সিদ্ধির বা অসিদ্ধির কল্পনার প্রশ্রয় তা আজো কম নয়। তুক্-তাক্ এবং শুভাশুভপ্রতীক, তিথি-নক্ষত্র ও দিন-ক্ষণের সঙ্গে কর্মের ফলাফল নির্ভরতায় বিশ্বাস আজো অধিকাংশ লোকের মনে দৃঢ়মুল। অক্ষম মানুষের বাঞ্ছার তীব্রতাই জাদুবিশ্বাসে প্রবর্তনা দেয়। মনের এমনি অবস্থায় সিদ্ধির অনুকূল কাল্পনিক ও আচারিক পরিবেশ সৃষ্টি করাও অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। দুনিয়ার মানুষের আদিম জীবন-জীবিকা সংস্থায় স্বাভাবিকভাবেই তাই এ মনোবল সঞ্চয়ের সহায় জাদুবিশ্বাস চালু ছিল। প্রয়োজন ও ক্ষেত্র অনুসারে তা নানা বৈচিত্র্যে বিবর্তিত হয়ে আজকের দিনের সমাজে ও ধর্মে রূপ নিয়েছে।

আমরা দেখেছি, পশুজীবী ও কৃষিজীবী মানুষের মনন ধারায়ও বিভিন্নতা ছিল। পশুজীবী আর্যরা প্রকৃতি প্রতীক দেবতা—বায়ু, বরুণ, অগ্নি, ইন্দ্র প্রভৃতি কল্পনা করেছে। আর কৃষিজীবী অনার্যেরা 'মিথুনতত্ত্ব'কেই প্রাধান্য দিয়েছিল। তাদের কাছে ভূমির ফসল উৎপাদন আর নারীর সন্তান উৎপাদন একই পদ্ধতি নির্ভর। এ অভিজ্ঞতা থেকেই জগৎ সৃষ্টিতেও তারা প্রকৃতি ও পুরুষের—নর ও নারী স্বরূপার মিথুনতত্ত্বে আস্থা রেখেছে। মনোবল সঞ্চয় ও বাঞ্ছাসিদ্ধির সহায়ক আবহ সৃষ্টির প্রয়োজনে তারা 'মৈথুন'কে বীজ বোনার শুভযোগ সৃষ্টির প্রারম্ভানুষ্ঠান রূপে গ্রহণ করে। পরে সমাজ ব্যবস্থার ও উৎপাদন পদ্ধতির বিবর্তন হয়েছে এবং আদিম সংস্কারও নানা তাত্ত্বিক কলেবরে পুষ্ট হয়েছে। কালিক ব্যবধানে আদি উদ্দেশ্যের বিস্মৃতি ঘটেছে এবং উন্নততর মননের দ্বারা নতুন এবং জটিলতর তত্ত্ব ও উদ্দেশ্য আরোপিত হয়েছে। প্রাচীন মিশর, মেসোপটেমিয়া, চীন, পলিনেসিয়া

(মাওরি গোত্র) প্রভৃতি দেশেও এই 'মিথুন' তত্ত্ব ফসল উৎপাদন তত্ত্বের অঙ্গ ছিল।[১০] আর্যেরা এদেশে এসেই সম্ভবত কৃষিজীবী হয়, ফলে এ অনার্য উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে অনার্য তত্ত্বও গ্রহণ করে। শুক্ল যজুর্বেদে (বাজসনেয়ী সংহিতায়)[১১] ব্রাহ্মণে[১২] বৃহদারণ্যকে[১৩], মহাভারতে[১৪] এবং ছান্দোগ্যে এ তত্ত্ব বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। ছান্দোগ্যে আছে ক. "হে গৌতম, স্ত্রীলোকই হলো যজ্ঞীয় অগ্নি। তার উপস্থই হলো সমিধ। ওই আহ্বানই হলো ধূম। যোনিই হলো অগ্নিশিখা। প্রবেশ ক্রিয়াই হলো অঙ্গার। রতি সম্ভোগই হলো বিস্ফুলিঙ্গ। ৫।৮।১। এই অগ্নিতে দেবতারা রেতর আহুতি দেন। সেই আহুতি থেকেই গর্ভ সম্ভব হয়।" ৫।৮।২ [দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের তর্জমা]। খ, ছান্দোগ্যের 'বামদেব্য' ব্রতকথায় আছে: "যে এই ভাবে বামদেব্য সামকে মিথুনে প্রতিষ্ঠিত বলে জানে, সে মিথুনে মিলিত হয়। (তার) প্রত্যেক মিথুন থেকে সন্তান উৎপন্ন হয়। সে পূর্ণজীবী হয়। সন্তান, পশু ও কীর্তিতে মহান হয়। কোন স্ত্রীলোককেই পরিহার করিবে না—এই-ই ব্রত। ২।১৩।২ [দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের তর্জমা]।

অতএব, মিথুনের দ্বারা, পূর্ণজীবন, সন্ততি, পশুসম্পদ ও কীর্তি লাভ হয়। কাজেই ধন উৎপাদনের সঙ্গে কাম সাধনের এই অনার্য সংস্কার আর্যমনে গোড়াতেই অনুপ্রবিষ্ট হয়। আর এর বিচিত্র বিকাশ আমরা সাংখ্যে, যোগে, তন্ত্রে ও শৈব-শাক্ত-বৈষ্ণব-গাণপত্যে দেখেছি। এই মিথুন তত্ত্বের রেশ রয়েছে জয়পুর, পাঞ্জাব, নিলগিরি, ছোটনাগপুর প্রভৃতি অঞ্চলের অনুন্নত গোত্রগুলোর মধ্যে। মেক্সিকো অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশের আদিবাসীদের মধ্যেও অনুরূপ আচার সংস্কার লক্ষণীয়।[১৫]

আবার জেমস ফেসারের মতে 'মৈথুন যেমন এই ফসল উৎপাদনের' অনুষ্ঠানিক অঙ্গরূপে বিবেচিত হয়েছে, তেমনি আবার রতিনিরোধ সাধনায়ও প্রবর্তনা দিয়েছে: "সে (চাষী) হয় তো মনে করতে পারে যে, তার নিজের কাম চরিতার্থতার সাহায্যেই উদ্ভিদ এবং জীবজন্তুর সংখ্যাবৃদ্ধি করা যাবে; কিংবা সে কল্পনা করতে পারে নিজের

১০ লোকায়ত দর্শন পৃঃ ৪৯০—৯২

১১ শ্লোক পৃঃ ২৩।২২, ২৩।৩১

১২ লোকায়ত দর্শন—২৫ সংখ্যক পাদটীকা পৃঃ ৬৪৬

১৩ শেষাংশ, শ্লোক—৬।২।১৩, ৬।৪।২, ৬।৪।৭

১৪ আদিপর্ব ১২২ অধ্যায়।

১৫ লোকায়ত দর্শন ১০৪—১৭, এবং ৪২৬—২৭, ৪৭৮।

বংশবৃদ্ধি নিরুদ্ধ করে যে শক্তি-ক্ষয় সে বন্ধ করলো সেই সঞ্চিত শক্তির সাহায্যেই উদ্ভিদ এবং অন্যান্য প্রাণীরা নিজেদের বংশবৃদ্ধি ব্যাপারে সহায়তা লাভ করবে। অতএব, ওই একই আদিম দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে—প্রকৃতি ও জীবন সংক্রান্ত ওই একই ধারণা থেকে আদিম মানুষ দুটি স্বতন্ত্র পথে রিরংসা বা রতি-নিরোধ উভয় বিধিই গ্রহণ করতে পারে।" [দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের তর্জমা]

কাজেই এক শ্রেণীর যোগীর ও কোন কোন সম্প্রদায়ের নারীবিবর্জিত সাধনারও মূল অভিন্ন হওয়া বিচিত্র নয়।

আবার সমাজ তাত্ত্বিকেরা এও বলেছেন যে হাতিয়ার বিহীন আদিম মানুষের যৌথ কর্ম প্রচেষ্টা থেকেই ভাষার বিকাশ, ছন্দের উৎপত্তি এবং গানের উদ্ভব হয়েছে। বৈদিক 'সামগান' এই যৌথ কর্মকেই নির্দেশ করে। কুকুর সম্বন্ধীয় সাম-গানে আছে "অন্য কুকুরেরা তাঁর (শ্বেতকুকুর) কাছে গিয়ে বললো ভগবান আমাদের অন্নের জন্যে গান করুন, আমরা ভোজন করতে চাই।" ছান্দোগ্য ১।১২।১, "সেই জন্য এই প্রকার জ্ঞানসম্পন্ন উদ্গাতা বলিবেন ; 'তোমার কোন্ কাম্য বস্তুকে গান করিব?" কেন না যিনি এই প্রকার জানিয়া সামগান করেন তিনি কাম-গানকে শাসন করেন।" ছান্দোগ্য ১।৭।৯। [দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের তর্জমা]

মেক্সিকোর 'তারা হুমারে' গোত্রে নাচ ও কাজ বুঝাবার জন্যে একটি শব্দই দ্ব্যর্থে প্রযুক্ত হয়। বাংলার 'শুস্পাতার' ব্রতেও এর আভাস আছে। ছাদপেটানাদি যৌথ কর্মে আজও নাচ-গান অপরিহার্য বিবেচিত হয়। এও যাদুবিশ্বাসজাত উৎপাদনের আবহ সৃষ্টির প্রয়াস।[১৬]

॥ ৪ ॥

ঋগ্বেদে সূর্য ও বিষ্ণু অভিন্ন। 'পঞ্চরাত্র' সংহিতায় বাসুদেবই ঋগ্বেদের পুরুষ-সূক্তের পরমপুরুষ। তিনিই বিষ্ণু আর তাঁর শক্তির নাম শ্রী তথা লক্ষ্মী। পৌরাণিক যুগে বাসুদেব বিষ্ণু ও লক্ষ্মী প্রভৃতি নানা নামে ও বিভিন্ন কাহিনীর নায়ক-নায়িকা হয়ে বিচিত্র রূপে প্রকটিত হয়েছেন। অনার্য শিব-শিবানী মতবাদও এভাবেই বিকাশ লাভ করে। ফলে প্রায় একই সময়ে শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণব নামে তিনটি শক্তি মতবাদ প্রাধান্য ও জনপ্রিয়তা লাভ করে। এ সম্বন্ধে শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেন—

---

১৬ লোকায়ত দর্শন পৃঃ ১২৪—৬৩

"একটি দার্শনিক মতবাদরূপে ভারতীয় শক্তিবাদের যে বিকাশ, কোন বিশেষ ধর্ম বা শাস্ত্র তার বাহন ছিল না। এই শক্তিবাদের বিকাশ শৈবধর্ম বা শৈবশাস্ত্রকে অবলম্বন করিয়া যেরূপ, শাক্তধর্ম বা শাক্তশাস্ত্রকে অবলম্বন করিয়া যেরূপ, প্রথমাবধিই বৈষ্ণবধর্ম বা বৈষ্ণব শাস্ত্রকে অবলম্বন করিয়াও সে ভাবেই হইয়াছে। সুতরাং শাক্ত-শৈব ধর্মের প্রভাবেই এই শক্তিবাদ বৈষ্ণব ধর্মে গৃহীত হইয়াছে এই ধারণা অনেকখানি অমূলক বলিয়া মনে হয়; একটি ভারতীয় বিশ্বাস ও চিন্তার ধারা প্রায় সমভাবেই সব ধর্মক্ষেত্রের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে দেখিতে পাই-তেছি। যেখানে এই শক্তিই প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন সেখানে শাক্ত ধর্ম বা শাক্ত শাস্ত্রের উদ্ভব, যেখানে শক্তিমান শিব বা বিষ্ণু প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন সেখানে শৈব বা বৈষ্ণব মতের উদ্ভব এবং প্রসার।" [১৭]

এগুলোর প্রায় পাশাপাশি চলেছে অনার্যযুগের সাংখ্য, যোগ এবং এদের উপজাত তন্ত্র। সাংখ্য ও যোগ মত ভিত্তি করেই তন্ত্রশাস্ত্রের উদ্ভব। এরও বীজ ছিল অনার্য মানসে ও আচারে। কাশ্মীর ও বাংলায় এর বহুলচর্চা হয়, অন্যত্র কম। পরে যোগ ও তন্ত্র প্রায় সব মতবাদকে বিশেষ প্রভাবিত করে এবং এসব মতবাদের বিভিন্ন উপশাখারও অধ্যাত্ম সাধনার অপরিহার্য অঙ্গ বা ভিত্তি হয়েছে তন্ত্র। বিশেষকরে বৌদ্ধ, শৈব ও শাক্ত সাধনায় যোগ ও তন্ত্রের প্রভাব অপরিমেয়। এপর্যন্ত আলোচ্য শক্তিগুলোতে কর্মবাদই স্বীকৃত সত্য ছিল। জ্ঞানবাদ ছিল আনুষঙ্গিক।

অষ্টম শতকের অদ্বৈতবাদী শঙ্করাচার্যের মায়াবাদের সঙ্গে জ্ঞানবাদ বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। আর মায়াবাদ বিরোধী উত্তর সাধক ভাস্কর, রামানুজ, নিম্বার্ক, মধ্ব, প্রমুখ তাত্ত্বিক-দার্শনিকেরা ভক্তিবাদকে জনপ্রিয় করে তোলেন। এঁরা দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড়। আগেও নারদ, শুক, প্রহ্লাদ, ব্যাস প্রভৃতি কেউ অবিমিশ্র আর্য ছিলেন না। এবং অদ্বৈতবাদ আর তাঁদের ভক্তিবাদও ছিল ব্যক্তিক মানস প্রবণতা প্রসূত মত। দাক্ষিণাত্যের প্রচারকেরা একে দার্শনিক তত্ত্বে উন্নীত ও প্রতিষ্ঠিত করেন। এঁরা সবাই ভারতে মুসলিম আগমনের পরে আবির্ভূত, এজন্যে অদ্বৈত-বাদ ও ভক্তিবাদ ইসলাম ও সূফী প্রভাবিত বলে মনে করবার কারণ আছে। বিদ্বানেরা আজকাল তা' স্বীকারও করছেন।

---

[১৭] শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ পৃঃ ৩৭

ক, এ ব্যাপারে বিনয় ঘোষ বলেন : 'বুদ্ধ আর যিশুর মর্মবাণী আত্মসাৎ করে মহম্মদ 'ইসলামের' বাণী নতুন করে শোনালেন মানুষকে। তাই বিশ্বমানব আবার নতুন করে ইস্‌লামের আহ্বানে সাড়া দিল। নীতিভ্রষ্ট আদর্শভ্রষ্ট ভারতের নিস্তেজ মানুষও যে সাড়া দেবে তাতে আর বিস্ময়ের কি আছে? দক্ষিণ ভারত ইস্‌লামের আহ্বানে সাড়া দিয়েছিল। ইস্‌লামের বাণী ইস্‌লামের আদর্শ সমুদ্র পথে প্রথমে পৌঁছল দক্ষিণ ভারতে। তাই বোধ হয়, অষ্টম শতাব্দীর পর থেকেই ভারতের সংস্কৃতির ইতিহাসে এক যুগান্তকারী পরিবর্তনের সুচনা হয়। দক্ষিণ ভারত নতুন যুগের ভারত-সংস্কৃতির পথ-প্রদর্শক হয়ে ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হয়েছে। ...অষ্টম শতাব্দীর পর থেকেই ধর্ম সমন্বয় ও সংস্কৃতিসমন্বয়ের নতুন ধারার প্রবর্তক হল দক্ষিণ ভারত, দাক্ষিণাত্য। শঙ্করাচার্য রামানুজ বল্লভাচার্য নিম্বাদিত্য সকলেই দক্ষিণ ভারতের। একেশ্বরবাদ ভক্তিবাদ বৈষ্ণবধর্ম ও শৈবধর্মের জন্ম হল দ্রাবিড় দেশে, নবীন ইসলাম ধর্মের সঙ্গে নব্য হিন্দু ধর্মের ঘাত প্রতিঘাতের ফলেই দক্ষিণ ভারতে এই নতুন ধর্মসমন্বয় ও সংস্কৃতি সমন্বয়ের ধারা প্রবর্তিত হয়েছে। ভারতের সংস্কৃতি সমন্বয়ের ইতিহাসে দক্ষিণ ভারত পুরোভাগে এসে দাঁড়িয়েছে। ...দক্ষিণ ভারতের দু'একজন রাজা পর্যন্ত যে ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন তা' থেকেই বোঝা যায়, ইসলাম তখন হিন্দু সমাজের উপর বেশ প্রভাব বিস্তার করেছে। ...ইসলামের এক দেবতা ও এক ধর্মের বিপুল বন্যার মুখে দাঁড়িয়ে শঙ্কর আপসহীন 'অদ্বৈতবাদ' প্রচার করেছেন।...শঙ্করাচার্যের আপসহীন অদ্বৈতবাদ মনে হয় যেন নবীন আরবী ইসলামের একেশ্বরবাদের ভারতীয় রূপ। বেদ উপনিষদ তার উৎস হলেও ইসলামের প্রভাবেই যে সেই উৎস-সন্ধানের প্রেরণা এসেছে এবং সেই 'অদ্বৈতবাদের' পুনরুজ্জীবন সম্ভবপর হয়েছে তা' স্বীকার না করে উপায় নেই। শঙ্করাচার্যের পরে রামানুজ বিষ্ণুস্বামী মাধ্বাচার্য ও নিম্বার্কের দর্শনের সঙ্গে ইসলামের সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ হয়েছে দেখা যায়।...ইসলাম ধর্মের প্রভাব বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে শঙ্করাচার্যের কেবলা-দ্বৈতবাদ থেকে রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও নিম্বার্কের দ্বৈতাদ্বৈতবাদের প্রগতির ধারা বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয়।...ইসলামের আত্মনিবেদন, ইসলামের প্রেম, ইসলামের সমানাধিকার ও সাম্যের বাণী, ইসলামের গণতন্ত্রের আদর্শ মুসলমান সাধকরা সহজ ভাষায় সোজাসুজি যখন এদেশে প্রচার করেছেন, রামানুজ ও নিম্বার্ক তখন শঙ্করের শুদ্ধ জ্ঞানের স্তর থেকে শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতির স্তরে নেমে এলেন।"

বাঙলার নবজাগৃতি—বিনয় ঘোষ পৃ: ১২১-২৪

তারাচাঁদ বলেন :

খ, The establishment of this monotheistical tendency recieved a powerful impetus from the appearance of so uncompromisingly montheistic a religion as Islam. Sankara was born at a time when Muslims were

beginning their activities in India, and if tradition is correct, when they had gained a notable success in the extension of their faith by converting the king of the land. He was born and brought up at a place where many ships from Arabia and the Persian Gulf touched. If his extreme monoism, his stripping of the one of all semblances of duality, his attempt to establish this monoism of the authority of revealed scriptures, his desire to Purge the cult of many abuses, had even a faint echo of the new noises that were abroad it would not be a matter for great surprise or utter incredulity.........His successors Ramanuja, Visnuswami, Madhava and Nimbarka and the hymn-makers, in their speculations and religious tone, show closer parallelism. In the give and take of culture between Muslims and Indians it is difficult to assess accurately the share of the each...... But the fact remains that a number of elements were absorbed into Hinduism through its direct contact with Islam and these elements were presented to India impressed with the Islamic mould. (PP 111-12)

.........Ramanuja's prapatti and Guru-Bhakti—'It is more likely however, that they came from Islam. Both were very prominent features of that religion (Islam). The word Islam means surrender and the Muslim is verily a Prapanna.........Historically also there is no insuperable difficulty in supposing that Ramanuja adopted it from Islam. (P 114.) This sufi conception of deified teacher was incorporated in medieval Hinduism.' (P 115)

'লিঙ্গায়েত'বাদ সম্বন্ধেও তারাচাঁদ বলেন :

গ, It is difficult to resist the inference that lingayatism was a result of the influence which these Muslims exerted in these parts of India. No other hypothesis appears sufficient to explain the revolutionary character of its doctrines and customs. The abandonment of such a deeprooted Hindu idea as that of metempsychosis and of such customs as cremation and purificatory death ceremonial, the abolition of inequalities of caste and sex and the reform of marriage, the conceptions of the community of brave warriors led by their sanctified preceptor, and of god (allama) whose very name is probably of Muslim origin, point unmistakably to the source of inspiration that is Islam. (PP 119-20) "Influence of Islam on Indian Culture."

এ প্রসঙ্গে উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য বলেন—আমরা এই সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, মুসলমানদের ভারত আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুরা ইসলামের একেশ্বরবাদের সহিত কমবেশী পরিচিত হইতেছিল।......একেশ্বরবাদ ভারতেও ছিল বাহির হইতেও

আসিয়াছিল উভয়ে মিলিয়া দশম একাদশ শতাব্দীতে একটা পরিপুষ্ট আকারে দেখা দেয়। ঋণ স্বীকার করা ভাল[১৮]। যেমন করিয়াই হউক শঙ্করের দুই তিন শত বৎসর পরে বেদান্ত দর্শনের সাহিত্যে এই একেশ্বরবাদের প্রভাব স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়।[১৯] তাহাদের (মুসলমানদের) একেশ্বরবাদের সংস্পর্শে আসিয়া ভারতের একেশ্বরবাদ বিশেষতঃ বৈষ্ণব একেশ্বরবাদ উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে নাই এমন কথা বলিতেও আমাদের সঙ্কোচ বোধ হইতেছে।"[২০] মুসলিম পদানত উত্তর-ভারতে শাসকের প্রতি স্বাভাবিক বিরূপতা ছিল, তাই এদের উপর মুসলিম মানস-সংস্কৃতির প্রভাব পড়ছিল মন্থর গতিতে। মুক্ত দ্রাবিড় অঞ্চলে এ প্রভাব দ্রুত ও সর্বগ্রাসী হয়। আর প্রাচীন আলোয়ার সম্প্রদায়ের কৃষ্ণলীলা বিষয়ক প্রেমগান ভক্তিবাদ প্রসারে পরোক্ষ সহায়তা দিয়েছে। তবু দ্রাবিড় দার্শনিকদের তত্ত্বে লক্ষ্মী বা শ্রীর স্থান নগণ্য।

মুসলিম বিরূপতা যখন মন্দা হয়ে এল, তখন উত্তর ভারতেও ভক্তিবাদ প্রসার লাভ করল। তাও দক্ষিণ ভারত থেকে; নইলে রাম-সীতাই রাধা-কৃষ্ণের স্থান গ্রহণ করতেন।

'ভক্তি দ্রাবিড় উপজি লায়ে রামানন্দ।
প্রকট কিয়া কবীরনে সপ্তদ্বীপ নবখণ্ড।'

এই উক্তিই আমাদের সিদ্ধান্তের সাক্ষ্য। রামানন্দ, কবীর, দাদূ প্রভৃতি উত্তর ভারতে ভক্তিবাদ প্রচারক। এই অবধি বৈষ্ণবমতে রাধা-কৃষ্ণ লীলা এবং প্রেম অনুপস্থিত। ভক্তির সঙ্গে কৃপা ও করুণাই যুক্ত থাকে—প্রেম নয়। ভক্তিরই উপজাত (by product) হচ্ছে প্রেম—এ কারো মতে ভক্তির পরিণতি আর কারো কাছে ভক্তির বিকৃতি।

দেবী, শ্রী, রাত্রি প্রভৃতি সূক্ত ছাড়াও ঋগ্বেদে বশিষ্ঠ প্রভৃতির উক্তি ভিত্তি করে বরুণ, বায়ু, ইন্দ্র, অগ্নি, বিষ্ণু, ব্রহ্মা প্রভৃতির সঙ্গে ভক্তির সম্পর্ক লক্ষ্য করা হয়েছে। বৃহদারণ্যক, শতপথ-ব্রাহ্মণ, কঠ, ছান্দোগ্য, তৈত্তিরীয় প্রভৃতি এবং পঞ্চরাত্র, শৈবসংহিতা, নারদের 'ভক্তিসূত্র,' শাণ্ডিল্যের 'শাণ্ডিল্যসূত্র' প্রভৃতির আলোকে ভক্তিমতের আভিজাত্যে ও প্রাচীনতায় আস্থা দৃঢ় করবার প্রয়াস থাকলেও

১৮ ভারতদর্শনসার পৃ: ৬৪—৬৭।
১৯ ভারতদর্শনসার পৃ: ২৬৭
২০ ভারতদর্শনসার পৃ: ২৯২

কার্যত মতবাদ হিসেবে নয়-দশ শতকের পূর্বে এর অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না। তেমনি মুসলমান বিজয়ের পূর্বে 'ভক্তি' প্রেমবাদে পরিণত হয়নি। আর ষোল শতকে চৈতন্যের মত প্রচারের আগে রাধা-কৃষ্ণ লীলা জীবাত্মা-পরমাত্মার প্রণয়লীলার রূপ ধরেনি। তখনো পুরুষ ও প্রকৃতি তথা মিথুনতত্ত্বের রূপক হিসেবেই রাধা-কৃষ্ণ লীলা ব্যাখ্যাত ও আস্বাদিত হয়েছে। এর প্রমাণ মেলে আলোয়ার সম্প্রদায়ের গানে ও গাথায়। এদের কৃষ্ণ-প্রিয়া রাধা নয়—নাপ্পিন্নাই। আমরা দেখেছি শক্তি ও শক্তিমান রূপে এক 'আদিম যুগলে' বিশ্বাস অনার্য ভারতের বৈশিষ্ট্য। এই যুগলতত্ত্বই নানা বিবর্তনের মাধ্যমে রাধাকৃষ্ণলীলার রূপ নিয়েছে।

বিষ্ণু-শ্রীতে মিথুনতত্ত্ব আরোপিত হলেও এপর্যন্ত আমরা রসলীলা বা রাসলীলা দেখিনি। শশিভূষণ বলেন—"বিশেষ কোন দার্শনিক তত্ত্বমতের অবলম্বনে রাধা-বাদের উৎপত্তি হয় নাই; রাধাবাদ মুখ্যত পুরাণ মূলকও নহে।"[২১]

ক, কেউ কেউ বলেন 'রাধা-কৃষ্ণ' উপাখ্যান আসলে আকাশের সূর্য ও নক্ষত্রের মনোময় রূপক কাহিনী। বিষ্ণু সূর্যের এবং রাধা তারার নাম। যোগেশ চন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বলেন—"রাধা নাম পুরাতন এবং বিশাখা নক্ষত্রের নামান্তর ছিল। কৃষ্ণ যজুর্বেদে বিশাখা, অনুরাধা ইত্যাদি নক্ষত্রের নাম আছে। রাধার পর অনুরাধা, অতএব বিশাখার নাম রাধা। অথর্ববেদে 'রাধো বিশাখে' স্পষ্ট উক্তি আছে।··· রাধা অর্থে সিদ্ধি।··· কালক্রমে রাধা ও বিশাখা একত্র হইয়া গিয়াছে। মহা-ভারতে কর্ণের ধাত্রীর নাম রাধা।···গো-রশ্মি, গোপ-কৃষ্ণ, গো-পী-তারা। কবি কৃষ্ণ-রাধাকে রাস-মধ্যস্থ ও গোপী-তারাকে মণ্ডলাকারে সাজাইয়াছেন।"[২২] এই ব্যাখ্যা তথ্যাভিত্তিক বলে মনে হয়। কেন না আদি কৃষ্ণলীলায় সোমাভা, অনুরাধা, চিত্রা, কৃত্তিকা, ভদ্রা, রোহিণী, রেবতী, বৃষভাণু, চন্দ্রাবলী প্রভৃতি রাশি ও নক্ষত্রসূচক নাম পাচ্ছি। মনে হয় এই রূপকেই পরে মানবীয় ভাব আরোপিত হয়ে পল্লবিত বৃন্দাবন লীলায় পরিণত হয়েছে। রূপ গোস্বামীর 'ললিতমাধব' নাটকে তারা, আকাশ ও পৌর্ণমাসীর রূপক ব্যবহৃত হয়েছে।[২৩]

খ, ভাগবতে কৃষ্ণের রাসলীলা এবং প্রধানা গোপীর সঙ্গে কৃষ্ণের ঘনিষ্ঠতার কথা আছে। এই ক্ষীণ ও অস্পষ্ট সূত্র ধরে বৈষ্ণবেরা প্রধানা গোপীকেই

২১ শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ পৃঃ ৯৫

২২ ভারতবর্ষ, মাঘ, ১৩৪০ সন—যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধির প্রবন্ধ।

২৩ শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ পৃঃ ৯৬—৯৭

'রাধা' বলে চিহ্নিত করেন। কিন্তু ইতিহাসের বিচারে তা মেনে নেয়া যায় না। হরিবংশ ও বিষ্ণু পুরাণে রাধার নাম নেই। মৎস্য, বায়ু, বরাহ প্রভৃতি পুরাণে কচিৎ রাধার নাম উল্লেখ আছে। পদ্মপুরাণেই প্রথম রাধার উল্লেখ পাই। কিন্তু এখানেও রাধা কৃষ্ণের বিশিষ্টা লীলা-সঙ্গিনী নন। তবে রাধিকা কৃষ্ণেরই প্রকৃতি, শক্তি ও বল্লভা রূপে পদ্মপুরাণের পাতাল খণ্ডে বর্ণিত হয়েছেন। এবং এখানে সখী পরিবৃত রাধাকৃষ্ণকে একাসনে আসীন দেখা যায়। এ ক্ষেত্রে রাধা লক্ষ্মীর অবতার ও বিষ্ণুশক্তি। অতএব বৈষ্ণব তত্ত্বের পূর্ণ আভাস এখানেই সূচিত হয়েছে।

শশিভূষণ দাশগুপ্ত পদ্মপুরাণ ও পঞ্চরাত্রের রাধা-কাহিনীর প্রামাণিকতায় সংশয় প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে এই সব অংশ পরবর্তী যোজনা হওয়াই সম্ভব।[২৪] ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে রাধাবাদের বৈষ্ণবতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা আছে। এজন্যে পণ্ডিতেরা এর প্রাচীনতায় সন্দিহান। মোটামুটি বলা যায়, নবম শতকের দিকে রাধা নামটি ব্যবহৃত হতে থাকে। আর কৃষ্ণের রাসলীলার উদ্ভব ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণের কালে অথবা কিছু পরে। এর মূল ছিল আভীর জাতির রাখালিয়া গানে। এবং দাক্ষিণাত্যের আলোয়ার কল্পিত কৃষ্ণলীলা ভিত্তি করেই ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণের রাসলীলার বিকাশ। আলোয়ারদের কৃষ্ণ-সঙ্গিনী রাধা নন—নাপ্পিন্নাই। আর সাহিত্যে রাধার উল্লেখ প্রথম পাচ্ছি সাতবাহনরাজ হালের 'গাহা সপ্তসই' নামের পদসংগ্রহের একটি পদে। হালকে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের লোক মনে করা হয়। কিন্তু এ গ্রন্থের কতগুলো পদ তত প্রাচীন নয় বলেই কোন কোন বিদ্বানের মত। অতএব রাধা বিষয়ক পদটিও আর্বাচীন অর্থাৎ নবম শতকের দিকের হওয়া বিচিত্র নয়। আনুমানিক সাত-আট শতকের কবি ভট্টনারায়ণের বেণীসংহার নাটকের নান্দী শ্লোকে এবং আনন্দ বর্ধনের ধ্বন্যালোকে উদ্ধৃত একটি শ্লোকে রাধ-কৃষ্ণর উল্লেখ রয়েছে। ইনিও নয় শতকে বর্তমান ছিলেন বলে পণ্ডিতগণের ধারণা। তারপর, কুন্তকের (১০—১১ শতক) 'বক্রোক্তি-জীবিতে', ত্রিবিক্রমের (১০ শতক) 'নলচম্পুতে', বল্লভদেবের (১০ শতক) 'মাঘের শিশুপালবধের টীকায় সোমদেব সূরির (১০ শতক) 'যশস্তিলকে' এবং তারপর কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয় প্রভৃতি গ্রন্থে রাধা ও রাধা-কৃষ্ণলীলার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উল্লেখ আছে। এর পরে বারো শতকে জয়দেবের গীতগোবিন্দই রাধা-কৃষ্ণলীলার প্রায়-পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ।

২৪ শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ—পৃঃ ১০৩—৭

॥ ৫ ॥

অনার্য প্রভাবে বৈদিক ধর্মের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন অনুসরণই আমাদের লক্ষ্য। এই অনার্য প্রভাব এত বেশী এবং সুদূর প্রসারী যে তা সহজে হৃদয়ঙ্গম করা একরূপ অসম্ভব। এখানে আমাদের আলোচনার ফলশ্রুতি দেয়া হলো ঃ আর্যগণ শুধু ঋগ্বেদ সম্বল করে ভারতে এসেছিলেন, এবং সংখ্যায়ও খুব বেশী এসেছিলেন বলে মনে করবার কোন কারণ নেই, সুতরাং বৈদিক ধর্মশাস্ত্রের যে ক্রমপরিণতি ও প্রসার ঘটেছে তাতে অনার্য অবদান তুচ্ছ নয়। অথর্ববেদ এবং সামবেদের কোন কোন সূক্ত এদেশেই রচিত হয়। ব্রাহ্মণ আর আরণ্যকও রচিত হয় এখানে। আরণ্যক বিধিতে যে ভাববাদী দ্রাবিড় প্রভাব পড়েছে, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। কেননা ক্রিয়া-সর্বস্ব বৈদিক ধর্মের সহসা কল্পনাশ্রয়ী হবার অন্য কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না।

এখানে কয়েকটি বিষয় প্রণিধান যোগ্য ঃ (১) বৈদিক সাধন-ভজন যজ্ঞের মারফৎই চলত (২) কোন বিশেষ দেবতার প্রতি আনুগত্য বা ভক্তি প্রদর্শন অপরিহার্য নয়, কারণ দেবতারা যজ্ঞ মারফৎ ভোগ পেলেই মূল্য স্বরূপ অভিষ্ট বরদানে বাধ্য। (৩) ভক্তিমার্গ ও জ্ঞানমার্গ তখনো প্রচলিত হয়নি। শুধু কর্ম মার্গই ছিল। (৪) সৃষ্টি বা স্রষ্টা, জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে গভীরতর জিজ্ঞাসা তখনো প্রবল হয়নি। (৫) তখনো পৌত্তলিকতা প্রশ্রয় পায়নি। এর পরের স্তরে বৈদিক আর্য ধর্মের মিশ্র বিকাশ হয় সাংখ্য ও যোগ দর্শনে। পরবর্তী যোগশাস্ত্র জটিল ও বিভিন্নমুখী হয়েছে। কপিল সাংখ্যসূত্র বোধ হয় খ্রীঃ পূঃ ৪র্থ-৩য় শতকে রচিত হয় আর খ্রীঃ পূঃ ২য় শতকে পতঞ্জলি যোগসূত্র রচনা করেন। খ্রীঃ প্রথম শতকের চরক ও আড়াঢ় ঋষি সাংখ্যমত নিয়ে আলোচনা করেছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। আধুনিক সাংখ্যমতের ভিত্তি হচ্ছে খ্রীঃ ৩য় শতকে রচিত ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্যকারিকা। সুতরাং সাংখ্য ও যোগ যে বৌদ্ধ-জৈন প্রভাবিত তাতে সন্দেহ নেই। সাংখ্য সিদ্ধান্ত প্রকৃতি ও পুরুষ তত্ত্ব ভিত্তিক। যোগ ঈশ্বরবাদী, সাংখ্য নিরীশ্বর।

বেদান্ত দর্শনের শঙ্কর বা ভাস্কর সিন্ধুদেশে মুসলমান বিজয়ের পরে আবির্ভূত হন। জ্ঞানমার্গ শঙ্করেরই সৃষ্টি। প্রজ্ঞা দ্বারাই মুক্তি বা মোক্ষলাভ ঘটে। তজ্জন্য "কোন প্রকার যাগযজ্ঞ, সন্ধ্যা-বন্দনাদি নিত্য কর্ম ; গ্রহণ প্রভৃতিতে স্নান, দান প্রভৃতি নৈমিত্তিক কর্ম ; কিম্বা নানা পূজা-অর্চনাদি কার্য-কর্ম করিবার

প্রয়োজন নাই। যাঁহারা বেদবিধি নিষেধাদি মানিয়া চলিবেন তাঁহারা তত্ত্ব জ্ঞানের অধিকারী নন।"[২৫] শঙ্করের মায়াবাদ ভাববাদী বৈরাগ্যপ্রবণ দ্রাবিড় মানসপ্রসূত। আনুষ্ঠানিক ধর্মের অস্বীকৃতি বৈদিক প্রভাব মুক্তির পরিচায়ক। জীব ও জগৎ প্রাতিভাসিক সত্যমাত্র—পূর্ণজ্ঞানে অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানের উন্মেষের সঙ্গে এর বিলুপ্তি। এই মায়াবাদ বৈরাগ্যবাদের জন্ম দেয়। শঙ্করের মতবাদকে অদ্বৈতবাদ বলে—তাঁর মতে ব্রহ্ম ছাড়া কিছুই নেই, সব মিথ্যে; অবিদ্যা বা অজ্ঞানতার দরুণ জীবন বা জগৎ সত্য বলে প্রতীয়মান হচ্ছে মাত্র। কাজেই ব্রহ্ম ছাড়া আর সব মিথ্যে—'একম্ এবা দ্বিতীয়ম্'। শঙ্কর জ্ঞান-প্রজ্ঞা লাভের সাধনা ছাড়া অন্য আরাধনা স্বীকার করেন না। শঙ্করের এই অদ্বৈতবাদ ও জ্ঞান মার্গ প্রবর্তনে ইসলামের প্রভাব আছে।

গীতায় ঋগ্বেদের কর্মবাদ স্বীকার করা হয়েছে, কিন্তু তার সঙ্গে অদৃষ্টবাদ—যা বেদে ছিলনা, যুক্ত হয়েছে। ফলে ধর্মের সঙ্গে শ্রদ্ধা ও ভক্তির রেশ মিশ্রিত হয়েছে। 'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন'—এ নিশ্চিতভাবে অবৈদিক। স্মরণ রাখা দরকার যে, গীতা অনার্যা মেছুনীর গর্ভজাত সন্তানের রচিত।

তারপর মুসলমান বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে এবং তার আগেও ইরানি সূফীতত্ত্বের প্রভাবে ভারতে 'ভক্তিবাদের' উদ্ভব হয়। ভাস্করের ভেদাভেদবাদ, শঙ্করের অদ্বৈত-বাদ, রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, মধ্বের দ্বৈতবাদ, নিম্বার্কের দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, বল্লভের শুদ্ধাদ্বৈতবাদ ও চৈতন্য দেবের অচিন্ত্যদ্বৈতাদ্বৈতবাদ ইসলামের প্রভাবেই উদ্ভূত হয়। এই ভক্তিবাদের মধ্যে অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত বৈরাগ্যবাদই জয়ী হল। মূলত শঙ্করের মায়াবাদে ব্যবহারিক জীবনের অর্থাৎ পার্থিব জীবনের যে অসারতা ঘোষিত হয়েছে, তা-ই ভক্তিবাদের আবরণে স্বীকৃত হল। জগৎ সত্য হলেও নিত্য নয়, সুখময় নয়। কাজেই যা নিত্য, যা চরম, যা পরম, যা হলে নিশ্চিন্ত হওয়া চলে, নির্দ্বন্দ্ব হওয়া সম্ভব হয়—তা'কে পাওয়ার সাধনাই জীবনের চরম ও পরম হওয়া উচিত। কাজেই অনিত্য সংসারের প্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শন করাই হচ্ছে বুদ্ধিমত্তা ও প্রজ্ঞা-বানের লক্ষণ।

গীতায় কর্মের কথা আছে, শঙ্করে জ্ঞানের কথা রয়েছে। এই কর্মবাদের সঙ্গে আর্যদের মানস-সম্পর্ক গভীরতর, জ্ঞানমার্গের সঙ্গেও যোগ সুদৃঢ়। তাই বর্ণ-

---

২৫ ভারতীয় দর্শনের ভূমিকা—পৃঃ ১৭

হিন্দুগণ গীতা ও অদ্বৈতবাদ সহজে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ভক্তিবাদের প্রসার অনার্যদের মধ্যেই বেশী। প্রজ্ঞালব্ধ মুক্তিও সবার পক্ষে সম্ভব নয়, কর্মলব্ধ মুক্তিও কি সহজ! তাই ভক্তিবাদ আভিজাত্যহীন জনসমাজে সাদরে গৃহীত হল। বৈরাগ্য-মানসজাত এই ভক্তিবাদ। নবম শতক থেকেই রাধাবাদ তথা রাধা-কৃষ্ণলীলার উদ্ভব। রাসও 'কৃষ্ণ-নাপ্পিন্নাই' লীলার প্রভাবেই পরিকল্পিত। আর চৈতন্য সমকালে ভক্তিবাদ প্রেমবাদে পরিণত হয়।

এদিকে যোগ ও সাংখ্যের প্রভাবে তান্ত্রিক ও যোগ সাধনার বহুল প্রচলন হল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, আর্য ব্রাহ্মণ্যবাদীদের মধ্যে গীতার কর্মবাদ ও শঙ্করের জ্ঞানবাদ, উচ্চশ্রেণীর অনার্যদের মধ্যে ভক্তিবাদ এবং নিম্নশ্রেণীর জন-সাধারণের মধ্যে যোগ ও তন্ত্র প্রাধান্য লাভ করেছিল। এর ফলে বৌদ্ধ বজ্রযানে নাথ-সহজিয়া মতের উদ্ভব হয়। তার জের রয়েছে বাউল মতে এবং বৈষ্ণব সহজিয়ায়। "এই তন্ত্র সাধনার একটি ধারা বৌদ্ধ দোঁহাকোষ ও চর্যাগীতিগুলির ভিতর দিয়া যে সহজরূপ লাভ করিয়াছে, তাহারই ঐতিহাসিক ক্রমপরিণতি বাঙ্গালা দেশের বৈষ্ণব সহজিয়া সাধনায় এবং বিশেষ বিশেষ বাউল সম্প্রদায়ের মধ্যে।[২৬] এবং "সহজিয়া ধর্মের সহিত সাদৃশ্য থাকায় সুফীবাদের সামঞ্জস্য বিধান হইয়া বাউল সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়।"[২৭] ব্রাহ্মণ্য শৈব ও বৌদ্ধ সহজিয়ার সমবায়ে গড়ে উঠেছে একটি মিশ্র মত—যার নাম নাথপন্থ। বামাচার নয়—কায়াসাধন তথা দেহতাত্ত্বিক সাধনাই এদের লক্ষ্য। হঠযোগের মাধ্যমেই এ সাধনা চলে। এক সময় এই নাথপন্থ এবং সহজিয়া মতের প্রাদুর্ভাব ছিল বাঙলায়। এ দুটো সম্প্রদায়ের লোক পরে ইসলামে ও বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হয়। কিন্তু পুরোনো বিশ্বাস-সংস্কার বর্জন করা সম্ভব হয়নি বলেই ইসলাম ও বৈষ্ণব ধর্মের আওতায় থেকেও এরা নিজেদের পুরোনো প্রথায় ধর্ম সাধনা করে চলে, তার ফলেই হিন্দু-মুসলমানের মিলিত বাউল মতের উদ্ভব। ডক্টর উপেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্যের মতে মুসলমান মাধব বিবি ও আউল চাঁদই বাউল মতের প্রবর্তক এবং মাধব বিবির শিষ্য নিত্যানন্দ-পুত্র বীরভদ্রই বাউল মত জনপ্রিয় করেন।[২৮]

---

২৬ শশিভূষণ দাশগুপ্ত : বিশ্বভারতী পত্রিকা : মাঘ-চৈত্র সংখ্যা ১৩৬২ পৃ : ১৯৪

২৭ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ—সুশীল কুমার গুপ্ত : পৃ : ৬

২৮ বাংলার বাউল ও বাউলগান—ভূমিকা।

॥ ৬ ॥

এবার বাংলার কথায় আসা যাক। বাংলাদেশে ভক্তিধর্মের উদ্ভব সম্বন্ধে ডঃ সুকুমার সেন বলেন, "মহাযানের উপাস্য নরদেবতা অবলোকিতেশ্বর বাংলাদেশে লোকনাথ নাম নিয়ে বিষ্ণুর রূপান্তরে পরিণত হয়েছিলেন। এবং উত্তরাপথে বাসুদেব কৃষ্ণকে অবলম্বন করে যেমন ভক্তিপরায়ণ ভাগবত মত উদ্ভূত হয়েছিল, বাংলাদেশে তেমনি লোকনাথকে আশ্রয় করে ভক্তিধর্মের অঙ্কুর উদ্‌গত হয়েছিল। —বাংলাদেশে রাধাকৃষ্ণের প্রেমকাহিনী বহুকাল থেকে প্রচলিত থাকলেও এই কাহিনীকে অবলম্বন করে অত সহজে ভক্তিধর্মের বিকাশ হয়নি, যত হয়েছিল অবলোকিতেশ্বর লোকনাথকে আশ্রয় করে। —বৌদ্ধমতের ভক্তিভাবের সঙ্গে রাধা-কৃষ্ণের কথাশ্রিত বৈষ্ণব ভক্তিভাবের একটু তফাৎ আছে। বৈষ্ণব মতে ভক্তি-জ্ঞানশূন্য এবং লীলাস্মরণ সাধনার একটা প্রধান অঙ্গ, কিন্তু বৌদ্ধমতে ভক্তি জ্ঞানেরই অঙ্গ।"[২৯] এখানে নাথ-ও সহজপন্থ স্মরণীয়। সদগুরু থেকে 'জ্ঞান' (মহাজ্ঞান) না পেলে সাধনায় সিদ্ধি নেই। বৌদ্ধভক্তিবাদ চৈতন্য ও তাঁর আগের যুগে জয়দেব মিশ্র, চণ্ডীদাস, মাধবেন্দ্র পুরী প্রভৃতিকে পরোক্ষ ভাবে প্রভাবিত করেছে। (প্রত্যক্ষ প্রভাব এসেছিল সুফী মত এবং উত্তর ও দক্ষিণ ভারত থেকে।) তেরো শতকের বৌদ্ধ রামচন্দ্র কবিভারতীর ভক্তিশতক ও বৃত্রমালার প্রভাবও হয়তো চৈতন্য দেবের উপর পড়েছিল।

সুতরাং বাংলায় বৈষ্ণব, সহজিয়া, বাউল, মুর্শিদা, নাথপন্থ ও বৌদ্ধ সহজিয়া প্রভৃতি মত অনার্য মনোভঙ্গীরই প্রকাশ। ডঃ সুকুমার সেন বলেন, "বাংলা দেশে শাস্ত্রীয় বৈষ্ণব ধর্মের মধ্যে যেমন পূর্বেকার ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ ভক্তিবাদের যুক্তবেণী প্রবাহিত হয়ে এসেছে, তান্ত্রিক বৈষ্ণব অর্থাৎ বাউল সহজিয়া ইত্যাদি মতের মধ্যে তেমনি পূর্ব যুগের শৈব ও বৌদ্ধ তান্ত্রিক মতবাদের পরিণতি দেখা যায়। অষ্টম শতাব্দী কিংবা তারও পর থেকে বাংলা দেশে অনুন্নত শ্রেণীর মধ্যে তান্ত্রিক ভাবের দু'টি ধর্মমত চলিত ছিল—শৈব নাথ মত এবং বৌদ্ধ সহজিয়া মত (নাথপন্থ ও চর্যাপদের সহজিয়া)। এই দুই মতের সাধনায় ও দর্শনে বিশেষ পার্থক্য ছিল না। নাথ সন্ন্যাসীরা নিজেদের 'যোগী' বা 'কাপালিক' বলত, এরা কানে নরাস্থি কুণ্ডল, কণ্ঠে নরাস্থি মালা, পায়ে নূপুর ও হাতে নরকপাল ধারণ করত এবং গায়ে ছাই

---

২৯ প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী।

মাখত। এদের আহার বিহার ছিল কদর্য, তাই গ্রামের বাইরে ছিল এদের কুঁড়ে ঘর। যোগীদের নামের শেষে শব্দ হত 'নাথ', বর্তমান সময়ে যুগীজাতির (তাঁতি) মধ্যে নাথ পদবী ও পূর্বেকার আচার-অনুষ্ঠান কিছু কিছু চলিত আছে। শৈব ও বৌদ্ধ সহজ সাধকেরা দেহতত্ত্বের সাধনা করত এবং আবশ্যক হলে যোগিনী বা অবধূতী অর্থাৎ সাধন সঙ্গিনী গ্রহণ করত। এদের সাধনার সঙ্কেত নিহিত আছে চর্যাপদে।---চর্যাপদগুলো বাংলা পদাবলীর আদিরূপ।"[৩০] ধর্মপূজাকেও আমরা হিন্দু-বৌদ্ধ প্রভাবিত অনার্য ধর্ম বলেছি। সমাজের নিম্নস্তরে তখনো অনার্য প্রথায় স্থানীয় দেব-দেবী প্রভৃতি উপ-দেবতার পূজা বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। জাঙ্গুলী, বাসুলী, বজ্রতারা, চণ্ডিকা, মনসা, ক্ষেত্রপাল, শিব, ষষ্ঠী, যক্ষ ("মদ্য মাংস দিয়া কেহ যক্ষপূজা করে"—চৈঃ ভাঃ), শীতলা, ওলা, ধর্মঠাকুর প্রভৃতি সে-কালীন দেবতার অধিকাংশের উদ্ভব ও প্রভাব ক্ষেত্র রাঢ় অঞ্চলই ছিল বলে মনে হয়। চণ্ডীমঙ্গলে তাই দেখতে পাই—"ব্যাধ গোহিংসক জাতিতে চোয়াড়। কেহ না পরশ করে লোকে বলে রাঢ়।"—এ ব্রাহ্মণ্যবাদী বর্ণ হিন্দুর কথা। 'সদুক্তিকর্ণামৃতে'র একটি শ্লোকে এই রকম গ্রাম্য পূজার বিবরণ পাওয়া যাচ্ছে :

"তৈস্তৈর্জীবোপহারৈর্গিরিকুহরশিলাসংশ্রয়ামচয়িত্বা
দেবীং কান্তার দুর্গা রুধিরমুপতরু ক্ষেত্র পালায় দত্বা।
তুম্বীবীণা বিনোদ ব্যবহৃত সরকামহ্নি জীর্ণে পুরাণীং
হালাং মালুরকোষৈর্মু বতিনাহচরা বর্ব বাঃ শীলয়ন্তি ॥

সুকুমার সেনের মতে "অনেকগুলো আর্য ও অনার্য দেবতা মিলে ধর্মঠাকুর হয়েছেন। বৈদিক বরুণ ও রথারোহী সূর্য, অবৈদিক কূর্মাবতার, ঈরানীয় বুটপরা ঘোড়াচড়া সিপাহী মিহির, ভবিষ্যৎ বা পৌরাণিক কল্কি অবতার ও অনার্য পাষাণ, তাম্রধাতু ও বৃক্ষ-দেবতা—এই সব মিলে ধর্মঠাকুরের উদ্ভব।

"ধর্মঠাকুরের ধ্যানে তাঁকে শূন্যমূর্তি বলা হয়েছে। এই শূন্য বৌদ্ধ মহাযান মতের শূন্য নয়। এখানে শূন্য মানে নিষ্কলঙ্ক শুভ্র। ধর্মদেবতা নিষ্কলঙ্ক সর্বশ্বেত, তাঁর বাহন উলুক বা উল্লুক হচ্ছে শাদা পেঁচা বা শাদা কাক। রূপকচ্ছলে ধর্ম-ঠাকুরকে সাদা হাঁস কল্পনা করা হয়েছে। সিপাহী মূর্তিতেও তাঁর বাহন শ্বেত-অশ্ব। ধর্মপূজার মন্ত্রে, সূর্যকে 'নিরঞ্জন' 'শূন্যদেহ' বলা হয়েছে। ধর্মঠাকুরের প্রতীক যা পূজা করা হত, তা হচ্ছে কূর্মাকৃতি পাষাণখণ্ড অথবা পাষাণ নির্মিত

৩০ প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী।

কূর্ম বিগ্রহ। কূর্ম-প্রতিমার পৃষ্ঠে সাধারণতঃ ধর্মঠাকুরের পাদুকাচিহ্ন আঁকা থাকত। এই পাদুকাচিহ্নই ধর্মঠাকুরের আসল প্রতীক। ধর্মপণ্ডিত অর্থাৎ ধর্মপূজার যাঁরা পুরোহিত তাঁরা সর্বদা গলায় ধর্মঠাকুরের পাদুকা ঝুলিয়ে রাখতেন। ধর্ম ছিলেন আদিতে যোদ্ধা ডোম জাতির দেবতা, তাই ডোমেরাই ধর্মপূজার প্রধান অধিকারী ছিল। এখন কৈবর্ত, বাগদি, ধোপা, শুঁড়ি ইত্যাদি নানা জাতির ধর্মপণ্ডিত দেখা যায়। যেখানে ধর্মঠাকুর শিব বা বিষ্ণু হয়ে গেছেন সেখানে পৌরহিত্য ব্রাহ্মণে গ্রহণ করেছে।"[৩১]

॥ ৭ ॥

অধিকাংশ মুসলমান এদেশী জনগণেরই বংশধর। উক্ত সব ধর্ম, দর্শন ও সংস্কার তাদের অস্থিমজ্জার সঙ্গে মিশে রয়েছে। তাতে আবার শরীয়তের সঙ্গে সাক্ষাৎ-সম্পর্ক রাখাও সম্ভব হয়নি অশিক্ষা ও সুফী মতের প্রাবল্যের দরুণ। কাজেই সুফীতত্ত্বের সঙ্গে যেখানেই সাদৃশ্য-সামঞ্জস্য দেখা গেছে, সেখানেই মুসলমানেরা অংশ গ্রহণ করেছে। এভাবে বৌদ্ধ নাথপন্থ, সহজিয়ার তান্ত্রিক সাধনা, শাক্ততন্ত্র, যোগ, ইউনানী-দর্শন প্রভৃতি তাদের আকৃষ্ট করেছে। এবং এরূপে তারা মিশ্র-দর্শন খাড়া করেছে। ডক্টর সুনীতি চট্টোপাধ্যায় বলেন "পীর, ফকির, দরবেশ, আউলিয়া প্রভৃতিদের প্রচার এবং কেরামতীর ফলে, মুখ্যতঃ ব্রাহ্মণদের প্রতি বিদ্বেষ-পরায়ণ বৌদ্ধ ও অন্যান্য মতের বাঙ্গালী, ইসলামধর্ম গ্রহণ করে।…বাঙ্গালাদেশে ইসলামের সুফীমত বেশী প্রসার লাভ করে। সুফীমতের ইসলামের সহিত বাঙ্গালার সংস্কৃতির মূল সুরটুকুর তেমন বিরোধ নাই। সুফীমতের ইসলাম সহজেই বাঙ্গালার প্রচলিত যোগমার্গ ও অন্যান্য আধ্যাত্মিক সাধনমার্গের সঙ্গে একটা আপোষ করিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিল।"[৩২] আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদও বলেন, "আধ্যাত্মিক বা মারফতী সাহিত্যে ইরানের সুফী প্রভাবও রয়েছে এবং বাউল-মুর্শিদা সাহিত্য ছাড়াও নিছক দার্শনিকতত্ত্ব এখানে কম মেলে না। এ সব বিভিন্ন ধারার সমন্বয়ের কারণ বোধ হয় এই যে, মানুষের হৃদয়ানুভূতিতে ও মননে এমন একটি স্তর আছে, যেখানে সব ভেদাভেদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যায়। আমাদের দেশের সাধকগণ

---

৩১ প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী।

৩২ জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য পৃঃ ২৫-২৬

অতিমাত্রায় আচার বর্জিত ও মর্মনিষ্ঠ। তাই এমন নির্বিচার সমন্বয় সম্ভব হয়েছে। হরগৌরী সংবাদ, জ্ঞান-প্রদীপ, যোগকালন্দর, আগম, জ্ঞানসাগর, আবদুল্লার সওয়াল, মুসার সওয়াল, মল্লিকার সওয়াল, ইউনান দেশের পুথি, গোরক্ষবিজয়, সিরাজ সবিল, নুরজামাল প্রভৃতি গ্রন্থ এ শ্রেণীর।"[৩৩]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বাঙালী মুসলমান মরমীয়ারা যে সাধনপন্থ আবিষ্কার করেছেন, তা একান্তভাবে ইসলামী নয়। বস্তুত ভারতিক সূফীমতবাদও একান্ত-ভাবে আরব্য-পারসিক নয়। এতে যেমন ভারতিক দর্শনের প্রচুর প্রভাব পড়েছে, তেমনি বাঙালী মরমীয়াদের দর্শনে ও ধর্মে প্রচুর দেশজ তথা ভারতিক উপাদান রয়েছে। ফলে এদেশে চিরকাল হিন্দু-মুসলমান হাতে হাত মিলিয়ে ও মনে মন মিশিয়ে অধ্যাত্ম-সাধনা করেছে। এ ভাবেই বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত সাধনায় মরমীয়াদের উপমতগুলো সৃষ্টি হয়েছে। অবশ্য নিরক্ষর জনগণের ধর্ম ও দর্শন বলে এগুলো আশানুরূপ পুষ্ট হয়নি। একথাও অনস্বীকার্য যে বৈষ্ণবমতই প্রথম হিন্দু-মুসলমানকে একই সাধন ক্ষেত্রে কিছুটা আকৃষ্ট করে। অতএব এগুলো কোন বিশেষ ধর্ম, বিশ্বাস বা সংস্কারের পরিচয় বহন করে না। জগৎ ও জীবনের রহস্য সম্বন্ধে মানুষের চিরন্তন জিজ্ঞাসা এবং তার রহস্য-উদঘাটনের চির কৌতূহল থেকেই এর জন্ম। এ প্রয়াস তাই ধর্ম নিরপেক্ষ। যে-স্তরের অনুভূতিতে মানবমনে দেশ-কাল-পাত্র ও বিশ্বাসের ভেদাভেদ ঘুচে যায়, এ-গুলো সে-স্তরের অনুভূতি ও উপলব্ধির অভিব্যক্তি। তাই সৈয়দ সুলতান, শেখচান্দ প্রভৃতি ইসলাম ও নবী-কাহিনী যেমন শুনিয়েছেন, তেমনি আবার এসব মরমীয়াবাদও প্রচার করেছেন।

॥ ৮ ॥

মুসলমানদের কোরআনের মধ্যেই সুফীতত্ত্ব নিহিত ছিল বলে অনেকের বিশ্বাস। ভাবপ্রবণ হৃদয়বান ইরানিদেরই প্রথমে তা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করে। মূলত কোরআন থেকেই সুফী মতের সমর্থন পাওয়া গেলেও এর পুষ্টি ও প্রসার ঘটে ভারতিক বেদান্তের পরোক্ষ এবং নিউপ্লাটনিক দর্শনের প্রত্যক্ষ প্রভাবে। দেখতে দেখতে ইরানে মরমীয়াদের সংখ্যা আশাতীতরূপে বেড়ে গেল। হাফেয, রুমী, জামী, ওমর খৈয়াম প্রভৃতি কবির সৃষ্টির মাধ্যমে তা ইরানের সীমা অতিক্রম

৩৩ পুথি সাহিত্যের বিষয়বস্তু—এলান—১৯৫২।

করে গোটা মুসলিম জগতে ছড়িয়ে পড়ে। বলা বাহুল্য, সুফীদের আল্লাহ আর 'সচ্চিদানন্দে' দৃশ্যত পার্থক্য কিছুই নেই।

মুসলমান অধিকারের পূর্বে ও পরে ভারতে যাঁরা ইসলাম প্রচার করেছিলেন তাঁরা সবাই সুফী দরবেশ ছিলেন। এই মরমীয়াদের অনেকেরই সঙ্গে শরীয়তের বাহ্যানুষ্ঠানের বিশেষ সম্পর্ক ছিল না। অথচ সাধারণ লোকের পক্ষে ধর্ম আচারিক ও আনুষ্ঠানিক না হলে ধর্মাচরণ দুঃসাধ্য। সাধারণ মানুষের আধ্যাত্মিক ও পারমার্থিক সাধনা বাহ্যানুষ্ঠান ও আচরণের মাধ্যমেই চলে। ফলত, পীর-দরবেশ-আউলিয়া প্রচারিত ধর্মে দীক্ষিত হয়ে ভারতের প্রথমযুগের মুসলমানেরা মুসলিম সংস্কৃতি গ্রহণ করবার সুযোগ পায়নি। ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে পীরপূজা প্রচলিত হয় এভাবেই। তাতে কোন হিন্দু প্রভাব নেই। তবে এই পীরবাদের সঙ্গে হিন্দুর গুরুবাদের পূর্ণ সামঞ্জস্য রয়েছে।

সুফীদের মূল বক্তব্য হচ্ছে, সৃষ্টিটা স্রষ্টার আনন্দজাত। তিনি চাইলেন—'কুন্‌ফায়াকুন্' (Be it so, and it is so) অর্থাৎ সৃষ্টিটা কারো অনুরোধে বা গরজে হয় নি। স্রষ্টা তাঁর খেয়াল-খুশীর খাতিরে আনন্দ সহচর হিসেবেই তা করেছেন। এ তাঁর লীলা। অসমানে প্রণয় হয় না। নির্দ্বন্দ্ব, নির্বিঘ্ন ও অকৃত্রিম আনন্দ পেতে হলে বন্ধু সাহচর্যই কাম্য। কারণ, হৃদয়ের অসংকোচ প্রকাশ একমাত্র প্রণয়ের সম্পর্কেই সম্ভব। সুতরাং স্রষ্টা যেখানে আমোদ ভোগের জন্যই জগৎ সৃষ্টি করেছেন, সেখানে সৃষ্টি-সেরা মানুষের সঙ্গে তাঁর বান্দা-মনিব সম্পর্ক হতে পারে না। তাহলে যে সৃষ্টির সার্থকতা থাকে না—স্রষ্টার উদ্দেশ্যই যে ব্যর্থ হয়! যেখানে প্রণয় আছে, সেখানে গতিবিধি অবাধ হওয়াই স্বাভাবিক। কোন নিয়ম-শৃঙ্খলার বাধা সেখানে অবাঞ্ছিত নয় শুধু, অসম্ভবও। কাজেই আল্লাহর সঙ্গে যেখানে মানুষের প্রণয়ের সম্পর্ক, সেখানে বান্দা-মনিবের, পিতা-পুত্রের বা ভক্ত-ভগবানের সম্পর্ক কল্পনা করাও বাতুলতা। কাজেই নামাজ-রোজা বা এই প্রকার আনুগত্যের প্রশ্নই অবান্তর। ফলে শরীয়ৎ সেখানে নিরর্থক। অনুরাগে প্রণয়ের উন্মেষ, বিরহবোধে উপলব্ধি এবং মিলনে এর সার্থকতা। প্রেমের ধর্ম হচ্ছে—প্রেমিক প্রেমাস্পদ পরস্পর পরস্পরকে আত্মস্থ করতে আকুল হবে, পরস্পরের মধ্যে আত্মবিলোপে কৃতার্থ হবে। এ প্রেম জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার প্রেম। জীবাত্মা হচ্ছে পরমাত্মার খণ্ডিতাংশ। বিন্দু বিন্দু বারি নিয়ে সমুদ্র। কিন্তু বিন্দুর একক শক্তি কতটুকু! তাই তার অস্তিত্ব রক্ষার গরজেই সমুদ্রের জন্য তার আকুলতা। নইলে যে তার অপমৃত্যু সুনিশ্চিত। বিন্দুস্বরূপ জীবাত্মার তাই

পরমাত্মার জন্যে এমনি আকুলতা। গরজ জীবাত্মার ; তাই সে প্রেমিক—তাই সে রাধা। পরমাত্মারও গরজ আছে—যেমন সমুদ্রও বারিবিন্দুর উপর নির্ভরশীল। কিন্তু কোন বিশেষ বিন্দুর জন্যে তার বিশেষ আকুলতা নেই। এজন্যেই জীবাত্মা সদাউদ্বিগ্ন পাছে সে বাদ পড়ে। তাই রাধা বলে,—'এই ভয় উঠে মনে এই ভয় উঠে, না জানি কানুর প্রেম তিলে জনি টুটে।' প্রেমের পরিণতি একাত্মতায়, যখন বলা চলে 'আনল হক বা সোহম।' এ অবস্থাটা সুফীর ভাষায় ফানাফিল্লাহ কিংবা বাকাবিল্লাহ, বৈষ্ণবের কথায় যুগলরূপ বা অভেদরূপ। (তুঃ—চৈতন্যদেব মুই সেই, মুই সেই)—এই দুটো কথায় সূক্ষ্ম দার্শনিক অর্থের মারপ্যাচ আছে। তবে অবস্থা ও অভিপ্রায়টা মূলত একই।

'কুনফায়াকুন' দ্বৈতবাদের পরিচায়ক। পক্ষান্তরে, 'একোহম বহুস্যাম' অদ্বৈতবাদ নির্দেশক। সুফীরা মুসলমান, তাই দ্বৈতবাদী, কিন্তু অদ্বৈত সত্তার অভিলাষী। বৈষ্ণবগণ ব্রহ্মবাদের প্রচ্ছায় গড়া, তবু তাদের সাধন চলে দ্বৈতবোধে এবং পরিণামে অদ্বৈত সত্তার প্রয়াসে। সুফী ও বৈষ্ণব উভয়েই পরমের কাঙাল। মানবাত্মার সুপ্ত বিরহবোধের উদ্বোধনই সুফী-বৈষ্ণবের প্রধান কাজ। কেননা রুমীর কথায়—

দানা চুঁ অন্দর জমিন পেন্‌হা শওয়াদ।
বাদ আজেঁা সারে সবজি বস্তা শওয়াদ।।

জীবাত্মা তখন বংশীর ন্যায় বলে—বশোনো আজনায়ে চুঁ হেকায়েত মি কুনদ।...

এজন্যে রবীন্দ্রনাথ বলেন,

বিরহানলে জাল রে তারে জালো:
রয়েছে দীপ না আছে শিখা, এই কি ভালে ছিল রে লিখা
ইহার চেয়ে মরণ সে যে ভালো।

তাই সুফীগানে ও বৈষ্ণবপদে আমরা মিলন-পিপাসু বিরহী আত্মার করুণ ক্রন্দনধ্বনি শুনতে পাই। সুফী গজল ও বৈষ্ণব পদ-সাহিত্য মানবাত্মার চিরন্তন Tragedyর সুর ও বাণী বহন করছে। না-পাওয়ার বেদনা আর পেয়ে-হারানোর শংকা—কোন্‌টার চেয়ে কোন্‌টা কম! তাই চিরকাল 'হিয়ার পরশ লাগি হিয়া' যেমন কাঁদে এবং 'লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়া রাখলুঁ, তবু হিয়া জুড়ন না গেল', তেমনি 'দুহুঁ ক্রোড়ে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।' এর শেষ নেই, সমাধান নেই। এ সাধনাও বড় কঠিন সাধনা। ঘৃণা-লজ্জা-ভয়—এ তিন থাকতে কিছুই হয় না। ধন-জন-মানের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করলে, তবে ঘৃণা-লজ্জা-ভয় ঘুচে যায়। এ জন্যেই এতে সবাঁর অধিকার নেই। সুফী বৈষ্ণবেরা তাই পণ্ডিত ও ধর্মধ্বজীদের উপহাস

করেন। হাফেজ• বলেন,

চাল সুরা সখি, সাজাও পেয়ালা, শরম আছে কি তার,
প্রেমের মরম তারা কি জানে লো—ধরম যাহারা চায়।

চণ্ডীদাস বলেন,

মরম না জানে ধরম বাখানে এমন আছএ যারা
কাজ নাই সখি, তাদের কথায় বাহিরে রহুন তারা।

মুসলমানদের ভারত অধিকার ভারতবর্ষের সামাজিক ও কৃষ্টির ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ইতিপূর্বে শক-হূনদল এসেছিল; ভারতবাসীরা অনায়াসে তাদের গ্রহণ করতে পেরেছিল। কিন্তু বহিরাগত তুর্কী-পাঠান মুসলিমকে এদেশীয় সমাজ আত্মস্থ করতে পারেনি। তার কারণ, মুসলমানেরা শুধু বিশেষ আকৃতি, প্রকৃতি ও বাহুবল সম্বল করে আসেনি, এনেছিল যুক্তিনির্ভর এবং প্রত্যয়-দৃঢ় ধর্ম, সমাজ, আচার আর রাষ্ট্রাদর্শ, যার সামাজিক ও পারমার্থিক প্রভাব ছিল অসাধারণ। এত অসাধারণ যে, তা আজকের দিনের বোলশেভিকবাদের চেয়েও সর্বগ্রাসী এবং আনবিক বোমার চেয়েও বিস্ময়কর। ফলে, মুসলমানদের এক দেহে লীন করা কোন মতেই সম্ভব হয়নি। কিন্তু আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ্য ধর্মও পর্যুদস্ত হবার নয়। এর অন্তর্নিহিত শক্তিও এই নবশক্তির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার যোগ্য ছিল। ফলত, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম না হল ইসলামে বিলীন, আর না পারল মুসলমানদের বিলীন করতে। বিজেতা ও বিজিতের তথা শাসক ও শাসিতদের মধ্যকার এ স্বার্থবিক• দ্বন্দ্ব বড় তীব্র হয়ে দেখা দিল। কেউ কাকেও না পারে গ্রহণ করতে, না পারে গ্রহণ করাতে। অবস্থাটা যেন, 'কেহ কারে নাহি জিনে সমানে সমান'। উভয় পক্ষই বুঝলো এ অবস্থা অসহ্য। এর আশু সমাধান প্রয়োজন। কিন্তু এসব অভিজাত হিন্দুর কথা। এদিকে বর্ণাশ্রম কণ্টকিত অনুদার রক্ষণশীল হিন্দু সমাজে নিপীড়িত শূদ্রগণ ইসলামের সাম্য-ভ্রাতৃত্বের চুম্বকার্ষণে এতই বিচলিত হয়েছিল যে, স্বধর্মে সুস্থির থাকা তাদের পক্ষে আর সম্ভব হচ্ছিল না। আগ্রহ প্রবল হলেও মন যা চায় তা পাওয়া অধিকাংশের পক্ষেই সহজ ছিল না। নবধর্ম গ্রহণে ত্রিবিধ বাধা ছিল: প্রথমত, প্রাচীন সংস্কারের মোহ ও ভয়, দ্বিতীয়ত, হিন্দু-সমাজ-পতির কোপ-দৃষ্টি, তৃতীয়ত, ইসলাম সম্বন্ধে অনিশ্চিত জ্ঞান। ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় অধিকার বঞ্চিত নিপীড়িত নিম্নবর্ণের হিন্দুগণ ইসলামের উদার সমাজ-ব্যবস্থা ও সাম্য দর্শনেই প্রলুব্ধ হয়েছিল এবং আজন্ম পোষিত মায়াবাদের সঙ্গে বহু-শ্রুত সুফীতত্ত্বের অপূর্ব সামঞ্জস্য দর্শনে

কিছুটা আশ্চর্যও হয়েছিল। এভাবে নিম্নবর্ণের হিন্দুগণের ঘরের বাঁধন আলগা হয়ে গেল, পথে নামলো, কিন্তু ইসলামের আশ্রয় নিতে পূর্বোক্ত কারণে ছিল প্রচুর শংকা। দাদূর ভাষায়—হিংদু তুরুক ন হোইবা সাহিব সেতী কাজ। কাজেই নির্ভৈ নির্পথ হোই। তাই ঘরেও নয়, গন্তব্যেও নয়, পথ চলে পথের দিশা পাওয়ার প্রয়াস দেখা দিল। হিন্দুর মায়াবাদ ও মুসলমানের সূফীতত্ত্বের সমন্বয়ে নবদর্শন আবিস্কৃত হল, অর্থাৎ নতুন ধর্ম সৃষ্টি হল। সক্রেটিসের 'Knoweth thyself' উপনিষদের 'আত্মানাং বিদ্ধি', ইসলামের 'মান আরাফা নাফসাহু ফাকাদ আরাফা রাব্বাহু।' বা উপনিষদের 'তং বেদ্যং পুরুষং বেদ মা বো মৃত্যু পরি ব্যথাঃ।' এই হল নবধর্মের মূল দর্শন বা মন্ত্র। ধর্ম সাধনার উদ্দেশ্য যখন 'মনের মানুষ'কে পাওয়া, তাহলে হিন্দুয়ানি, মুসলমানির বেড়াজালে আটকে পড়ার দরকার কি? শংকরাচার্যের দর্শন তখনও আলোচিত তত্ত্ব এবং পারস্য-সাহিত্যের মারফত হাফেয, জামী, রুমী, আত্তার, খৈয়ামের বাণী মুখে মুখে উচ্চারিত সত্য। কাজেই এ আন্দোলনের ইন্ধন ছিল হাতের কাছেই।

এরূপে ভারতের দিকে দিকে ধর্ম সমন্বয় ও ঐক্যের বাণী ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে লাগল, রামানন্দ, একলব্য, দাদূ, নানক, কবীর, চৈতন্য, রামদাস, বল্লভাচার্য প্রমুখ সাধক-প্রচারকদের আবির্ভাব ঘটল। শাস্ত্রাধিকার, সামাজিক সত্তা ও জীবনে নিরাপত্তাবোধের অবচেতন প্রেরণা থেকেই হয়তো এসব ধর্মান্দোলন শুরু হয়। কিন্তু অনতিকাল মধ্যে এগুলো ইসলাম ও দণ্ডধর মুসলিম শক্তিকে বাধা দেবার বা বিতাড়িত করার সচেতন প্রয়াস হিসেবে প্রকট হয়ে উঠে। শিখ বা বৈষ্ণব আন্দোলনে যে এ উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল—তার বহু প্রমাণ রয়েছে। রাষ্ট্রিক প্রয়োজনে বাদশাহ আকবর থেকে গান্ধীর কাল পর্যন্তও সমন্বয় সাধনা অব্যাহত ছিল। এ পথে গান্ধীর 'রামধুন' সংগীত ও নজরুলের কয়েকটি কবিতাকে শেষ প্রয়াস বলে ধরে নেয়া যেতে পারে। সূফী কবির দেওয়ান, গজল ও রুবাইর অনুকরণে অধ্যাত্ম সংগীতও রচিত হয়েছে। চর্যগীতি ও দোঁহার আমল থেকেই গণভাষায় রচিত পদ ও দোঁহা ধর্মমত ও তত্ত্ব প্রচারের বাহনরূপে ব্যবহৃত হচ্ছে।

এঁদের উদ্দেশ্য ও সাধনা সার্থক হয়েছিল। ইসলাম সত্য সত্যই বড় বাধা পেল। এর গতি প্রায় স্তব্ধ হয়ে গেল। ইসলাম আর বিশেষ প্রচার বা প্রসার লাভ করল না। এর আগে মদিনা থেকে পশ্চিম পাঞ্জাব অবধি ইসলামে দীক্ষা অপ্রতিহত ছিল। শুধু তাই নয়, কিছু মুসলমান তাঁদের মতে দীক্ষাও নিল—বিশেষত শিখ ও বৈষ্ণব ধর্মে। প্রকৃতপক্ষে হিন্দু ধর্মের আওতায়ও তারা রইল না।

এগুলো হিন্দু-মুসলিম ধর্ম দর্শনের সমন্বয়ে সম্পূর্ণ নতুন ধর্ম। কিন্তু প্রচারকগণ নামত হিন্দু হওয়ায় ও ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, রাধা-কৃষ্ণ প্রভৃতি নামধার হিন্দুয়ানির রেশ থাকাতে এরা জাতি অর্থে হিন্দুই রয়ে গেল। তাতে উত্তরকালে রাজনীতি-ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের প্রচুর সুযোগ-সুবিধা হয়। সুতরাং এরা নামগত জাতিতে হিন্দু ও ধর্মগত জাতিতে আলাদা। যেমন, রাজা রামমোহন রায়ের নাম-মাহাত্ম্যে ব্রাহ্মগণ নিজেদের ব্রাহ্মণ্য ধর্মের শাখানুসারী বলে মনে করে। ফলত, এরা জাতিতে হিন্দুই রয়ে গেল। বস্তুত, রামমোহনের ব্রাহ্ম ধর্মও সচেতনভাবে খৃষ্টধর্মের প্রসার রোধকল্পে প্রবর্তিত হয়েছিল আর উদ্দেশ্য সিদ্ধও হয়েছিল।[৩৪]

উক্ত ভাব সাধকদের মধ্যে জোলা শ্রেণীর কবীর এবং ধুনকর সম্প্রদায়ের দাদূ ও রজ্জব মুসলমান ছিলেন। মুসলমান হয়েও তাঁরা ধর্মান্দোলন করেছিলেন—তার কারণ এঁরা নিম্নশ্রেণীর উৎপীড়িত হিন্দুসমাজ থেকে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন সূফীদের হাতে। শরিয়তী ইসলামের সঙ্গে পরিচয়ের অভাব, পূর্ব সংস্কারগত মায়াবাদের প্রভাব এবং সূফীতত্ত্বের উদার আবহাওয়া এদেরকে ভাবরসে বা প্রেম-সাধনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। বৈচিত্র্য ও বিভেদের মধ্যেও যে আত্মার স্বরূপ এক ও অবিকৃত এই সমন্বয় পন্থিগণ তা-ই প্রচার করেছেন। এ সব ধর্মান্দোলনের ব্যবহারিক উদ্দেশ্য ছিল বর্ণভেদ প্রথা এবং শাস্ত্রে অনধিকার রহিতকরণ আর মনুষ্য-সত্তায় মর্যাদা দান। তা পুরোপুরি সফল হল। তাই ইসলাম আর প্রসার লাভ করেনি। এর প্রভাবই সমাজ সংস্কারে প্রয়োজনীয় ফল দান করল। যেমন, য়ুরোপে ইসলামের অনুকরণে Protestant মত প্রচারই নবযুগ সৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

বাংলাদেশে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বে চণ্ডীদাসও এরূপ একজন সাধক ছিলেন। সূফী প্রভাবে তিনিও প্রেম ধর্ম প্রচার করেন এবং বর্ণভেদের বিরুদ্ধে তিনিও বলে উঠেন 'শুন হে মানুষ ভাই: সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।' এর পরে মাধবেন্দ্রপুরী এবং তারপরে চৈতন্য।

---

৩৪ "এই সময় ব্রাহ্মধর্ম প্রবর্তিত হইয়া সংশয়বাদী চিত্তের আশ্রয় স্থল হইয়াছিল এবং যাঁহারা খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিতেন তাঁহারা অনেকেই ব্রাহ্মধর্মের শরণ লইয়াছিলেন। এই ভাবে ব্রাহ্মধর্ম সমাজের ভাঙ্গনকে রোধ করিতে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল। ......ব্রাহ্মধর্ম যাহারা গ্রহণ করিয়াছিল, তাহারা হিন্দু সমাজের সহিত যোগসূত্র রক্ষা করিয়া চলিত। বস্তুত হিন্দুধর্মাদর্শে বিশ্বাস ছিল না অথচ ধর্মান্তর গ্রহণ করে নাই এইরূপ সংখ্যাই ইয়ং-বেঙ্গলের মধ্যে বেশি ছিল।

—উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নব জাগরণ : সুশীলকুমার গুপ্ত। পৃঃ ২৩৭-৩৮

ভাগবতে ভক্তিবাদের উল্লেখ ছিল। কিন্তু তা মুসলমান বিজয়ের পূর্বে প্রসার লাভ করেনি। গীতগোবিন্দে আধ্যাত্মিকতা নেই। বিদ্যাপতিতেও নেই। গীত-গোবিন্দ, বিদ্যাপতির পদাবলী, শ্রীকৃষ্ণবিজয়, কৃষ্ণধামালী, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, শিব-শিবানীর ছড়া বা গাথা প্রভৃতি আদি রসাত্মক রচনা সমাজ জীবনের বিকৃতির এবং রাজনৈতিক নিবীর্যতার যুগে নৈতিকতা-শিথিল গণমনের রস-পিপাসা মিটাবার জন্যই রচিত হয়েছিল। এই প্রকার আদিরসাত্মক রচনা সম্বন্ধে হুমায়ুন কবীর যথার্থই বলেছেন: "সমাজ জীবনে যখন মন্দা পড়েছে, বিলাসের আড়ম্বরে জাতির চরিত্রতেজ ও শৌর্য যখন ম্লান, তখনই বিদ্যাসুন্দরের এবং এ ধরণের কাহিনীর প্রাদুর্ভাব। পাঠান রাজত্বের আবসানের যুগে শ্রীধরের বিদ্যাসুন্দর, মোগল শক্তির আসন্ন ভাঙ্গনের দিনে কৃষ্ণরামের বিদ্যাসুন্দর এবং নবাবী আমলের অবসানে ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের আবির্ভাবে একথার সাক্ষ্য মেলে। রাজশক্তির পতনের দিনে ঐশ্বর্য ও বিলাসের আড়ম্বর সমস্ত দেশেই দেখা দেয়, বাঙলা দেশেও তার ব্যতিক্রম হয়নি; তাই অবনতিপ্রবণ সমাজের বিকৃত রুচির প্রতিচ্ছায়া হিসাবে বিদ্যাসুন্দরের প্রণয়ও বারেবারে অশুচিরূপে ফুটে উঠেছে। ...রাজসভার কৃত্রিমতায় সে কাহিনী যত পঙ্কিল হয়ে উঠেছে, ধর্মপ্রেরণার অবান্তর আগ্রহে তাকে সজীব করার চেষ্টাও হয়েছে তত বেশী। ভারতচন্দ্র তাই ক্ষয়িষ্ণু সমাজের প্রতীক—জীবনের সামাজিক ও আধ্যাত্মিক মন্দার দিনে তাঁর আবির্ভাব স্বভাবিক ও সঙ্গত।"[৩৫]

বিপরীত ধর্মী দুই সংস্কৃতির মোকাবিলায় নিপীড়িত নিম্নবর্ণের হিন্দু সমাজ-মনে, তার ধর্মবিশ্বাসে ও জীবনদর্শনে যে সাড়া জাগল, তারই ফলে বাঙলায় বৈষ্ণব ও বাউল মতবাদের উদ্ভব ও পরিণতি। অবশ্য দক্ষিণ ভারতেই এর প্রথম বিকাশ। এখানে ভক্তিবাদে যে মনোবৃত্তির প্রকাশ তাতে দ্রাবিড়সুলভ ভাবাবেগের প্রাচুর্য ছিল। আর ছিল তীব্র প্রাণময়তা। দ্রাবিড় রক্তের উত্তরাধিকারী বাংলায়ও বৈষ্ণব ভক্তিবাদ একই রূপ উচ্ছ্বাস ও উত্তেজনার সৃষ্টি করল। এমনিতেই বাঙালী চিরকাল ভাবপ্রবণ ও স্পর্শকাতর। সামান্য কারণেই উচ্ছ্বসিত, উত্তেজিত, উন্মত্ত বা অভিভূত হয়ে পড়ে। এজন্যেই এরা যখন সাহিত্য সৃষ্টি করে, তখন তা গীতিকবিতা হয়ে উঠে, সামাজিক আন্দোলনে সাময়িক ঝড় তোলে, রাজনীতিতে ভয়ঙ্কর বিপ্ল[illegible] হয়। এজন্যই এরা তর্ক করে, যুক্তি মানে কিন্তু হৃদয়ানুভূতিগোচর না হলে [illegible] কা[illegible]

নাই শীলকুমার গু

ভাগবতে ভক্তিবাদের উল্লেখ ছিল। কিন্তু তা মুসলমান বিজয়ের পূর্বে প্রসার লাভ করেনি। গীতগোবিন্দে আধ্যাত্মিকতা নেই। বিদ্যাপতিতেও নেই। গীত-গোবিন্দ, বিদ্যাপতির পদাবলী, শ্রীকৃষ্ণবিজয়, কৃষ্ণধামালী, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, শিব-শিবানীর ছড়া বা গাথা প্রভৃতি আদি রসাত্মক রচনা সমাজ জীবনের বিকৃতির এবং রাজনৈতিক নিবীর্যতার যুগে নৈতিকতা-শিথিল গণমনের রস-পিপাসা মিটাবার জন্যই রচিত হয়েছিল। এই প্রকার আদিরসাত্মক রচনা সম্বন্ধে হুমায়ুন কবীর যথার্থই বলেছেন ঃ "সমাজ জীবনে যখন মন্দা পড়েছে, বিলাসের আড়ম্বরে জাতির চরিত্রতেজ ও শৌর্য যখন ম্লান, তখনই বিদ্যাসুন্দরের এবং এ ধরণের কাহিনীর প্রাদুর্ভাব। পাঠান রাজত্বের আবসানের যুগে শ্রীধরের বিদ্যাসুন্দর, মোগল শক্তির আসন্ন ভাঙ্গনের দিনে কৃষ্ণরামের বিদ্যাসুন্দর এবং নবাবী আমলের অবসানে ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের আবির্ভাবে একথার সাক্ষ্য মেলে। রাজশক্তির পতনের দিনে ঐশ্বর্য ও বিলাসের আড়ম্বর সমস্ত দেশেই দেখা দেয়, বাঙলা দেশেও তার ব্যতিক্রম হয়নি ; তাই অবনতিপ্রবণ সমাজের বিকৃত রুচির প্রতিচ্ছায়া হিসাবে বিদ্যাসুন্দরের প্রণয়ও বারেবারে অশুচিরূপে ফুটে উঠেছে। ...রাজসভার কৃত্রিমতায় সে কাহিনী যত পঙ্কিল হয়ে উঠেছে, ধর্মপ্রেরণার অবান্তর আগ্রহে তাকে সজীব করার চেষ্টাও হয়েছে তত বেশী। ভারতচন্দ্র তাই ক্ষয়িষ্ণু সমাজের প্রতীক—জীবনের সামাজিক ও আধ্যাত্মিক মন্দার দিনে তাঁর আবির্ভাব স্বভাবিক ও সঙ্গত।"[৩৫]

বিপরীত ধর্মী দুই সংস্কৃতির মোকাবিলায় নিপীড়িত নিম্নবর্ণের হিন্দু সমাজ-মনে, তার ধর্মবিশ্বাসে ও জীবনদর্শনে যে সাড়া জাগল, তারই ফলে বাঙলায় বৈষ্ণব ও বাউল মতবাদের উদ্ভব ও পরিণতি। অবশ্য দক্ষিণ ভারতেই এর প্রথম বিকাশ। এখানে ভক্তিবাদে যে মনোবৃত্তির প্রকাশ তাতে দ্রাবিড়সুলভ ভাবাবেগের প্রাচুর্য ছিল। আর ছিল তীব্র প্রাণময়তা। দ্রাবিড় রক্তের উত্তরাধিকারী বাংলায়ও বৈষ্ণব ভক্তিবাদ একই রূপ উচ্ছ্বাস ও উত্তেজনার সৃষ্টি করল। এমনিতেই বাঙালী চিরকাল ভাবপ্রবণ ও স্পর্শকাতর। সামান্য কারণেই উচ্ছ্বসিত, উত্তেজিত, উন্মত্ত বা অভিভূত হয়ে পড়ে। এজন্যেই এরা যখন সাহিত্য সৃষ্টি করে, তখন তা গীতিকবিতা হয়ে উঠে, সামাজিক আন্দোলনে সাময়িক ঝড় তোলে, রাজনীতিতে ভয়ঙ্কর বিপ্লব ঘটায়। এজন্যই এরা তর্ক করে, যুক্তি মানে কিন্তু হৃদয়ানুভূতিগোচর না হলে আচরণ করে না।

---

৩৫ বাঙলার কাব্য।

এগুলো হিন্দু-মুসলিম ধর্ম দর্শনের সমন্বয়ে সম্পূর্ণ নতুন ধর্ম। কিন্তু প্রচারকগণ নামত হিন্দু হওয়ায় ও ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, রাধা-কৃষ্ণ প্রভৃতি নামসার হিন্দুয়ানির রেশ থাকাতে এরা জাতি অর্থে হিন্দুই রয়ে গেল। তাতে উত্তরকালে রাজনীতি-ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের প্রচুর সুযোগ-সুবিধা হয়। সুতরাং এরা নামগত জাতিতে হিন্দু ও ধর্মগত জাতিতে আলাদা। যেমন, রাজা রামমোহন রায়ের নাম-মাহাত্ম্যে ব্রাহ্মগণ নিজেদের ব্রাহ্মণ্য ধর্মের শাখানুসারী বলে মনে করে। ফলত, এরা জাতিতে হিন্দুই রয়ে গেল। বস্তুত, রামমোহনের ব্রাহ্ম ধর্মও সচেতনভাবে খৃষ্টধর্মের প্রসার রোধকল্পে প্রবর্তিত হয়েছিল আর উদ্দেশ্য সিদ্ধও হয়েছিল।[৩৪]

উক্ত ভাব সাধকদের মধ্যে জোলা শ্রেণীর কবীর এবং ধুনকর সম্প্রদায়ের দাদূ ও রজ্জব মুসলমান ছিলেন। মুসলমান হয়েও তাঁরা ধর্মান্দোলন করেছিলেন—তার কারণ এঁরা নিম্নশ্রেণীর উৎপীড়িত হিন্দুসমাজ থেকে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন সূফীদের হাতে। শরিয়তী ইসলামের সঙ্গে পরিচয়ের অভাব, পূর্ব সংস্কারগত মায়াবাদের প্রভাব এবং সূফীতত্ত্বের উদার আবহাওয়া এদেরকে ভাবরসে বা প্রেম-সাধনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। বৈচিত্র্য ও বিভেদের মধ্যেও যে আত্মার স্বরূপ এক ও অবিকৃত এই সমন্বয় পন্থিগণ তা-ই প্রচার করেছেন। এ সব ধর্মান্দোলনের ব্যবহারিক উদ্দেশ্য ছিল বর্ণভেদ প্রথা এবং শাস্ত্রে অনধিকার রহিতকরণ আর মনুষ্য-সত্তায় মর্যাদা দান। তা পুরোপুরি সফল হল। তাই ইসলাম আর প্রসার লাভ করেনি। এর প্রভাবই সমাজ সংস্কারে প্রয়োজনীয় ফল দান করল। যেমন, য়ুরোপে ইসলামের অনুকরণে Protestant মত প্রচারই নবযুগ সৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

বাংলাদেশে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বে চণ্ডীদাসও এরূপ একজন সাধক ছিলেন। সূফী প্রভাবে তিনিও প্রেম ধর্ম প্রচার করেন এবং বর্ণভেদের বিরুদ্ধে তিনিও বলে উঠেন 'শুন হে মানুষ ভাই: সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।' এর পরে মাধবেন্দ্রপুরী এবং তারপরে চৈতন্য।

---

৩৪ "এই সময় ব্রাহ্মধর্ম প্রবর্তিত হইয়া সংশয়বাদী চিত্তের আশ্রয় স্থল হইয়াছিল এবং যাঁহারা খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিতেন তাঁহারা অনেকেই ব্রাহ্মধর্মের শরণ লইয়াছিলেন। এই ভাবে ব্রাহ্মধর্ম সমাজের ভাঙ্গনকে রোধ করিতে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল। ......ব্রাহ্মধর্ম যাহারা গ্রহণ করিয়াছিল, তাহারা হিন্দু সমাজের সহিত যোগসূত্র রক্ষা করিয়া চলিত। বস্তুত হিন্দুধর্মাদর্শে বিশ্বাস ছিল না অথচ ধর্মান্তর গ্রহণ করে নাই এইরূপ সংখ্যাই ইয়ং-বেঙ্গলের মধ্যে বেশি ছিল।

—উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নব জাগরণ: সুশীল কুমার গুপ্ত। পৃঃ ২৩৭-৩৮

বৈষ্ণব মত ও সাহিত্যের উদ্ভব হয়েছিল পশ্চিম বাঙলায়। এদের প্রভাবও বিশেষ করে পড়েছিল পশ্চিম বাঙলায়। তার কারণ হুমায়ুন কবীরের ভাষায়, "পশ্চিম বাংলায় শালবন আর কাঁকড়ের পথ—দিগন্ত-প্রান্তর দৃষ্টির সীমার বাইরে মিলিয়ে আসে। শীর্ণ জলধারার গভীর রেখা কাটে দীর্ঘ সংখ্যাহীন স্রোতস্বিনী। বাতাসে তীব্রতার আভাস, তপ্তরৌদ্রে কাঠিন্য, দিনের তীক্ষ্ণ ও সুস্পষ্ট দীপ্তির পর অকস্মাৎ সন্ধ্যার মায়াবী অন্ধকারে সমস্ত মিলিয়ে যায়। রাত্রিদিনের অনন্ত অন্তরালে মনের দিগন্তে নতুন জগতের ইঙ্গিত নিয়ে আসে, তপ্ত রৌদ্রালোকে মূর্ছাহত ধরণী অন্তরকে উদাস করে তোলে। পশ্চিম বাঙলার প্রকৃতি তাই বাঙ্গালীর কবিমানসকে যে রূপ দিয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে লোকাতীত রহস্যের আভাস, অনির্বচনীয়ের আস্বাদে অন্তর সেখানে উন্মুখ ও প্রত্যাশী জীবনের প্রতিদিনের সংগ্রাম ও প্রচেষ্টাকে অতিক্রম করে প্রশান্তির মধ্যে আত্মবিস্মরণ।"[৩৬] কিন্তু পূর্ব বাঙলায় এত বড় ধর্ম ও সাহিত্য আন্দোলনের প্রভাব যে পড়েনি তা নয়, তবে তা যেন কতকটা প্রথা রক্ষার তাগিদে কৃত্রিম চর্চা। পূর্ববঙ্গে মানুষ ও মানবতার প্রতি শ্রদ্ধাই ছিল বেশী। তাই লক্ষ্য তার প্রায়ই ভূমির দিকে। কচিৎ ভূমার দিকে তা ধাবিত হয়েছে। ফলে এখানে প্রাত্যহিক জীবনের সুখ-দুঃখ, দ্বন্দ্ব, প্রেম-স্নেহ, বিরহ-মিলনের গান-গাথা এবং দেবদ্রোহী- বীর্যবান, মর্যাদাবান মানবতার প্রতীক 'চাঁদ সদাগর' চরিত্র সৃষ্টি হয়েছে। কারণ, "পূর্ববঙ্গের নিসর্গ হৃদয়কে ভাবুক করেছে বটে, কিন্তু উদাসী করেনি। দিগন্ত প্রসারিত প্রান্তরের অভাব সেখানেও নেই। কিন্তু সে প্রান্তরে রয়েছে অহোরাত্র জীবনের চঞ্চল লীলা। পদ্মা-যমুনা-মেঘনার অবিরাম স্রোতোধারায় নতুন জগতের সৃষ্টি ও পুরাতনের ধ্বংস। প্রকৃতির বিপুল শক্তি নিয়তই উদ্যত হয়ে রয়েছে, কখন আঘাত করবে তার ঠিকানা নেই।...সেই জীবন ও মরণের অনন্ত দোলার মধ্যে সংগ্রামশীল মানুষ প্রকৃতির সে ঔদার্য, সৃষ্টি এবং ধ্বংসের সেই সর্বগ্রাসী শক্তি ভোলবার অবসর কই? চরের মানুষ নদীর সাথে লড়াই করে। জলের ঐশ্বর্যকে লুটে জীবনের উপাদান আনে। তাই লোকাতীতের মহত্ত্ব হৃদয়কে সেখানেও স্পর্শ করে। কিন্তু মনের দিগন্তকে প্রসারিত করেই তার সমাপ্তি, প্রশান্তির মধ্যে আত্ম-বিস্মরণের সেখানে অবকাশ কই? ...পূর্ব বাংলার প্রকৃতির ঐশ্বর্য ও মহিমা সত্ত্বেও নিসর্গের সঙ্গে সংগ্রামশীল মানুষ মুহূর্তের জন্যও

৩৬ বাঙলার কাব্য।

নিজের সত্তা ভুলে থাকতে পারেনি। বৌদ্ধ বিপ্লবে যে সাম্যবাদ পূর্ব-বাংলার মজ্জাগত, মোসলেম বিজয়ে তা আরো প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করল এবং সেই সঙ্গে জেগে উঠল নতুন আত্ম-প্রত্যয়। নতুন ব্যক্তিত্ববোধ এবং স্বাধিকারের জ্ঞান। এভাবে পূর্ব বাঙলার ব্যক্তি কেন্দ্রিক বিদ্রোহ-ধর্মী মন সহজেই ইসলামের সংসারমুখী সন্ন্যাস বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গীকে গ্রহণ করে নিল।"[৩৭]

স্মার্ত রঘুনন্দন ও রঘুনাথ শিরোমণির ব্রাহ্মণ্য আন্দোলনকে ব্যর্থ করে দিয়ে বৈষ্ণব বিপ্লবের যে প্লাবন এল তাতে পশ্চিম বঙ্গেও কিন্তু সবাই চৈতন্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণব মতে দীক্ষিত হয় নি, রাধাকৃষ্ণের রূপকে ভক্তি বা বৈরাগ্য সাধনা করে নি। হয়তো চৈতন্যদেবের উপর অভিমান, অথবা রাধাকৃষ্ণ রূপক থেকে প্রেরণার অভাব। তাই একদল লোক ভিন্নপথে একই সাধানা করে চলল ; এরা বাংলার বাউল। বাউল আর বৈষ্ণবে সাধনাগত মৌলিক কোন পার্থক্য নেই। পরিণামে তারা একই গন্তব্যে পৌঁছে। একদল মুসলমান হিন্দুয়ানির প্রতি অবজ্ঞা বশত পীর মুর্শিদের রূপকে সাধনা করে। আর একদল হিন্দুর যোগ, দেহতত্ত্ব প্রভৃতির সমন্বয়ে এক তত্ত্বদর্শন খাড়া করেছে। ফলত, বাংলায় আমরা চতুর্বিধ শাখার সাহিত্য পাচ্ছি ঃ (১) বৈষ্ণব পদ-সাহিত্য (২) বাউল সাহিত্য, (৩) মুর্শিদা সাহিত্য ও (৪) মারফৎ সাহিত্য। এ সবকটির মূল উৎস মায়াবাদ আর মুসলমানের সূফীতত্ত্ব। মায়াবাদও সূফীমতের সংমিশ্রণে ও সমন্বয়ে উদ্ভূত। শুধু ধর্মের ক্ষেত্রে নয়, ব্যবহারিক জীবনেও নানা ভাবে নানাদিকে হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত-সাধনা সে দিন নতুন সমাজ ও সংস্কৃতি সৃষ্টিতে সহায়তা করেছিল প্রচুর। সাহিত্যে, শিল্পে, স্থাপত্যে, সংগীতে সর্বত্র এর সাক্ষ্য মেলে। এ ধারায় চললে আজ বাঙলার সংস্কৃতি কি রূপ নিত তা কল্পনা করা সম্ভব—কিন্তু নিরর্থক। কারণ, মধ্যপথে অভিজাত ব্রাহ্মণ্য-বাদীদের চেষ্টায় রামায়ণ-মহাভারতের বহুল চর্চা হিন্দু মানসকে পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য-বাদমুখী করে দিল। অপরপক্ষে ওহ্হাবী-ফরায়জী আন্দোলনের মাধ্যমে শরীয়তের প্রতি অত্যধিক অনুরাগ মুসলমানদেরকেও রক্ষণশীল ও আরব-ইরানি তমদ্দুনের পূজারী করে তুলল। ফলে বাংলার সংস্কৃতি সম্ভাব্য পরিণতি লাভ করতে পারেনি।

বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে অনেক কবি বৈষ্ণব পদ-সাহিত্য সৃষ্টি করে গেছেন। তাঁদের কেউ করেছেন, নেশায় ঝোঁকে আর কেউ করেছেন পেশা হিসেবে। নেশার ঝোঁকে করার কারণ দুটো (১) সূফী মতবাদের সাথে বৈষ্ণববাদর্শের আত্যন্তিক

৩৭ বাঙলার কাব্য।

সাদৃশ্য ও আচারিক মিল এবং (২) জগৎ ও জীবনের চিরাবৃত রহস্য, জীবাত্মা ও পরমাত্মার সম্পর্ক নির্ণয়ের কৌতূহল প্রভৃতি মানুষের মনে যে জিজ্ঞাসা জাগায়, তার সদুত্তর সন্ধান প্রয়াসজাত যে অভিব্যক্তি তাতে দেশে বহুল প্রচলিত রাধাকৃষ্ণ রূপকের ব্যবহার। বৈষ্ণবদের নামকীর্তন, জীবেদয়া, বর্ণভেদ প্রথার বিলোপ সাধন, বিনয়, নামে রুচি, দশা, সখীভাব, ঐশ্বর্য প্রদর্শন, রাগানুগাভক্তি, তালাক প্রথা, পূণর্বিবাহ প্রভৃতি সূফীদের যিকর, খিদমত, সামা, হাল, সদাসোহাগ, কেরামতি, তরিকত, হকিকত, মারফত প্রভৃতির অনুকরণ মাত্র। ফানাফিল্লাহ এবং বাকাবিল্লাহও রাধা-কৃষ্ণের অভেদতত্ত্ব বা যুগলরূপ পরিকল্পনার উৎস স্বরূপ। এমন কি অদ্বৈতবাদী হিন্দুর দ্বৈতাদ্বৈতবাদও সূফীর দ্বৈতবাদ থেকে উদ্ভূত। অবশ্য বেদান্ত প্রভাবে পরে সূফীদের কেউ কেউ দ্বৈতাদ্বৈতবাদী হয়ে ছিলেন। সুতরাং সূফী মতাসক্ত বাঙালী মুসলমানদেরকে বৈষ্ণব সাধনা অনুপ্রাণিত করবে তাতে আশ্চর্য কি? এজন্যেই সাধক নুর কুতবে আলম এবং সৈয়দ মর্তুজা ফারসী গজল যেমন লিখেছেন, বাংলা রাধা-কৃষ্ণপদও তেমনি রচনা করেছেন। তাঁরা দুই তত্ত্ব অভিন্নরূপে দেখেছেন। রাধকৃষ্ণ যে জীবাত্মা ও পরমাত্মা, দেহ ও প্রাণ এবং ভক্ত-ভগবানের পরিভাষারূপে পাক-ভারতের সর্বত্র গৃহীত হয়েছিল, এঁদের ও পাক-ভারতের বিভিন্ন ভাষায় মুসলিম রচিত পদ ও দোঁহাই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। দ্বিতীয়ত, মানুষ স্বাভাবিক ভাবেই জগৎ ও জীবনের রহস্য সম্বন্ধে চিরজিজ্ঞাসু। সেই অনাদি কাল থেকে মানুষ নানাভাবে এ প্রশ্নের সদুত্তর সন্ধান করেছে। আজো তার অবসান হয় নি। কারণ, আজো সর্বজন গ্রাহ্য কোন সমাধান মেলেনি। এই চিরন্তন জিজ্ঞাসার রূপ মানুষ অবিশেষে একই। তাজেই চিন্তাধারাও কমবেশী একই রূপ। কেননা, সবারই 'চিত্তকাড়া কালার বাঁশী লাগিছে অন্তরে।' ইরানি ভাষা ও সাহিত্যে অপটু বাঙালী মুসলমান তাই রাধাকৃষ্ণের দেশীয় রূপকে জগৎ ও জীবন এবং আত্মা-পরমাত্মার রহস্য উদঘাটনে প্রয়াসী হয়েছে। শুধু বাঙালী মুসলমানই বা বলি কেন, দাদূ, কবীর, রজ্জব, তাজ প্রভৃতি অবাঙালী মুসলমানও রাম ও রাধা-কৃষ্ণকে বাদ দিতে পারেন নি। রাধাকৃষ্ণ রূপক তাঁদের মনন প্রকাশের বাহনরূপে কাজ করেছে। সতের শতকের দরিয়া সাহেব বলেন:

আদি অংত মেরা হৈ রাম।
উন বিন ঔর সকল বেকাম॥
কহা কঁরু য়ে মান বড়াঈ।
রাম বিনা সব হী দুখদাঈ॥

কবি শেখ বলেন ঃ

চরণ কমল হী কী
লোচন মেঁ লোচ ধরী
রোচন হবৈ রাচ্যো
সোচ ধাম ধঁন কৌ।
সোক লেস নেকহু
কলেসকৌ ন লেস রহ্যো।
সুমরি শ্রীগোকলেস
গো কলেস মনকৌ।

মইজদ্দিন বলেন ঃ

বৃংদাবনকী কুংজ লগিন মেঁ
ঢুংঢত ঢুংঢত হারী
দৈহৌ দরস মোহি অপনি
মৌজ সে এহো কৃষ্ণ মুরারি
পিয়া মোহি আস তিহারী।

আফসোস বলেন ঃ

নিশিদিন কৃষ্ণ মিলন কো সঁপিয়া
আস লগায়ে ঠাড়ি রহত হৈঁ
আফসোস পিরাকী নেহ-সুরতিয়া
নিরখত নর ঔ নারী রহত হৈঁ।

কবি কাইম বলেন ঃ

হরি হেরত মৈঁ ফিরতী বাবরী
নৈননি মেঁ কব আবৈ
হরি কো লখি কাইম সখিঁয়া সোঁ
কাহেন ধুম মচাবৈ।

সাধন এয়ারী বলেন ঃ

হোঁ তো খেলোঁ পিয়া সংগ হোরী
জবতে দৃষ্টি পরো অবিনাসী
লাগী রূপ-ঠগৌরী
কহ য়ারী য়াদ করুঁ হরিকী
কোই কহৈ কো কহোরী।

দরিয়া সাহেবও বলেন ঃ

মুরলী কৌন বজাবৈ হো
গগন মংডলকে বীচ ?
যা মুরলীকে ধুন সে
সহজ রচা বৈরাট।
যা মুরলীকী টেরহিঁ সুন সুন
রহী গোপিকা মোহী
সংদ ধুন মিরদংগ বজত হৈ
বারহ মাস বসংত।
অমহদ ধ্যান অখংড আতুরবে
ধ্যাবত সবহী সংত।
কান্হ গোপী করত নৃত্যহিঁ
চরণ বপু হি বিনা।
নৈন বিন দরিয়াব দেখে
আনংদরূপ ঘনা।

একেত সাধারণ শ্রেণীর মুসলমানগণ ধর্মান্তরিত ভারতীয়দের বংশধর। তাদের রক্ত-সংস্কারে ভারতিক প্রভাব বিদ্যমান, তার উপর ইসলামের একটি বিশিষ্ট শাখা—সূফী মতবাদ ভারতে প্রাধান্য লাভ করে। সুতরাং মুসলমানদের মন, ইন্দ্রিয়, আত্মা ও ধর্মের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ ভারতিক ভক্তিবাদ তাদের সহজেই প্রভাবিত করতে পেরেছিল। তাই বাঙালী কবি শাহনুরের কথায় মুসলমানদের রাধাকৃষ্ণ রূপক গ্রহণের সংগত কারণ খুঁজে পাই ঃ

সৈয়দ শাহনুরে কয় রাধাকানু চিন হয়
রাধাকানু আপনার তনে রে।

আরো স্পষ্ট হয় যখন শুনি : তন রাধা মন কানু শাহনূরে বলে।

অথবা : সৈয়দ শাহনূরে কয়, ভব কূলে আসি
রাধার মন্দিরে কানু আছিলা পরবাসী।

অথবা ওসমানের কথায় :

রাধাকানু একঘরে কেহ নহে ভিন
রাধার নামে বাদাম দিয়া চালায় রাত্রিদিন।
কানুরাধা একঘরে সদায় করে বাস
চলিয়া যাইবা নিঠুর রাধা কানু হইবা নাশ।

সৈয়দ মর্তুজাও বলেন :

আনন্দমোহন মণ্ডলা খেলাএ ধামালী
আপে মন আপে তন আপে মন হরি।
আপে কানু আপে রাধা আপে সে মুরারি
সৈয়দ মর্তুজা কহে, সখি, মণ্ডলা গোপতের চিন।
পুরান পিরীতি খানি ভাবিলে নবীন।

এর সঙ্গে তুলনীয় :

রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি
অন্যোন্যে বিলাসয় রসাস্বাদন করি। (চৈতন্য চরিতামৃত)

বিকৃত বৈষ্ণব সাধক—বাংলার বাউল ও অন্যান্য উপসম্প্রদায়ের অনেকগুলোই রাধা-কৃষ্ণের রূপকে দেহতত্ত্ব তথা জীবাত্মা ও পরমাত্মার রহস্যভেদে প্রয়াসী। শুধু তাই নয়, আধুনিক উর্দু কবি হাফিজ জালন্ধরী থেকে বাঙালী কবি নজরুল, জসিম-উদ্দিন প্রভৃতি অনেককেই এ 'রাধাকৃষ্ণ' কাব্য-প্রেরণা দান করেছেন।

॥ ৯ ॥

আমরা দেখেছি, তারাচাঁদ 'Influence of Islam on Indian Culture' গ্রন্থে, বিনয় ঘোষ 'বাঙলার নবজাগৃতি' গ্রন্থে এবং 'ভারতদর্শনসার' গ্রন্থে উমেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য অদ্বৈতবাদ ও ভক্তিবাদের বিকাশ মুসলিম প্রভাব প্রসূত বলে অনুমান করেছেন। সুকুমার সেন তাঁর 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে' [৩৮] চৈতন্য প্রবর্তিত

৩৮ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (৩য় সং : পূর্বার্ধ) : 'রাজসভাশ্রিত উচ্চতর সমাজে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাংস্কৃতিক আপোষ কিছু হইয়াছিল। ইহার পিছনে দরবেশ-ফকীরদেরও প্রভাব ছিল এবং এই সূত্রে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে সুফীভাবের কিছু ছাপ পড়িয়াছিল বলিয়া মনে হয়। পৃ : ২৪৫

বৈষ্ণব ধর্ম মুসলিম প্রভাবজ বলে এক রকম স্বীকার করেছেন আর উপেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য তাঁর 'বাংলার বাউল ও বাউল গান' গ্রন্থে বাউল মত বাঙালী মুসলিম মানস উদ্ভূত বলে সিদ্ধান্ত করেছেন।

তবু এ সত্য. অস্বীকার করবার উপায় নেই যে প্রভাবটি পারস্পরিক হয়েছিল। কবীর, দাদু, রজ্জব, আউল, লালন ফকির প্রভৃতি দেশীয় মুসলমান আর শাহ বু আলি কলন্দর, বুলেহ শাহ, শাহ আবদুল লতিফ ভিটাই থেকে বাংলার সৈয়দ আইনুদ্দিন প্রভৃতি বিদেশাগত মুসলিমের বংশধরগণ অবধি সবাই নানাভাবে অল্প বিস্তর প্রভাবিত হয়েছেন। এ প্রভাবকে স্বরূপত চার ভাগে দেখানো যায়—(ক) সূফী সাধনার সঙ্গে যোগ ও দেহতত্ত্বের সমন্বয়, (খ) বর্ণাশ্রম কণ্টকিত, বিদেশী-শাসিত ভারতে সাম্য ও প্রীতির উপর গুরুত্ব আরোপ (গ) ইসলামের একক আনুগত্য অস্বীকার প্রবণতায় রাধাকৃষ্ণ রূপক গ্রহণ আর (ঘ) রাধকৃষ্ণ লীলা ও শাক্ত-ভক্তিবাদের অনুকরণে ইসলামী ধারার প্রবর্তন প্রয়াস।

'ক' ধারার সাধনা মুসলমান আধ্যাত্ম সাধক মাত্রের মধ্যেই দেখা যায়, চারমোকাম মঞ্জিলের কথা, যোগকালন্দর, জ্ঞানপ্রদীপ, হরগৌরী সংবাদ প্রভৃতি এ ধরণের রচনা। 'খ' ধারার পরিচয় কবীর, দাদূ, রজ্জব, কলন্দর থেকে আমাদের বাউল কবিদের রচনা অবধি সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। 'গ' ধারার পরিচয় রয়েছে মুসলিম পদকর্তা থেকে এ কালের হাফিজ জালন্ধরী, নজরুল, জসীমউদ্দীন প্রভৃতির রচনায়। আর 'ঘ' ধারার রচনার নমুনা কম, তবে প্রয়াসের চিহ্ন আছে কৃষ্ণলীলার অনুকরণে নবীলীলা কল্পনায়। সৈয়দ আইনুদ্দিনের পদটি স্মরণীয়।

বর্তমান ক্ষেত্রে 'গ' ধারার সুষ্ঠু আলোচনা প্রয়োজন। অধ্যাপক যতীন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য মুসলিম রচিত পদগুলোকে দৃষ্টান্তযোগে ছয় ভাগে ভাগ করেছেন ঃ

১ একান্ত (বা বিশুদ্ধ) বৈষ্ণব কবিতা ;

২ রাধাকৃষ্ণ নামাঙ্কিত দেহতত্ত্ব মূলক জীবাত্মা ও পরমাত্মা প্রসঙ্গ যুক্ত কবিতা ;

৩ রাধাকৃষ্ণ নামাঙ্কিত অনাদি-অনন্ত ভগবন্নির্দেশক কবিতা ;

৪ লৌকিক প্রেম প্রসঙ্গে, রাধাকৃষ্ণের নামাঙ্কিত কবিতা ;

৫ বিবিধ ;

৬ (রাধাকৃষ্ণের নাম উল্লিখিত হয় নাই) গৌরাঙ্গ বিষয়ক কবিতা।[৩৯]

---

[৩৯] বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবি পৃঃ ৯—৩৩

অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য মুসলমানদের রাধাকৃষ্ণ রূপকে পদ রচনার কয়েকটি কারণ নির্দেশ করেছেন। সে কারণগুলো সংক্ষেপে এই ঃ

ক, দেশজ মুসলমানের মনে হিন্দু পূর্ব পুরুষের অনেক সংস্কার রয়ে গিয়েছে তা কালে অনুকূল আবেষ্টনে আত্মপ্রকাশ করেছে।

খ, দেশজ মুসলমান সচেতন ভাবে পূর্ব পুরুষের আর আর দেবদেবী অস্বীকার করেছে। "কিন্তু ধর্মসাধনার যে সহজ দিক—যাহাতে ভগবানকে প্রেমাস্পদ রূপে কল্পনা করা হইয়াছে—সেইদিক তাহাদের সকলের মন হইতে মুছিয়া গেল না। ···ইহাঁরা কৃষ্ণ বলিতে গীতার কৃষ্ণকে জানেন না—জানেন, রাধা-বন্ধু কৃষ্ণকে। এই কৃষ্ণ আবার অধিকাংশ মুসলমান কবিদের নিকট অপৌরুষেয়। 'কানু ছাড়া গীত নাই' 'কানু ছাড়া উপমা নাই।'—প্রভৃতি প্রবাদের দ্বারা যে প্রেমিক কানুর কথা বলা হইয়াছে, প্রেমের কথা বলিতে যাইয়া সেই কানুর নাম মুসলমান কবিরা গ্রহণ করিয়াছেন।"

গ, "চৈতন্যদেবের প্রেমধর্মের প্রভাবে দেশজ মুসলমানদের কেহ কেহ এই ভাবের প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া রাধাকৃষ্ণ নাম উল্লেখ করিয়া প্রেমের গান গাহিয়াছেন।"

ঘ, হিন্দু-মুসলমান শ্রোতাদের কাছে সহজে বোধ্য হবে বিবেচনায় "বাঙ্গালার সূফী ভাবাপন্ন মুসলমান কবিরা জীবাত্মা ও পরমাত্মার কথা বলিতে যাইয়া লায়লী-মজনু, শিরি ফরহাদ প্রভৃতি রূপক ব্যবহার না করিয়া বাঙ্গালার জাতীয় রূপক, রাধা-কৃষ্ণ প্রসঙ্গই গ্রহণ করিয়াছেন।"

ঙ, খ্রীষ্টান মধুসূদন যেমন ব্রজাঙ্গনা কাব্য রচনা করেছেন, ব্রাহ্ম রবীন্দ্রনাথ যেমন ভানুসিংহের পদাবলী লিখেছেন, ঠিক সেইরূপ মুসলমান ধর্মাবলম্বী কোন কোন কবিও রাধা-কৃষ্ণ নামাঙ্কিত কবিতা রচনা করিয়া প্রেমধর্মেরই মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়াছেন।" ইহা যুগের ও প্রথার প্রভাব।

চ খ্রীষ্টীয় সভ্যতার সঙ্গে গ্রীক সভ্যতার মৌলিক পার্থক্য সত্ত্বেও "প্যাগান ভাব খ্রীস্টধর্মাবলম্বী সমগ্র ইউরোপে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। এ সময়কার কবি ও শিল্পীরা প্যাগান ভাব ও আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন।" মুসলমানেরাও অনুরূপ অনুপ্রেরণায় রাধাকৃষ্ণ পদসাহিত্য রচনা করেন।[৪০]

অধ্যাপক ভট্টাচার্য উক্ত ছয় প্রকার কারণ অনুমান করেছেন। আসলে তিনটি কারণ, পুনরাবৃত্তি দোষে ছয়টি হয়েছে। তিনি বলতে চান ঃ

৪০ বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবি—পৃঃ ৯—৩৩

ক দেশজ মুসলমান পূর্বসংস্কার বশত চৈতন্যের প্রেমধর্ম প্রচার কালে রাধাকৃষ্ণ লীলারসে মুগ্ধ হয়ে নিজেরাও পদ রচনা করেছেন।

খ রেওয়াজের প্রভাবে রাধাকৃষ্ণের রূপকে পদ রচিত হয়েছে বটে, তবে কৃষ্ণ অনেক মুসলমান. কবির কাছে অপৌরুষেয়। এবং 'কানু ছাড়া গীত নেই' যুগের নৈর্ব্যক্তিক নাগর কানাই রূপে লৌকিক প্রেমের নায়ক হয়েছেন।

গ আর সূফী মতের মুসলমানেরা ভাব সাদৃশ্য বশত জীবাত্মা-পরমাত্মা সূচক জনপ্রিয় দেশী রূপক হিসেবে রাধাকৃষ্ণের শরণ নিয়েছেন।

উক্ত তিনটি কারণই কমবেশী সত্য। তবে তিনি বার বার হিন্দুধর্ম ত্যাগী মুসলমানদের কথাই বলেছেন। আসলে বিদেশাগত মুসলমানের বংশধরগণের মধ্যেও কেউ কেউ এ প্রভাবে পড়েছিলেন, সৈয়দ সুলতান, মীর ফয়জুল্লাহ মীর্জা কাঙ্গালী, সৈয়দ মর্তুজা, সৈয়দ আইনুদ্দিন প্রভৃতির নামেই প্রকাশ— তাঁরা দেশজ মুসলমান নন। সূফীরা সরাব ও সাকী প্রতীকের মাধ্যমে পুরুষ ভাবে নারী রূপা পরমাত্মার ধ্যান করেন। আর বৈষ্ণবেরা রাধাভাবে—নারীরূপে পরম পুরুষের (পরমাত্মার) সাধনা করেন, কাজেই প্রভাব কেবল পদাবলী রচনার আঙ্গিকগত নয়—কিছুটা মর্মগতও।

সূফীমত প্রভাবিত হলেও একেশ্বরবাদী মুসলমানের মনে রাধাকৃষ্ণের রাস, মৈথুন প্রভৃতির কল্পনা প্রশ্রয় পাওয়ার কথা নয়। তাই তাঁরা রূপ, অনুরাগ, বংশী, অভিসার, মিলন, বিরহ প্রভৃতিকে জীবাত্মা-পরমাত্মার সম্পর্ক সূচক ও ব্যঞ্জক বলে গ্রহণ করতে পারলেও বস্ত্রহরণ, দান, সম্ভোগ, খণ্ডিতা, বিপ্রলব্ধা প্রভৃতির সঙ্গে তাদের অধ্যাত্মতত্ত্বের মিল খুজে পান নি, তাই মুসলমানের লেখায় ও-সব শ্রেণীর পদ সাধারণত পাওয়া যায় না। তাঁদের রচনায় অনুরাগ ও বিরহবোধ এবং জীবন জিজ্ঞাসাই বিশেষরূপে প্রকট। এই জীবন-জিজ্ঞাসা মূলক পদকে 'আত্মবোধন' শ্রেণীভুক্ত করেছি। সৃষ্টিলীলা দেখে স্রষ্টার কথা মনে পড়ে—এটিই রূপ; এ সৃষ্টি বৈচিত্র্য দেখে স্রষ্টার সঙ্গে সম্পর্ক বোধ জন্মে—এটিই অনুরাগ; এবং তাঁর প্রতি কর্তব্যবুদ্ধিজাগে—এটিই বংশী; আর সাধনার আদিস্তরে পাওয়া-না-পাওয়ার সংশয় বোধ থাকে—তারই প্রতীক নৌকা। এরপরে ভাবপ্রবণ মনে আত্মসমর্পণ ব্যঞ্জক সাধনার আকাঙ্ক্ষা উপ্ত হয়—এটিই অভিসার।

এর পরে সাধনায় এগিয়ে গেলে অধ্যাত্ম-স্বস্তি আসে—তাই মিলন। এরও পরে চরম আকাঙ্ক্ষা—একাত্ম হওয়ার বাঞ্ছা যার নাম বাকাবিল্লাহ—এ-ই বিরহ। মৃত্যুর আগে সাধারণের চরম মিলন নেই—তাই বাকাবিল্লাহ সূচক পদ নেই।

কেউ কেউ সে দুর্লভ সৌভাগ্য লাভ করেন, তাঁরাই এ বাকাবিল্লাহ হন—আর বলেন 'আনলহক'—যেমন মনসুর, বায়েযীদ প্রমুখ সাধক বলেছেন। সৈয়দ মর্তুজার ফারসী গজলে রাধাকৃষ্ণ নেই এবং নুর কুতুব-ই-আলমের বাংলা পদে রাধা-কৃষ্ণ আছেন। এ আলোকে যাচাই করলে রাধাকৃষ্ণলীলা যে সূফীতত্ত্ব প্রকটের দেশী রূপক সে সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়া যায়। এজন্যেই মুসলিম রচিত পদ রাগানুগ নয়। এ ব্যাপারে ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের মন্তব্য উল্লেখ্য: "একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে বাংলার মুসলমান কবিগণ রাধাকৃষ্ণকে লইয়া যে কবিতা রচনা করিয়াছেন, তাহা কোনও বিধিবদ্ধ বৈষ্ণব ধর্মের আওতায় রচিত নহে।···বৈষ্ণবের মতে রাধাকৃষ্ণের যত লীলা তাহার ভিতর মানুষের কোন স্থান নাই। লীলা হইতেছে নিত্যকাল অপ্রাকৃত বৃন্দাবনে (স্বরূপ-ধামে) কৃষ্ণ এবং তাহার হলদিন্যাত্মক স্বরূপশক্তি রাধার সঙ্গে; জীব সেখানে লীলা পরিকর-ভূত সাক্ষী মাত্র, সে দূর হইতে লীলা দর্শন ও আস্বাদন করে এবং কথায় সুরে সেই লীলা কীর্তন করে। শ্রীরাধা এবং স্বরূপভূত নিত্যসিদ্ধ গোপগোপীগণ ব্যতীত অন্য কাহারও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সহিত লীলায় কোনও অধিকার নাই; শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন বাসনাও বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ।··· কিন্তু অন্যরূপ পরিণতির সম্ভাবনা দেখা দিল মুসলমান কবিগণের ভিতরে, কারণ তাঁহারা চৈতন্য প্রবর্তিত একটি সাধারণ প্রেমধর্মের প্রভাব সামাজিক উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করিলেন; একটা সাহিত্যিক বিষয়বস্তু এবং প্রকাশভঙ্গিও উত্তরাধিকার সূত্রেই পাইলেন, কিন্তু পাইলেন না রাধাকৃষ্ণ লীলা সম্বন্ধে কোন স্থিরবদ্ধ ভাবদৃষ্টি। সুতরাং বাংলার জন সমাজে যে সাধারণ ভক্তিধর্ম ও যোগধর্ম প্রচলিত ছিল এই সকল কবিগণ রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলাকে সেই সকলের সঙ্গেই যুক্ত করিয়া লইলেন।

"বাংলা দেশের প্রেমপন্থী মুসলমান সাধকগণ অল্পবিস্তর সকলেই সূফীপন্থী। সূফী মতে প্রেমই হইল ভগবানের পরম স্বরূপ, প্রেমের দ্বারাই আবার এই জগৎ সৃষ্টি। নিজের অনন্ত প্রেম আস্বাদনের জন্যই এক পরম স্বরূপের বহুরূপে লীলা —ইহাই হইল সৃষ্টির তাৎপর্য। জীব হইল এই 'একে'র সৃষ্টি লীলার প্রধান শরিক— লীলা দোসর।··· সূফী প্রেমধর্ম এবং বাংলার প্রেমধর্ম জনগণের মধ্যে যে একটি জনপ্রিয় সহজ সমন্বয় লাভ করিয়াছে, বাংলা দেশের মুসলমান কবিগণ সেই সমন্বয় জাত প্রেম-ধর্মের আদর্শের সহিত রাধাকৃষ্ণকে অনেক স্থলে মিলাইয়া লইয়াছেন। ফলে রাধার যে পূর্বরাগ অনুরাগ বিরহের আর্তি তাহা কবিগণের জ্ঞাতে অজ্ঞাতে পরম দয়িতের জন্য নিখিল প্রেম সাধকগণের পূর্বরাগ বিরহের আর্তিতেই পরিণতি লাভ করিয়াছে এবং সেই আর্তির ক্ষেত্রে কবি নিজেকে শুধু দর্শক বা আস্বাদক রূপে

খানিকটা দূরে সরাইয়া লন নাই, নিখিল আর্তির সহিত নিজের চিত্তের আর্তিকেও মিলাইয়া দিয়াছেন। ইহারই ফলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব কবিগণের ভাবদৃষ্টি হইতে বঙ্গীয় মুসলমান কবিগণের ভাবদৃষ্টি অনেকস্থানে পৃথক হইয়া পড়িয়াছে। আমরা মুসলমান কবিগণের রচিত রাধাকৃষ্ণ-লীলা সম্বন্ধীয় পদগুলির ভণিতা লক্ষ্য করিলেই এই কবিগণের মূল ভাবদৃষ্টিরও ইঙ্গিত পাইব।"[৪০]

'এপ্রিল ফুল' করা কিংবা 'মাইরী' বলা যেমন ধর্মনিরপেক্ষ সাংস্কৃতিক প্রভাব, তেমনি বৈষ্ণব সাহিত্য প্লাবিত দেশে যখন 'কানু ছাড়া গীত নাই,' তখন কেবল হুজুগের বশেও কোন কোন মুসলিম কবি এ জাতীয় পদ রচনা করে থাকবেন। নায়ক বা নাগর অর্থে লৌকিক প্রণয়গান যে রচিত হয়েছিল তা অনেকেই স্বীকার করেন। এ সম্বন্ধে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন, "এখনও আমাদের দেশে দেখা যায়, আদিরসের গান লিখিতে গেলেই লোকে রাধাকৃষ্ণের নাম করে। একদিন দেখিয়াছিলাম জন দশেক কয়েদী লইয়া দুইজন কনষ্টবল নির্জন রাস্তা দিয়া জেলের দিকে যাইতেছে। পথটা দীর্ঘ, সমস্তদিন খাটার পর সকলেই একটু স্ফূর্তি চায়। আমিও সেই পথ দিয়া যাইতেছিলাম, কিন্তু সকলের পিছনে। একজন কনষ্টবল একজন কয়েদীকে ডাকিয়া বলিল—ওরে এই সময় তুই একটা গান গা'।... কয়েদী গান ধরিল—

আজকে যদি থাকত আমার শ্যাম
ধান আনতে গিয়ে যখন পড়ত মাথার ঘাম
আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিত করত কত আরাম।

এখানে শ্যাম নাম শুনিয়া আমার বেশ বোধ হইল আমাদের দেশের কবিরা আদিরসের গান লিখিতে গেলেই রাধাকৃষ্ণের দোহাই দিতেন। নিজের মনের ভাব ছল করিয়া রাধা-কৃষ্ণের ঘাড়ে চাপাইয়া দিতেন। পাঁচালী-ওয়ালারাও এই কাজ করিতেন, কবিওয়ালারাও করিতেন, ঝুমুরওয়ালারাও অনেক সময় করিতেন।"[৪১] রবীন্দ্রনাথের 'বৈষ্ণব কবিতা'ও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

পূর্ব পাকিস্তানের খ্যাতনামা কবিয়াল শ্রীরমেশ চন্দ্র শীল মাইজ-ভাণ্ডার পন্থী মারফতী গান লিখে 'নূরের ঝঙ্কার' নামে কয়েক খণ্ড পুস্তিকায় তা প্রকাশ করেছেন। এতে রটে গেল যে, রমেশশীল মাইজ-ভাণ্ডার দরবারে মুরিদ হয়েছেন। কথাটি

৪০ শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ পৃঃ ৩২১—৩০
৪১ ভূমিকা—পৃঃ ২—বিদ্যাপতির কীর্তিলতা

আমার কানে এলে আমি শ্রীরমেশ চন্দ্র শীলকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, 'একবার উরুসের সময় মাইজ-ভাণ্ডার গিয়েছিলাম। দেখলাম দিন-রাত মাইজ-ভাণ্ডারী গানের আসর চলছে। কিন্তু যারা গান বেঁধেছে, তারা ভাল করে বাঁধতে পারে নি, ফলে সুরতাল উঠছে না। আমি ভাবলাম, এরূপ গান লিখলে বেশ কাটতি হবে—আমার পয়সা হবে। তাই মাইজ-ভাণ্ডারী গান লিখে ছাপিয়ে দিলাম।' এমনি পেশার লোভে না হোক, অন্তত জনপ্রিয়তার লোভে যে কোন কোন মুসলমান কবি রাধাকৃষ্ণ লীলা ও শাক্তপদ রচনা করেছিলেন তাতে সন্দেহের অবকাশ কম।

আবার নির্বোধের অন্ধ অনুকৃতিও যে ছিল না তা নয়, সম্ভোগ, বাৎসল্য, গৌরচন্দ্রিকা, শাক্তপদ প্রভৃতি এবং কৃষ্ণলীলার অনুকরণে নবীলীলা বর্ণনার প্রয়াসের মধ্যে এর আভাস আছে।

এবার আমাদের সংকলন সম্বন্ধে দুএকটা কথা নিবেদন করব।

মুখ্যত মরহুম আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ-সংগৃহীত রাগমালা ও গীতাবলী সম্বল করে মুসলিম কবির পদ-সাহিত্য সংকলিত হল। সাহিত্যবিশারদের গোড়ার দিকের সংগৃহীত ও প্রকাশিত পদাবলী ব্রজসুন্দর সান্যালের 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি' গ্রন্থের চারখণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল। পঞ্চমখণ্ড প্রকাশের কথা বিজ্ঞাপিত হয়েছিল বটে, কিন্তু প্রকাশিত হয়নি।

পূর্ব পাকিস্তানে পত্র-পত্রিকা দুর্লভ বলে আমরা সাহিত্যবিশারদ-প্রকাশিত অধিকাংশ পদ দেখবার সুযোগ পাইনি। তাই বর্তমান সংকলনের পদগুলো সাহিত্যবিশারদ-সংগৃহীত ২৭খানা, রাগমালা ও ৬ খানা গীতি সংগ্রহ এবং আমাদের সংগৃহীত আরো চারখানা রাগমালা ও গীতিমালা থেকেই আমাদের সংগ্রহ করতে হয়েছে। উৎস যখন অভিন্ন, তখন আশা করি, সাহিত্যবিশারদ-প্রকাশিত কোন পদ বাদ পড়েনি। এসব ছাড়া জগদ্বন্ধু ভদ্রের গৌরপদ তরঙ্গিনী, রায়বাহাদুর সতীশ চন্দ্র রায়ের পদকল্পতরু ও অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী, চারু চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস ও অন্যান্য বৈষ্ণব মহাজন গীতিকা' এবং রমণীমোহন মল্লিকের 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি'তে বিধৃত মুসলিম কবির পদগুলো সংকলন করেছি। এভাবে সাধ্যমত মুসলিম কবির জ্ঞাত পদগুলো এ সংকলনে জড়ো করা হল।

গৌরপদ-তরঙ্গিনী, পদকল্পতরু, অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী প্রভৃতি গ্রন্থে মোট সাতজন কবির পদ সংকলিত হয়েছিল। রমণী মোহনের 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি' গ্রন্থে নয়জন কবির ২৫টি পদ আছে আর ব্রজসুন্দর সান্যালের গ্রন্থে গরীব খান ও

চাঁদ কাজীর পদ ছাড়া আর সব পদও উদ্ধৃত হয়েছে। ফলে ব্রজসুন্দর সান্যালের 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি' গ্রন্থের চার খণ্ডে মোট ৪১ জন কবির পদ বিধৃত হয়েছে। অতএব আগেকার সংকলন গ্রন্থগুলোতে মোট ৪৩ জন কবির ১৫৮ টি পদ মুদ্রিত হয়েছে।

আপাতত আমাদের হাতের কাছে পুথিপত্র যা পাওয়া গেছে তার থেকে এ কয়জন পদকারের পদাবলীই সংকলিত হল। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। এ কয়জনের এ কয়টি পদই এ ধারার পুরো রচনা বলে মনে করলে ভুল হবে। আমাদের বিশ্বাস নতুন পুথি সংগৃহীত হলে অজ্ঞাতপূর্ব আরো অনেক পদকার ও পদাবলী মিলবে এবং নিশ্চয়ই অনেক পদ ও পদকারের নাম কালে লোপও পেয়েছে।

'বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবি' গ্রন্থে একশ জন কবির একটি করে পদ গৃহীত হয়েছে। সম্পাদক জনাব যতীন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দ অবধি রচিত ও প্রকাশিত পদ গ্রহণ করেছেন। আমাদের মতে আঠার শতকের পরের কার—বড় জোর উনিশ শতকের প্রথমার্ধের পরে রচিত পদাবলীর কোন সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক কিংবা ঐতিহাসিক মূল্য নেই। কেননা, যুগ পাল্‌টে যাওয়ার পরও এ-শ্রেণীর পদ রচনা পিছিয়ে-পড়া মনের পরিচায়ক। যুগ প্রভাব যখন যুগের গণমানসে প্রতিফলিত হয়ে অভিব্যক্তি লাভ করে, তখনই তার সর্বাত্মক মূল্য ও গুরুত্ব স্বীকৃত হয়। কারণ, তখন তা হয় প্রগতিশীল যুগধর মনেরই প্রতীক ও প্রতিভূ। সাম্প্রতকালে রচিত পদের এরূপ কোন মূল্য বা গুরুত্ব থাকতে পারে না। এগুলোকে এখন 'লোক সাহিত্য' হিসাবে বিচার করা যেতে পারে। আমরা যে যুগের পদ সংগ্রহ করছি, সেযুগে এ-সব পদ শিক্ষিত ও পণ্ডিত কবির শালীন সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ-যুগে অল্প-শিক্ষিত লোকেই কেবল এসব পদ রচনা করেন। কাজেই তাঁদের 'লোককবি' বলেই জানতে ও মানতে হবে। এ কারণেই আমরা উনিশ-শতকের প্রথম পাদের পরের-কার পদ সংকলন করিনি।

'রাগমালা' গুলোতে কয়েকজন অজ্ঞাতপূর্ব হিন্দু কবির পদও পেয়েছি। সেগুলোও সংগ্রহ করেছি এবং সেগুলো ভবিষ্যতে প্রকাশিত হবে।

সন্দেহের সুযোগ নিয়ে ভণিতাহীন পদগুলো মুসলিম কবির রচিত বলে অনুমান করেছি। আমাদের অনুমানের ভিত্তি অবশ্য দৃঢ় নয়, তবে দেখছি মুসলিম রচিত রাগমালায় মুসলিম সমাজে পরিচিত পদই বিধৃত হয়েছে বেশী, সে সূত্রেই মনে করেছি ভণিতাহীন পদগুলো হয়তো মুসলিম রচিত।

—আহমদ শরীফ

॥ রূপ ॥

॥ ১ ॥

দেখ সখি তরুমূলে ঐ না নাগর রে।
রসময় পূরে বাঁশি রঙ্গিমা অধরে ॥
ললাটেত ফোঁটা দোলে কুণ্ডল শ্রবণে।
মানিনীর মন হরে কটাক্ষ চাহনে ॥
মালতীর মালা গলে বদন সুন্দর।
পীত ধটি কাঁচুলি চরণে নেপুর ॥
কহে নসির মোহাম্মদে শুন ধনি রাই।
ভজ কামপুর অই নাগর কানাই ॥

॥ ২ ॥

[আশোয়ারি। উড়িয়া খেমটা]

হের গো নিলগিরি রাজিহি।
সুভদ্রা বলরাম সঙ্গে অনুপাম
সিনান মণ্ডপ মাঝহি ॥ ধ্রু ॥
শঙ্খ ঘণ্টা কাঁশী বেণু বীণা বাঁশী
মধুর দুন্দুভি বাজন্তি।
সেবাতি পড়্যারি ঘট ভরি বারি
ঢারউ তাকন্ধু মাখন্তি ॥
জয় জয় ধনি সুর নর মুনি,
স্তুতি নতি প্রণিপাত হি।
শ্রীমুখ চন্দ্রকু সৌরভ আউছ
গজেন্দ্র বেশউ আপহি ॥
জয় যদুপতি তিন-লোক গতি
বহু উপহার ভোজন্তি।
মণি কোঠা চলে সালেহবেগ বলে
দেব-নারীগণ নাচন্তি ॥ [১]

॥ ৩ ॥

[তুড়ি]

নাগরী, নাগরী, নাগরী।
কত প্রেমের আগরি নব নাগরী ॥ ধু ॥
কনক কেতকী চম্পা তড়িত বরণী
ইন্দীবর নীলমণি জলদ বসনী।
মৃগ পঙ্কজ মীন খঞ্জন নয়ানী
কামধনু ভ্রমর-পংক্তি ভুরু ভুজঙ্গিনী।
নাসা তিলফুল খগ চম্পাকলি জিতা।
যামি জল বহন্তি বেণী ঝাঁপি ঝলকিতা।
ভালে সে সিন্দূর বিন্দু শোভে কেশ-শোভা
জিনি ইন্দীবর বাহু তমালের আভা।
ভালে বিরাজিত কর উরে মোতিম-হারা
হংস বক শ্রেণী গঙ্গাজল দুগ্ধ ধারা।
কহে সালেহবেগ হীন জগত পামরা
রসের কলিকা রাই কানু সে ভ্রমরা।

॥ ৪ ॥

[রাগিনী—রামক্রিয়া]

(যুগল রূপ)

সই দেখরে রঙ্গ কেলি
এ নাট মন্দিরে নাচে রাধা বনমালী ॥ ধু ॥
খেলে রাই কানু মিলি দুই তনু
সেই রূপে উঝলএ জিনি কোটি ভানু।
খেনে খেনে শ্যাম নাগর গোকুলে ব্যাপিত।
শ্যামরূপ হেরিয়া রাধা হরষিত ॥
কহে সৈয়দ আইনুদ্দিনে আনন্দ কথা।
শুনিতে শ্রবণে সুখ গাও যথা তথা।

---

১ পদকল্পতরু—সতীশ রায়, পদসংখ্যা ১৫৪২

॥ ৫ ॥

[মালসী]

খোস না লাগে মোর গৃহের বেভার
রাজপন্থে ননদিয়া দিছে আঁখিঠার। ধু।
একেত চিকন কালা আরো বিনোদিয়া।
ঠমকে মোহিত কৈল অবলার হিয়া॥
তড়িত-চমক জিনি ঐ রূপ ভঙ্গিমা।
অরুণ নিন্দিয়া আছে অধর রঙ্গিমা॥
কহে সৈয়দ আইনুদ্দিনে ধৈর্য ধর গিয়া।
গোপত মন্দিরে নাগর লওত বরিয়া॥

॥ ৬ ॥

[ধানসী গুজ্জরী]

বিনোদিয়া জলদ-বরণ কালা গো সই। ধু।
আপনা নয়নে কভু নাহি দেখি
জলদ বরণ কালা গো সই।
চূড়াটি বানাইয়া বাম অঙ্গে টালিয়া
তাত শোভে মালতীর মালা গো সই।
হাটিয়া যাইতে নেপুর বাজএ
কেলি-কদম্বেরি তলে গো সই।
কহে আইনুদ্দিন কেলি অনুক্ষণ
শাহ আকবর পদে করিয়া চুম্বন।

॥ ৭ ॥

[রাগ-রাম কেলি]

(নবীরূপ)

হালিমা তুয়া বর ভাগ্য এ বিশেষ
আল্লার পরম সখা মনুষ্য মূরতি লেখা
দুগ্ধ পিএ বালকের বেশ। ধু।
ওফলঙ্গ-রাজ-সুতা আমিনা বিবি সুচরিতা
নবীর কিরণ আসি পেখে।
অহি রূপ নিরক্ষিতে ঘরে যাইতে না লয় চিতে
চুম্বে আসি অহি চান্দ মুখে।
নবীর মুখের হাসি যেন পরতেক শশী
দেখিতে যেহেন লাগে সুর।
সুন্দর নখের ভাতি যেন চান্দ পাঁতি পাঁতি
লাজে তিমির ভেল দূর।
নবীর গায়ের কান্তি গগনে চমকে জুতি
পদতলে অরুণ লুকায়।
খান গয়াসে ভণে আরব কোরেশগণে
ভজ গিয়া অহি রাঙা পায়।

॥ ৮ ॥

[রাগ-ধানসী]

দেখ সখি ও নাগর মন মোহনিয়া,
অনঙ্গে এড়ল অঙ্গ সে রূপ হেরিয়া॥ ধু।
বদন দর্পণ যেন আঁখি-যুগ মণি।
ভুরুর ভঙ্গিমা দেখি মোহে মন-মুনি॥
সুধারসময় হাসি বচন অমিয়া।
সুললিত অঙ্গরূপ মৃগাঙ্ক জিনিয়া॥
কহে নজর মোহাম্মদে রাধার নেহা।[১]
ভজ সখি সো নাগর মনোহর গাহা॥

॥ ৯ ॥

[কামকেলী]

বাহির হইয়া দেখরে রাধা বিনোদ রায় সাজে।
গো-ধেনু লইয়া রঙ্গে চলে কানু আন সঙ্গে
চলিতে চলিতে সুরঙ্গ সিঙ্গাটি বাজায়। ধু।

---

১ পুথির পাঠ : কহে নজর মোহাম্মদ দয়াধনাহা।

আগে পাছে শত ধেনু তার মাঝে কামকানু
সঙ্গে করি বলরাম ভাই।
সবে বোলে ভাই কানু-কামে লইল
শিঙ্গা-বেণু
তার সাথে চল গীত গাই।
দিল্লীর আগে বিস্তর দূর তার মাঝে
ইসলামপুর
তাতে কামকানু করে কেলি।
হীন গয়াসে কহে এই কথা মরমে দহে
এহি কানু আঁখির পোতলি।

॥ ১০ ॥

হরির অরিপতি তাহান সন্ততি
বাম পাশে চূড়া টালিছে
মাথে নানাফুল দেখি অলিকুল
উড়ে উড়ে ভ্রমি রহিছে।
পঙ্কজলোচন নাসিকা গঠন
ভুবনে নাহিক তুলনা
না চলে নয়ান হেরিতে বয়ান
হেরি মুনি-মন মোহনা।
ভাল এ শ্রীখণ্ড ভুরু কামদণ্ড
নয়ান অঞ্জনে রঞ্জিছে।
ভুজ ভুজঙ্গিণী কটিতে কিঙ্কিণী
তাতে বনমালা শোভিছে।
সুললিত ধ্বনি গাগরী কিঙ্কিণী
চলিতে রুণুঝুণু বাজিছে
কহে মোহাম্মদ পরাণ এই পদে লেখে নাম
সংসার ছাড়ি মন লাগিছে।

॥ ১১ ॥

[রাগ—পুরবী]

হের দে কালারে নয়ন ভরিয়া রূপ
দেখি। ধু।
বন্ধুর বন্ধন দুঃখীর কাঞ্চন
নিধনিয়ার ধন তুমি।
মধুর বচন বুলি জগত করিছ বন্দী
নিঠুর হইয়া কেনে থাক।
মায়ার জঞ্জাল ছাড়ি রৈয়াছি আনন্দ করি
কিসের লাগিয়া তুমি কান্দ।
কহে রেয়াছক এহি স্বপনে ভুলাও আসি
তোমারে না দেখি আমি মরি।

॥ ১২ ॥

[লাগোধা ভাটিয়াল]

ওকি অপরূপ পেখিলুঁ বিপিন মাঝে
যার যত হিত চিত প্রকাশিত
সাফল নয়ান সাজে। ধু।
কৌতুক কারণে গেলুঁ বৃন্দাবনে
দেখিতে সো বন্ধু শ্যাম।
কুঞ্জ নিকুঞ্জ বনে অলিকুল গুঞ্জরে
মধু পিএ রঙ্গে আর ঢঙ্গে
মল্লিকা কিংশুক হেরি পঁহু মুখ
হাসি বিকশিত রঙ্গে।
নানা পক্ষী রবে সুধারস গাবে
পিয়া গুণ অনুপাম
পিক ধ্বনি ধিক চাতক ঘাতক
পিউ পিউ জপে নাম।

কহে মোহাম্মদ রহে মান সম্পদ
প্রভু পদে করহ ভকতি
ও রাঙ্গা চরণে লইলু^ঁ শরণে
মরণে তরিতে গতি।

॥ ১৩ ॥
[কল্যাণ]

মধুর মুররী ধ্বনি শুনিতে সুস্বর।
ভুবন মোহন রূপ চলহ মধুর ॥ ধু ।
কি রঙ্গ দেখিলাম সই রে যমুনার কূলে।
পুলকিয়া উঠে প্রাণ ছট-ফট করে ॥
কালিয়ার নাচনি চাইতে প্রাণি নিল হরি।
ঠাম্‌রু ঠুম্‌রু নাচে আপনা পাসরি ॥
মোহাম্মদ হানিফে কহে কি রঙ্গ দেখিলুম।
মেঘেরে চলিয়া যাইতে নিরক্ষি চাহিলুম ॥

॥ ১৪ ॥
[আশাবরী]

দেখ সই অপরূপ নন্দ গোপাল।
কপালে চন্দন ফোঁটা বিনোদ টালনি ঝুঁটা
গলে শোভে বকুল মাল । ধু ।
শ্রবণে কুণ্ডল দোলে কটাক্ষে ভুবন ভোলে
শ্রীমুখ অতি অনুপাম।
করেতে মোহন বেণু নির্মল কোমল তনু
অতসী কুসুম জিনি শ্যাম।
কটিতে পীতাম্বর দেখিতে মনোহর
মুকুন্দ মোহন যদুরায়।
দাঁড়াইয়া কদম্ব তলে সুনাদ মুরলী পুরে
তিন-লোক মোহিত যায়।

ফকির হবিব বলে কানুরে দেখিনু ভালে
যেন শশী পূর্ণিমা উদয়।
হেন মোর করে হিয়া কানুরে সমুখে থুইয়া
নিরবধি দেখইঁ সদায়।

॥ ১৫ ॥

সখি দেখ নাগর ব্রজরায়
ভুবন মোহন সাজ । ধু ।
চান্দ ছান্দ এ চান্দ বয়ান।
জগত জনম ফান্দ চান্দ ঝুঁটা
চান্দ কপালের মাঝে
চান্দ মণ্ডল চান্দ কুণ্ডল
চান্দ উপজল মন [illegible]।
অধর রঙ্গিমা ভুরুর ভঙ্গিমা
নয়ান খঞ্জনি রে।
অগুরু শীতল রমণী অখিল
রমণীর মনচোর রে।

॥ ১৬ ॥

ধনি ধনি সুবদনী কর অবধান
নানা বিভূষিত সাজে
ঘু-ঙ্ঘুর ঝুমুকে বাজে
এহি নাকি নন্দের ঘরের কান । ধু ।
নয়ান বঙ্কিম বাণে
যুবতী মরমে হানে
নিমেখ দর্শনে হরে প্রাণ।
হেরি কুলবতীগণ
হারাইয়াছএ তন
ভেটাইতে ছাড়ে লাজ মান।

॥ ১৭ ॥

গা তোল গা তোল হরি—জীবন আমার
প্রভাতেত চান্দমুখ দেখিএ তোমার ॥ ধু ।
কাঞ্চনের ঝারি দিব রতনের বাটি
বাসক খড়িকা দিমু পাখাল মুখ ঝাটি ।
রাত্রি পোহাইয়া গেল পূর্বে উলে শুক
গা তোল জীবন গোপাল দেখি চন্দ্রমুখ ।

॥ ১৮ ॥

[রামক্রীড়া]

কেন আইলাম জলে সখীরে
কেন আইলাম জলে ।
দেখিলাম শ্যাম বন্ধুর রূপ কদমতলে ॥ ধু ।
সাঁঝে নিজে থু' সখীর সঙ্গে
জলে আইলাম চলে
রবি গেল ত্বরা, শ্যামরূপ নিরক্ষিতে
কলসী না গেল ভরা ।
জীবন যৌবন বন্ধু জোয়ারের পানি
এমত নিঠুর কালা আমিত না জানি ।
হের আইস প্রাণের বন্ধু খাও বাটার পান
ধীরে ধীরে কহ কথা জুড়াক পরাণ ।

॥ ১৯ ॥

এখানে রহিও রাধা এখানে রহিও
নয়ানের সাধ গেলে তবে তুমি যাইও । ধু ।
যমুনার জলে যাইতে না পারিল রাধা
ভাঙ্গিল কাঁখের কলসী হাতে রৈল কাঁধা ।
কোন্ বিধি সৃজিলেক স্রোতের শেওলি
এমন বান্ধব নাহি ডাকে রাধা বলি ।
কোন্ বিধি সৃজিলেক গোপালের নারী
তাহে দধির পশার ফিরি বাড়ি বাড়ি ।
সাত নাহি পাঁচ নাহি হাত হোন্তে লড়ি
যার লাগি এত দুঃখ সেহ প্রাণের বৈরী ।

॥ ২০ ॥

কংসশূর রাজভগ্নী তোমার নেতের অঞ্চলে
কি ধন ছাপাইয়াছ তারে দেখিছি আমি । ধু
অগুরু চন্দন সুগন্ধি মাজন
মাখিয়া শ্যামের গাএ
আগর ডালা মাথাতে লইয়া
যমুনা স্নানেতে যায় ।
উত্তরে দক্ষিণে পূর্বে পশ্চিমে চৌদিকে
পড়ি গেল ধাঁধাঁ
কাঁখের কলসী ভূমিতে রাখিয়া
মিনতি করে রাধা ।
বলো না নন্দের ছাওয়াল
এতো চাতুরালি তোর
হিলে বিলে বাঁশিটি হারাইয়া
মামীরে ধর চোর ।
জল ভরে সুন্দরী রাধে জলের দিকে মন
আর অন্তরে থাকিয়া নন্দের ছাওয়ালে
দেখিল রাধিকার স্তন ।
সোনা দিমু সেরে সেরে রূপা যত লাগে
কালুকা বেহানে বাঁশিটি বানাইয়া দিমু
নন্দের ছাবালের হাতে ।

॥ ২১ ॥

[রাগ-হিল্লোল]

সখি প্রাণি হরিয়া নিল কানাইয়া। ধু।
একেত চিকণ কালা
গলে শোভে মোহন মালা।
মোহিত করিল জগ জনুয়া।
কপালে চন্দন ফোঁটা মুখের বচন মিঠা
আঁখি ঠারে প্রাণি নিল কাড়িয়া ॥

॥ ২২ ॥

[রাগ-আসাবরি]

চলি গেল রসবতী ভেটিবারে শ্যাম।
অগুরু চন্দন গায় সোনার নেপুর পায়
ঝুনু ঝুনু শব্দ অবিরাম।
বাঁধিছে মোহন খোপা
উপবিষ্ট দোলে হেম থোপা
এ কাম সিন্দুর সিঁথি পরে
কাজলে রঞ্জিত আঁখি জিনিয়া খঞ্জন পাখী
হেরি হেরি মনোহরে।
গীমে গজমোতিহার করেত কঙ্কন তার
নাসিকায় বেসর বিরাজ
সখিগণ সঙ্গে লৈয়া বাঙ্গা-রথে আরোহিয়া
উপনীত বৃন্দাবন মাঝ।

॥ ২৩ ॥

সখি সুন্দরি ও আসুক মঙ্গলদাতা। ধু।
বিগলিত চিকুর মিলিত মুখ মণ্ডল
চান্দের বরণ মালা চঞ্চল কুণ্ডল।
কপাল ধূলিত ভেল
ঘামে তিলক বহিয়া নেল।
কঙ্কণ কিঙ্কিণী লাঘব বর
লহু লহু নূপুর বাজে।
রতি-রস মদন
পরবেশ পায় মন,
জয় জয় দুন্দুভি বাজে।

॥ ২৪ ॥

[ধানশী বেলাবলী রাগ]

অকি অপরূপ রূপের রমণী ধনি ধনি
চলিতে পেখল গজ-রাজ-গমনি ধনি ধনি। ধু
কাজলে রঞ্জিত ধনি ধবল নয়ন ভালে
ভোমরা ভুলল বিমল কমল দলে ॥
গুমান না কর ধনি ক্ষীণ অতি মাঝাখানি
কুচগিরি ফলের ভরে
ভাঙ্গি পড়িব যৌবনি ॥
সুন্দরী চান্দ মুখে বচন বোলসি হাসি
অমিয়া খরিখে যৈসে শারদ পূর্ণিমা শশী ॥
শেখ কবীরে ভণে অহি গুণ পামরে জানে
সুলতান নাসির সাহা ভুলিছে কমলবনে ॥

॥ ২৫ ॥

[বিভাস]

কালা রূপ কেনে উপজিল গোকুল কুলে। ধু
কালা আসন কালা বসন বড় চিকণ কালা
কালা কালা পুষ্পে গাঁথিয়া পর মালা।
সাত পাঁচ সখী মিলি যমুনাতে গিয়া
চিত্ত উড়া করে মোর ঐ বন্ধুর লাগিয়া।
সিন্দূরের বিন্দু বিন্দু কাজলের রেখা
নবীন মেঘের আড়ে চান্দে দিল দেখা।
সৈয়দ মর্তুজা কহে শুন রে কালিয়া
পর কি আপনা হয় পিরীতি লাগিয়া।

॥ ২৬ ॥

[নট]

না জানি ওরে গুণ নিধি
তুয়া বিনে আর নাহি জানি। ধু
(কানু) মাঠে থাকে ধেনু রাখে গলে
দোলে মালা।
তুমিত সুন্দর রাধে কানু কেনে কালা।
হাতে শঙ্খ কানে সোনা
পরি মোহন শাড়ী ॥…
বলিও বন্ধুর আগে জীবন উপায়
চান্দমুখ দরশনে নয়ান জুড়ায় ॥
সৈয়দ মর্তুজা কহে অকূল পাথার।
নদীয়া কিনারে থাকি বন্ধু না জানম
সাঁতার।

॥ ২৭ ॥

[আহিরী]

ভুবন মোহন রূপ অতি মনোহর।
ঝলমল করে রূপ দেখিতে সুন্দর ॥ ধু।
তরুমূলে করে কেলি ত্রিভঙ্গ হইয়া
কত কত নাগরী রহে চান্দ মুখ চাইয়া।
জিনি শশী দিবাকর জিনিয়া উঝল
আন মোহিত হইল ব্রজ রমণী সকল।
কপালে তিলক চান্দ জিনি তাবাগণে
চিকুর জিনিয়া ছটা পড়িছে গগনে।
সৈয়দ মর্তুজা কহে নাগর রসিয়া
আন ভুলায়ল মুরলী শুনাইয়া।

॥ ২৮ ॥

বসে ঠামে ঠামে কে বলে কালিয়া
ভোলা অন্তরে
বাহিরে কালা নহে রস বিনোদিয়া। ধু
কি মোর নসিবের লেখা নয়ানে নয়ানে
দেখা
প্রাণি যায় ঝুরিয়া ঝুরিয়া।
কালা নহে রস বিনোদিয়া,
মন কাড়ে আর বাঁশি বাএ
হালিয়া চলিয়া যায়,
বাঁশীর সানে রাধার মন কান্দে।
কি তার চূড়ার ঠাম
মুখ খানি পূর্ণিমার চান্দ
চূড়ার উপরে ভ্রমর গুঞ্জরে
সৈয়দ মর্তুজা কয় পর কি আপনা হয়
পরের লাগি পরের মন কান্দে।

॥ ২৯ ॥

[তুড়ি ভাটিয়াল]

শ্যাম, আন না লয় মনে।
ভুবন মোহন রূপ লাগিছে মরমে। ধু।
মণিময় কুণ্ডল কর্ণেত দোলে
নবরঙ্গ বন মালা হিয়ার মাঝে লোলে।
চরণে শরণ লৈলুঁ না বাসিও ভিন
সহজে অবলা মুঞি পরের অধীন
সৈয়দ মর্তুজা কহে রসময় শ্যাম
চরণে শরণে লৈলুঁ পাইয়া নিজ নাম।

॥ ৩০ ॥

[রাগ গুঞ্জরী]

দারুণ কালা

সবে বলে কালা কালা আমি বলি শ্যাম
অঞ্চলে বান্ধিয়া রাখম কালার নিজ নাম।
ভাণ্ড ভাঙ্গিয়া ননী খাবাইলুম তোরে
তবেহ দারুণ কালা না হইলা আমারে।
বনের হরিণী কহে কার ধার ধারি

আপন মাংসের লাগি জগ কৈলু' বৈরী।
সৈয়দ মর্তুজা কহে শুন রে কালিয়া
নিভানো মনের আগুন কে দিল জ্বালিয়া।

॥ ৩১ ॥
[কেদার]
(যুগল রূপ)

রাধা মাধব নিকুঞ্জ বনে। ধু।
ব্রহ্মা যারে স্তুতি করে চারি বয়ানে
হেন হরি নারায়ণ দেখিবা নয়ানে।
পুষ্প চন্দন লৈয়া গোপী সব ধায়
মেলি মেলি মারে পুষ্প গোবিন্দের গায়।
পুষ্প চন্দনের ঘায় জর্জরিত হরি।
মাধবী লতার তলে লুকায় মুরারি।
মাধবী লতার তলে নন্দসুত রৈলা
শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া গোপী কান্দিতে লাগিলা।
মীর ফয়জুল্লাহ কহে অপরূপ লীলা
শ্যামরূপ দরশনে দরবহে শিলা।

॥ ৩২ ॥
[তুড়ি পরহু]

দেখ সখি শ্যাম মোহনিয়া।
এ রূপ যৌবন করিয়া নিছন.
রাঙ্গা পদে ভজ গিয়া। ধু।
মোহনিয়া কালা. মোহনিয়া মালা
মোহনিয়া বাঁশী বাজাএ
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা দিতে নাহি সীমা
জগমন মুরুছাএ।
চূড়ার ছান্দে অন্তর বান্ধে
ধরে নটবর বেশ
কপালে চন্দন মদন মোহন
মজাইল গোকুল দেশ।
মকর কুণ্ডল অরুণ মণ্ডল
মূরছিত কোটি কাম
বচন সে শোভা মুনি-মন লোভা
আনন্দ রসের ধাম।
বাঁশের বাঁশী গরল রাশি
যুবতী বধিতে ফাঁসি
শুনিয়া ও ধ্বনি কুলের রমণী
বিনি মূলে হয় দাসী।
মীর ফয়জুল্লাহ ভণে লাগলি নয়নে
কেমনে ধৈরজ ধরি
শ্যাম সুনাগর রসের সাগর
তিলেক না দেখি মরি।

॥ ৩৩ ॥
[রাগ—বসন্ত]

কত কত মোহন মোহনি জান। ধু।
কুটিল কুন্তল ফান্দ বেড়িয়াছে মুখ চান্দ
গোপীগণে বান্ধাইতে আশ
যেহেন নির্মল শশী ঢাকিছে জলদে আসি
দেখা দিলে তিমির বিনাশ।
সুগন্ধ তিমির কেশ রহিয়াছে মোহাবেশ
মুখ চান্দ রহিয়াছে ছাপাএ
একেবারে অনুপাম নিশি দিশি একি ঠাম
লক্ষিবারে লক্ষ্যণ না যাএ।
কিবা রাত্র কিবা দিন নহে রূপ ভিন্ন ভিন
এ চান্দ সুরুজ নহে তাত
সৈয়দ সুলতানে কহু' সেই যে আমার পহু'
দেখা না দে সবার বিদিত।

॥ ৩৪ ॥

[কল্যাণ]

সইগণ বড় অপরূপ সাজে
একি অপরূপ অপ্সরী তেজি সুরপুরী
আএল ভুবন মাঝে। ধু।
শিষেত সিন্দুর নয়ানে কাজর
বড় অপরূপ রঙ্গ
রাহু দিবাকর কিয়ে শশোদর
তিন ভেল একহি অঙ্গ।
অরুণ বরণ যুগল নয়ন
কাজল লজ্জিত ভেল
কনক কমল উপরে ভ্রমর
খঞ্জন করএ খেল।
সর্ব অঙ্গ হেন গজেন্দ্র গমন
করী-অরি জিনি মাঝ
কেয়ুর কঙ্কণ কিঙ্কিণী নূপুর
সঘনে করএ গাজ।
হেন কামিনীর হইব কিঙ্কর
শুন সব মতিমান
নওল যৌবন কামিনী মোহন
শ্রী আলাওলে ভাণ।

॥ ৩৫ ॥

[রাগ বিভাস]

একি মিতা কি কহব মুই তুঝে ঠাম
লতিকা অধিপতি লাস লীলা ময়
হেরিতে হরএ মন কাম ॥ ধু।
দামনত লতাএ চান্দ কি উললহি
চকোর ভুলসি সুধা কাজে।
সিন্দুর সূর মুখ অধিপতি সম সুখ
ভজলিহ রাহু কোঁর মাঝে।
মনোহর কুচস্থল কাঞ্চন যুগল শ্রীফল
নীল জড়িত পরকাশে।
রসে অলি-যুগ ভুলি মুদিত কমলে বুলি
তুছ পরে কত লণী আছে।
কহে ফতে খানি জোহি পাইল ধনি
সোহি পুরুখ বর জান।
পূরল মনোরথ সকল কলাবত
শ্রী আলাওল ভাণ।[১]

॥ ৩৬ ॥

[রাগ পঞ্চম]

না ল সজনি সই তুঝে বলম মুই নাকো। ধু
শ্যাম রূপ দেখিয়া প্রাণি বিদরে হিয়া
দেখিয়া শ্যামের রূপ রাধে
ভাল ক্ষেণে হইল দেখা আছিল কর্মের লেখা
কানু সঙ্গে ভেল পরিবাদে।
অখিল গোপাল লৈয়া আর রাধা সঙ্গী হৈয়া
মরমে প্রেম যাচে ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা
আলাওল ভাণ মরমে সাধ হইয়াছে।

॥ ৩৭ ॥

[নট সিন্দুরা]

কালিয়া নাচেরে রমণী সমাজে ভাল। ধু।
ঝিকি মিকি তালে ঝেনা কেটি বাজে
নাচে আর গাহে কালা সখীসব মাঝে।
মৃদঙ্গ বাজেরে তাধিয়া বাজে করতাল
সহস্র গোপিণী মাঝে কানু নাচে ভাল।

---

১ শ্রী আলাওল খান।

করেত কঙ্কণ শোভে কটিতে কিঙ্কিণী
চরণে নেপুর বাজে রুণু ঝুণু শুনি।
নাচে আর গাহে কালা রমণী সমাজে
রবাব বেণু বাঁশী মধুর মধুর গাজে।
মীর্জা কাঙ্গালী ভণে দেখহ চরিত
তারা সব সঙ্গে চান্দ নাচত ভূমিত।

॥ ৩৮ ॥

[সুহি বেলোয়ার]

নাচে কানু ঘুমি ঘুমি রমণীর সমাজে
ঝুঘুরু ঘুগুরু ঝাকে ঝলকিত বাজে। ধু।
কিনি কিনি কিঙ্কিণী নুপুর কি রিমি ঝিমি
ঝুনু ঝুনু পুনু পুনু পূরে রস বাণী।
মৃদঙ্গ করতালিয়া নাচে তাথিং তা থৈআ
ঝিঙ্কিটী ঝিমি কীটি বাজে থাব্বর থৈআ।
ঝাঁকে উড়ে পড়ে শশী ঝলকএ রাশি রাশি
ঝাঁকে উড়ে ঝাঁকে পড়ে সঙ্গে শ্যাম বাঁশি।
রসময় নাটপুরে মথুরায় নটবরে
ভঞ্জ রঙ্গে তা ধনি ভণে মনোহরে।

॥ ৩৯ ॥

[রাগ-বৈরাগী]

দেখরে সই কালিন্দীর কিনারে শ্যামরায়। ধু
অগুরু চন্দন গায় সোনার নেপুর পায়
হের দেখ রাধার বন্ধু যায়
শুনিয়া বাঁশীর গীত মন মোর উল্লসিত
মন মোর বৃন্দাবনে ধায়।
যমুনা গিয়াছে কালা সিনান করিতে ভালা
জল ছিটে শ্যামের গোরা গায়
কাঁখেত কলসী করি চলি গেল সুন্দরী
চিত্ত শান্ত শ্যামের গোরা পায়।

॥ ৪০ ॥

[তুড়ী]

চলত রাম সুন্দর শ্যাম
পাঁচনি কাচনি বেত্র বেণু
মুরলি খুরলি গান রি।
প্রিয় শ্রীদাম সুদাম মেলি
তরণি তনয়া-তীরে কেলি
ধবলি শাওলি আও-রি আও-রি
ফুকরি চলত কান রি॥
বয়েস কিশোর মোহন ভাতি
বদন ইন্দু জলদ কাঁতি
চারু চন্দ্রি গুঞ্জাহার
বদনে মদন ভান রি।
আগম নিগম বেদসার
লীলায় করত গোঠ বিহার
নাসির মামুদ করত আশ
চরণে শরণ দান রি।[১]

॥ ৪১ ॥

ছোট না রাধিকা ভরণ কলসী
মাঝা হেলি-ঢলি পড়ে
কোন্ নাগরে পাঠাইছে তোরে
দয়া নাই শ্যামের মনে।

---

১ পদকল্পতরু : পদ সংখ্যা ১৩২৯

গাছের উপরে লতার বসতি
লতার উপরে ফুল
ফুলের উপরে ভ্রমরা গুঞ্জরে
কানু এ মজাইল জাতিকুল।
সঙ্গের সঙ্গীগণ কৈল পলায়ন
একাকী চলিলাম যমুনা
যমুনাতে গেলাম বলাকা দেখিলাম
আশ্চর্য হইল মোর মন।
নদীর কিনারে বলাকা চরে
মৎস্য চুনি চুনি খায়
কোন্ নাগরে পাঠাইছে তোমারে
জলের নীচে ছায়া দেখা যায়।
ছায়া নিরখিলাম ভাবে মগ্ন হলাম
উদাস হইল মোর মন।
মুই যদি পাইতাম যতনে রাখিতাম
যামিনী কাটিতাম রসে
সঙ্গে সখী দিতাম সম্মানে রাখিতাম
দিবা কাটিত নানা সুখে।
আলিমিয়ার বাণী শুন শুন ধনি
ছাড়িয়া নদীর কুল সঙ্গে যাইবানি।

॥ ৪২ ॥

[সিন্ধুরা]

কেন্ রসবতী লাগি চলিছ সাজিয়া। ধু।
চূড়া-ছন্দে প্রাণি-বধে কুসুম জড়িয়া
লক্ষে লক্ষে অলি পড়ে ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া।
আর কত আলি সবে করে মধু পান
চূড়ার ভঙ্গিমা দেখি না রহে পরাণ।
ভাল চূড়া বাঁধিয়াছে রত্নের দোলনি
চাঁদের উপরে চাঁদ আর চাঁদ সাজনি।
চাঁদের উপরে চাঁদ কভু নাহি দেখি
দেখিলে জীবন না রহে গোকুলের মণি।
কংসবধে শুনিয়াছি চাঁদ উলাইছে গগনে
আর এক দেখি চাঁদ কানুর যোগানে।
চাঁদের রাঙ্গা চরণে রাঙ্গা চরণ বিভোল
মালতীর মালা গলে চান্দে দিল কোল।
কপালে তিলক আর ফাগুর বিলাস
ফোঁটার উপরে ফোঁটা রাহুর গরাস।
ফিরি ফোঁটার উপরে জটা রত্ন মালা
চাঁদে চাঁদে মেঘে মেঘে অরুণে সে মেলা।

॥ ৪৩ ॥

জয় জয় রাধে গোপাল গোপাঙ্গনা রে। ধু
শীশ মোর মুকুট নট শোহে কটি পীতপট
কিঙ্কিনী অধিক শোহাওনা রে।
ভাল কেশর তিলক কানে কুণ্ডল ঝলক
অধর পর মুরলি সুখ পাওনা রে।
যমুনা তট রঙ্গিনি সকল রমণী মণি
রূপ নব-দামিনি-গঞ্জনা রে
ঘন্নন ননঘ রব-বর উঘট ভেদ যন্ত্র-বর
সাত স্বর তান বিশ মূর্ছনা রে।
থিগিনি গিনি থিদ্ধিকট তগ্‌ধেনাং তিন্তিগট
সালেহ বেগ পুরল মন-কামনা রে।

॥ ৪৪ ॥

[বাগ—গান্ধার]

বিনোদিনী সাজিছে কতেক ভাতি
কনক মুকুর কাঁতি
শ্যাম দরশনে সুন্দরি তনু ল
সাজিছে কতেক ভাতি। ধু।

শিষেত সিন্দূর নয়নে কাজল
সুগন্ধি চন্দন রেখা।
অরুণ কোরেত নবজলধর
যেন চান্দে দিছে দেখা।
রসের আবেশে গমন মন্থর
হালি ঢলি চলি যায়।
আবেশে ধনি ঈষত হাসিল
ভঙ্গিম নয়নে চায়।
পিরীতি অঞ্জন লোচন খঞ্জন
জলদ দামিনী সাজে।
চাচর চিকুর বিচিত্র বিনিল
দুলিছে পিষ্ঠের মাঝে।

॥ ৪৫ ॥

[দেওরী রাগ]

বিনোদিনী ঐ সে কালিয়া কানু। ধু।
চূড়ার উপরে মালতীর মালা
শত অলি মধু পিএ
অধর রঙ্গিমা ভুরুর ভঙ্গিমা
রমণী কেমনে জিএ।
শিষের সিন্দূর নয়ান কাজর
শ্রীঅঙ্গ দোলনি দোলে
কদম্বের তলে চিকণ কালা গলে
ধরিয়া রাখিতে বোলে।
হাত রাঙ্গা পা রাঙ্গা রাঙ্গা কানের ফুল
ধেনু চরাইতে বেণু বাজাইতে
লই গেল জাতি কুল।

॥ ৪৬ ॥

[ধানসী]

কিরূপ দেখিলুম আজু গোপ শিরোমণি।
শত কোটি চাঁদ পড়ে সে মুখ নিছনি॥
কমল নয়ান যেন ভুরু শরাসন। ধু।
হেরিতে হরএ যুবতীর মন॥
ললাটে ফাগুর ফোঁটা যেন দিবাকর।
কত কত চান্দ দোলে চূড়ার উপর॥
শ্রবণে কুণ্ডল শোভে চরণে নেপুর।
অধরে মুরলী পূরে মাধুরী মধুর॥
কহে নসির মোহম্মদে শুন রে যুবতী।
শ্যাম রূপ দরশনে পূরিব আরতি॥

॥ অনুরাগ ॥

॥ ৪৭ ॥

[গুঞ্জরী ভাকা]

মুঞি কেনে পিরীতি রে কৈলু"
নিঠুর কালার সনে
নিঠুর কালার প্রেমজ্বালা না সহে পরাণে।
ঘরেত বসিয়া শুনি মথুরায় বাজে বাঁশী
সুতিলে স্বপন দেখি জাগিলে উদাসী।
বাউ নাই বাতাস রে নাই কদম্ব কেনে ছিঁড়ে
মুঞি নারীর করমের দোষে
ডাল ভাঙ্গি পড়ে।
কলসীত জল রে নাই বসিয়া রৈলু" ঘরে
সৈয়দ মর্তুজা কহে মনেত ভাবিয়া
মুঞি কেনে বসিয়া রৈলু" পিরীতির লাগিয়া।

॥ ৪৮ ॥

[তুড়ি আসোয়ারী]

মজাইলুঁরে জাতি রসিয়া নাগরের হাতে ।ধু
তুমি বন্ধু বাজাও বাঁশী আমি মরি লাজে
কলঙ্ক রহিল রাধের গোকুল সমাজে ।
এক হাতে গুয়া বন্ধু আর হাতে পান
যাহার বন্ধুয়া তুমি তাহার পরাণ ।
সৈয়দ মর্তুজা কহে কালা প্রেমের জ্বালা
ষোলশত গোপিণী মাঝে রাধা গলার মালা।

॥ ৪৯ ॥

[হিন্দোল রাগ]

প্রাণি হরি নিল কানাইয়া । ধু
ঘটেত না রহে মন
সদাই করে উচাটন
কি দিয়া রাখিনু মন মানাইয়াঁ ।
কালিয়া কালিনীর কূলে
দাণ্ডাই আছে তরুমূলে
কত রূপ ধরি বেশ বানাইয়া ।
সৈয়দ মর্তুজা কহে
তেজ রাধে লাজ ভয়ে
ঘরে যাও কানুর মন মানাইয়া ।[১]

॥ ৫০ ॥

[রাগ ভাটিয়াল]

হেলায় হারাইলুম বনমালী
পড়িয়া স্বপ্নেরে নাথ ।
মুঞি একলা নিদে হারাইলাম বনমালী । ধু
শিঙ্গা বাজে বেণু বাজে বাজে করতালি
মথুরা নগরে শুনি আনন্দ ধামালী ।
যমুনার জলে গেলুম হাতে শূন্য ঝারি
ভরমে ভুলিয়া আইলুম ঘাটে কুম্ভ বারি ।
সৈয়দ মর্তুজা কহে শুন বনমালী
পালিয়া পুষিয়া যৌবন কারে দিলুম ডালি ।

॥ ৫১ ॥

[সিন্দুরা]

সুন্দরি, তুমি নাগর ভুলাইতে জান ।
আড় নয়ন কোণে হানিলে মদন বাণে
জীউ ধরিয়া মোরে টান । ধু
একে তোমার গোরা গা না সহে ফুলের ঘা
বায় হেলিছে সব অঙ্গ ।
দেখিয়া তোমার মুখ অন্তরে বিদরে বুক
কাম সাগরে উঠে তরঙ্গ ।
তোমার যৌবনে আমি ঝাঁপ দিব মনে জানি
যদি কৃপা করহ আমারে

---

১ ভণিতার উপরে অতিরিক্ত পাঠ ;
উজ্জ্বল কালিন্দীর তীরে দাঁড়াই আছে তরুমূলে
আমার কাঁখের কলসী নহে তল
খালি করি সৈমুঁ কর জুড়াক বঁধুর মন
কলসী তুলিয়া দিব আসি ।

বুঝিয়া আপন কাজ পার কর শ্যামরাজ
চড়াইয়া নৌকার উপরে ।
সৈয়দ মর্তুজা বাণী শুন রাধা ঠাকুরাণী
ধনি ধনি তোমার জীবন
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর যারে ভাবে নিরন্তর
সে তোমার কেবল শরণ ।

॥ ৫২ ॥

[বেলাবলী]

শ্যাম বন্ধু চিত্ত নিবারণ তুমি
কোন্ শুভ দিনে দেখা তোর সনে
পাসরিতে নারি আমি । ধু
যখন দেখিএ ও চান্দ বদনে
ধৈরজ ধরিতে নারি
অভাগীর প্রাণ করে আনচান
দণ্ডে দশবার মরি ।
মোরে কর দয়া দেহ পদ-ছায়া !
শুনহ পরাণ কানু
কুলশীল সব ভাসাইনু জলে
প্রাণ না রহে তোমা বিনু ।
সৈয়দ মর্তুজা ভণে কানুর চরণে
নিবেদন শুন হরি
সকল ছাড়িয়া রহিলুঁ তুয়া পায়ে
জীবন মরণ ভরি ।

॥ ৫৩ ॥

[শ্রী গান্ধার]

বন্ধু আমার কালিয়া সোনা
স্বপনে পাইলাম বন্ধু করিয়া কামনা ।
স্বপনে বন্ধুয়া সনে দরশন ভেল
উলটি পাশ না দিতে বন্ধু কোন্ দেশে গেল ।
বন্ধুয়া বন্ধুয়া মোর গোপতের পতি
পাষাণে নিশান রৈল তুই কালার পিরীতি ॥
বন্ধুয়া বন্ধুয়া মোর শরতের তারা
তিলেক না দেখি তোরে আঁখি বহে ধারা ।
অপরূপ হের বন্ধু যৌবনের ভারা
বুক বাহি পড়ে ঘাম মাণিক্যের ধারা ।
যথা তথা যাও বন্ধু ! আসিও সকালে
তিলেক বিলম্ব হৈলে বন্ধু ঝাম্প দিব জলে ।
সৈয়দ মর্তুজা কহে শুন রে কালিয়া
পর কি আপনা হয় পিরীতি লাগিয়া ।

॥ ৫৪ ॥

[রাগ—সারাঙ্গ]

দেখ সই কালিন্দী কিনারে শ্যাম রায় । ধু
কাঁখে গাগরী করি যমুনাতে জল ভরি
নীল বসন গোরা গায় ।
কালিন্দীর জলে কালা
সিনান কৈরাছে ভালা
কায়া-রূপ জলেত মিশায় ।
আগর চন্দন গায় সোনার পাঞ্জনী পায়
গীত গাহে বাঁশিটি বাজায় ।
শুনিয়া মুরারি গীত প্রাণি মোর নহে স্থিত
নিত্য মন বৃন্দাবনে ধায় ।
সৈয়দ মর্তুজা কহে গোপাল অখিল হয়
রাধা সঙ্গে গোপী আর যায় ।

॥ ৫৫ ॥

[রাগ হিল্লোল]

আজু মুই কুলের বাহির হৈলুঁ।
মথুরাতে গোবিন্দ মুই পাইলুঁ ॥ ধু
প্রতীক্ষায় আছিল সই নিশি নৈরাশ।
দুর্লভ সে রাধিকা ছাড়িল গৃহ বাস ॥
কোথা হন্তে আইলা বন্ধু বৈস তরু তলে।
প্রাণি হরিয়া নিল কালা বাঁশির স্বরে ॥
কোথা হন্তে আইলা বন্ধু কর্ণে রাঙ্গা ফুল।
মুখের মাধুরী দিয়া নিলা জাতি কুল ॥
সৈয়দ মর্তুজা কহে অপরূপ লীলা।
শ্যামরূপ দরশনে দরবহে শিলা ॥

॥ ৫৬ ॥

[রাগ রামক্রিয়া]

সখি নাগর কানাই বিনে আর জীব না। ধু
প্রিয় প্রিয় করিয়া বালিসে দিলুম কোর।
উলটি পলটি দেখি প্রিয় নাই মোর ঘর ॥
কলসীতে জল নাই যমুনা বহু দূর।
চলিতে না পারি আমি চরণে নেপুর ॥
ঘরে আছে গুরুজন তারে না ডরাই।
মনের ভরমে আমি কানুরে হারাই ॥
সৈয়দ মর্তুজা কহে প্রেম অনুদিন।
রাধা কানু এক প্রাণ কভু নহে ভিন ॥

॥ ৫৭ ॥

[রাগ আশাবরী]

শ্যামল সুন্দর তনু দেখিলুঁ স্বপনে।
দেখিয়া মোহিত হৈলুঁ আর না লয় মনে। ধু
মেঘের বরণ তনু চিকণিয়া কালা।
বিজুলী চঞ্চলা দোলে নবগুঞ্জা মালা ॥
যে বোল বলহ বৃন্দা বোল দুরাচার।
আপনে সদয় হইলে সেহ অলঙ্কার ॥
বন্ধুয়া আসিব করি পাতিয়াছি ফান্দ।
মুখানি নিছিয়া ফেলাম লাখ কোটি চান্দ ॥
কেহ বলে কালা কালা আমি বলি শ্যাম।
আঞ্চলে বান্ধিয়া রাখম কালার নিজ নাম ॥
সৈয়দ মর্তুজা কহে এহ বার বার। [১]
মনুষ্য দুর্লভ জন্ম না হইব আর ॥

॥ ৫৮ ॥

[রাগ মালসী]

সই বোলম মুই জীব না রে
কানু আনিয়া দে।
কালার ভাবে চিত্ত ব্যাকুল
আকুল করিছে ॥ ধু
চিড়া নহে কলা নহে দধি মাখি খাইতুম।
ঝলক দাপন নহে নয়ান ভরি চাইতুম ॥
কাম সিন্দূর নহে তুলিয়া দিতুম শীষে।

---

১ অন্য পুথিতে :
আমি ভাবি বন্ধু বন্ধু ভাবে ভিন
বন্ধুরে কি দোষ দিমু আপনা কুদিন
দ্বিজ রঘুনাথে কহে পার হইবার
আর নি মনুষ্য কুলে জনম আমার।

বন্ধুর ভাবে চিত্ত ব্যাকুল অঙ্গ ছাইছে বিষে।
চান্দ বাঁকা কানু বাঁকা ঐ কদম তটে।
চম্পার কলিকার ফুল প্রতি ঘটে ঘটে ॥
কহে সৈয়দ সুলতান শুন গুণিগণ।[১]
ধড়ের ভিতর মুদ্রা করিছে রোসন।

॥ ৫৯ ॥

[ধানশী]

সজনি সই কানু সে প্রাণ ধন মোর। ধু
যে বলে বলুক মোরে
যে করে করিবে নিঙ্গপতি
সকলি ছাড়িয়া মুই কানুর শরণ লই
ধিক্ মোর এই ঘরে বসতি।
তোমরা যতেক সখী ঘরে যাও কুল রাখি
কানুর ভাবে হৈয়াছি বিভোর
শুনিতে বাঁশীর সান দ্রবীভূত হয় পাষাণ
রমণীর প্রাণ কত দড় !
চিত উতরোল দেখি চৌদিকে পলকে আঁখি
সকলি দেখি যে শ্যামরায়
মনে হেন সাধ করে নিত্য দেখি বন্ধুয়ারে
ভজিতে না পারি রাঙ্গা পায়।
মীর্জা ফয়জুল্লাহ বাণী শুন রাধা ঠাকুরাণী
মনে ভাব মন্দিরে বসিয়া
জীবন জোয়ারের পানি তরল তরঙ্গ জানি
ঐ রাঙ্গা চরণ ভজ গিয়া ॥

॥ ৬০ ॥

[রামক্রিয়া]

চল দেখি গিয়া রূপ বন্ধু চল দেখি গিয়া
কিরূপে ধরাইমু হিয়া শ্যামে না দেখিয়া। ধু
মালতীর মালা গলে শোভিয়াছে ভালা।
মুখানি পূর্ণিমা শশী বরণ চিকণ কালা ॥
সাক্ষী হৈও সাক্ষী হৈও এ পাড়া পড়ি।
শাশুড়ী ননদী বাদে হৈলু˚ দেশান্তরী।
কদম্বের ডালে বসি বাজাএ মুরলী।
আবরিছে কদম্বের পত্র সারি সারি।
মীর ফয়জল্লাহ কহে মনেত ভাবিয়া
দেখ সখি শ্যাম রূপ জলে ছলে[২] গিয়া।

॥ ৬১ ॥

[তুড়ি গুঞ্জরী]

রাই রাই কর অবধান।
তুয়া ভাবে আকুল রসময় কান। ধু
কালিন্দীর তীরে বসি নিরক্ষিএ তোমা
রসের আবেশ হৈয়া সদায় আছে কামা ॥
তোমা না দেখিয়া শ্যামে
হাতের বাঁশি ফেলে।
ভূমিতে পড়িয়া বাঁশি 'রাধা রাধা' বোলে ॥
খেনে হাসি খেনে বাঁশি খেনে গড়ি যায়।
অধরে মুরলী থুইয়া তুয়া গুণ গায় ॥
মীর ফয়জুল্লাহ কহে রসবতী রাই।
রসের পসার লৈয়া ভেট গে কানাই ॥

---

১ সৈয়দ মর্তুজা কহে ঘটের কামনা
মথুরাপুরেতে গেলে পাইবা সেই জনা।

২ কদম্ব তলে

॥ ৬২ ॥

[তুড়ি]

ননদিনী ওরে রস বিনোদিনী
আমি কুবোল সহিতে নারি
হাম কুলবতী কলঙ্কের ভাতি
কতেক সহিতে পারি। ধু
'ঘরের ঘরণী জগত মোহিনী
প্রত্যুষে জলেরে গেলি
বেলা অবশেষ নিশি পরবেশ
কিসেরে বিলম্ব কৈলি।'
'প্রত্যুষে যমুনা গিয়া কমল দেখিয়া
পুষ্প তুলিবারে গেলুঁ।
বেলা উদয়নে মুখ্য দরশনে
ভোমরা দংশনে মৈলুঁ।
করের কঙ্কণ করিতে মার্জন
কর হস্তে খসি গেল।
ডুব দিতে দিতে কঙ্কণ চাহিঁতে
বেলা অবশেষ ভেল।
আগর চন্দন কস্তুরী কুঙ্কুম
সব ভাসাইলুঁ জলে।
হের দেখ মোর অঙ্গ জরজর
দারুণি পদ্মের নালে।
এ রূপ নিছনি কুলের কামিনী
রূপের নাহিক সীমা।
আরতি মাগনে আলাওল ভণে
যদি প্রভু না হয় বামা।[১]

॥ ৬৩ ॥

[গুঞ্জরী ভাটিয়াল]

কি দেখিলাম যমুনার ঘাটে
লো নাগর কানাই রে
শ্যাম, কি দেখিলাম যমুনার ঘাটে। ধু
দক্ষিণে নাচএ ভুরু সঘনে কম্পএ উরু
পাপিনী সাপিনী হৈল বাম।
তা ভাবে পড়িল বাধা মুই কলঙ্কিনী রাধা
না জানি কি হয় পরিণাম।
মুই যদি জানিতুম বাটে
কানাইয়া যমুনার ঘাটে
তবে কেনে ভরিতে আইলুম জল।
কৈয়াছিল গুরুজনে সে কথা না ছিল মনে
পাইলাম তার প্রতিফল।
জঙ্গম মেঘের আড়ে যুগল খঞ্জন নাচে
তা দেখিয়া পড়ি গেলুঁ ভোলে।
হেন কভু না দেখিছি লোক মুখে না শুনিছি
হেন পক্ষী আছএ গোকুলে।
বংশীবটের তলে ছায়া কিছু নাহি বলে
তাত বসিতে না লয় মন।
অরুণ কিরণ তাপে মুখানি শুকাই যাবে
ক্ষুধাএ আঁখি অরুণ বরণ।
কহে হীন আলাওলে
কেনে আইলুম তরুতলে
নয়ানে নয়ানে হইল দেখা।
একধারা পন্থখানি দুই ধারা হইতে নারি
শ্যাম গায়ে লাগিয়াছে ধাক্কা।

---

১ জগৎ মোহিনী রামা।

॥ ৬৪ ॥

[দীপক]

রূপের নিছনি যাই।
রসিয়া নাগর বন্ধু কি দিলে জুটাই। ধু
যবে ধরি দেখিয়াছি নাগর সুন্দর
মনসিজে তনু প্রাণ কৈল জরজর।
তরুয়া কদম্ব তলে মোহন ভঙ্গিমা
নানা রবে পূরে বাঁশী দিতে নাহি সীমা।
কহে সৈয়দ আইনুদ্দিন পূরিব আরতি
শাহ আকবরের[১] পদে করএ ভকতি।[২]

॥ ৬৫ ॥

[দীপক]

আল রে মুই রূপের নিছনি মরি যাই।
ঐ রূপ-রসিয়ার সঙ্গে কে দিব মিলাই। ধু
যবে ধরি দেখিয়াছি নাগর সুন্দর
অবিরত তনু ক্ষীণ হিয়া জরজর।
তরুয়া কদম্ব তলে ঐ রূপ রঙ্গিমা
নানা রস বাঁশীর সানে দিতে নারি সীমা।
কহে সৈয়দ নাসিরুদ্দিনে পূরিব আরতি
শাহা আবদুল্লাহ পদে করিয়া ভকতি।

॥ ৬৬ ॥

[গান্ধার]

আল রে পরাণের পোতলি
দিঠের দিঠলি বন্ধু তুমি ললাটের ফোঁটা।
দৈবে সে তোমার লাগি হইয়াছি বৈরাগী
তাতে কিবা লাজ খোঁটা।
পিরীতি অবশেষ না রৈমু এ দেশ
আনল দিয়া যাইমু ঘরে।
নিতি রাধার মন করে উচাটন
'বাহির হম' প্রাণি করে
করেত কঙ্কন নয়ানে অঞ্জন
পিন্ধনে পাটের শাড়ী
করেত মন্দির চরণে নেপুর
কেন ফির বাড়ি বাড়ি
অন্তরে আগুনি বাহিরে আগুনি
আগুনি এ দশ দিশে
নাসিরুদ্দিনএ মিনতি ভণএ [৩]
দয়া না ছাড়িও শেষে।

॥ ৬৭ ॥

[পরছ কামোদ]

বন্ধুয়া মোর পরাণের পরাণ
বিরলে পাইলে রূপ-যৌবন দিমু দান। ধু।
দেখিছি অবধি রূপ মন ভেল ভোলা
প্রেম গুণ গুনি গুনি হিয়া করে কালা।
গোকুলে কলঙ্ক বড় লোক উপহাস
গোপত-বন্ধুর লাগি জাতিকুল নাশ।
আইনুদ্দিনে বোলে সখি মরম বেদনা
কালা বিনে নিবারিতে নাহি আন জনা।

---

১ আফজলের

২ সৈয়দ নাসিরউদ্দিনের ভণিতাযুক্ত পদটি ও এটি মূলত অভিন্ন। মূল রচয়িতা কে বলা দুঃসাধ্য।

৩ পাঠান্তর: নাসির তনয় মিনতি ভণয়।

॥ ৬৮ ॥

[রাগ—পুরবী]

আগ রাই কি করিমু রে
কালা লাগিল মোর মনে। ধু
কালিয়া কালিয়া করি ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরি
কালা হইল প্রাণের বৈরী।
আঁখির পোতলি করি বন্ধুরে রাখিতে নারি
অঝরনে ঝরে দুইটি আঁখি।
কহে আইনুদ্দিনে রাই চলরে ধেনুরে যাই
রাম আর নন্দের নন্দন পাই।

॥ ৬৯ ॥

[ধানসী—ভাটিয়াল]

আগো রাই
কি দেখিয়া কি শুনিয়া
তোরা মোরে দোষ গো।
মুইতো না জানোঁ কিছু ননদিনী পিছু পিছু
আজু কার বোলে
কুবোল বুলি রোষ গো। ধু
সব সখী এক হৈয়া মিছা কথা কৈয়া কৈয়া
ব্রজকুলে তোলে মিছা রোল গো।
কার ভাবে মনে লাজ দিয়াছে সবার মাঝ
আজু নাগর দিয়াছে করি কোল গো।
হীন আম্মাণে ভণে এ বচনে রোষ কেনে
অঙ্গ তোমার অপরূপ ছিল।
তরু বাঁশী কদম্বের ফুল ত্রিবেণী যমুনার কুল
আজু প্রতি অঙ্গে দাগ ভিন্ন ভিন।

॥ ৭০ ॥

[নট গান্ধার]

ওকি হালি ঢলি পড়ে রাধে কালিন্দীর তীরে
না জানি কি হইল আজু মরম অন্তরে। ধু
সুন্দর ললিত অঙ্গ পরশিছে সাপে
জরজর হৈল তনু থর থর কাঁপে।
কনক কমল মুখ ঝাঁপিল চিকুরে।
ক্ষীণ কটি-লতা যেন বায় হালি পড়ে।
গগনের শশী যেন ভূমিতলে গড়ে
হাত ধরি শ্যামে আসি তুলি লয় কোড়ে।
মনোহরে কহে এহি ডংশিছে মদনে
করিছে সন্ধান রাধে কেলির কারণে।

॥ ৭১ ॥

[রাগ—মালসী ভৈরব]

রৈয়া রৈয়া উঠে মনে ওহি বিনোদিয়া
দেখিয়াছি অবধি রূপ না পাসরে হিয়া। ধু
কদম্বের তলে থাকি নিতি আঁখি ঠারে
কুলের কামিনী দেখি রৈতে নারি ঘরে।
কিয়ে মোর হাস-লাস গৃহবাস অকারণ
ঐ রূপ-কালার ভাবে লাগি আছে মন ॥
সুন্দর কান্ত রসিয়া নাগর
অবিলম্বে ভজ ধনি ভণে মনোহর ॥

॥ ৭২ ॥

[রাগ আহির পরছ]

আজু সই কি দেখিলুঁ স্বপনে
বিদিত বিমল হরি মিলিল আপনে। ধু
শারদ সময় যেন যামিনী উঝল
ঝলকিত ভেল আভা চমক-চপল।

নয়ানে লাগিল রূপ আসি আচম্বিত
জাগিতে হারাইলু˘ হরি শোকে দহে চিত।
কি দেখিল˘ কি হইল পলক অন্তর।
ভজ গুরু পাইবে পুনি কহে মনোহর ॥

॥ ৭৩ ॥

[রাম ক্রিয়া]

ওগো সখি, মুই কেন আইলাম জলে
দেখিলু˘ বন্ধুর রূপ ঐ কদম তলে। ধু
ফুলের মালা গলেরে চম্পার মালা দোলে
পুষ্পহার গলে দিয়া নাচে কদম তলে।
সখীর সঙ্গে আইলাম জলে
জল ভরি গেল তারা
শ্যাম রূপ নিরখিতে আমার
কলসী না গেল ভরা।
যমুনার জলেরে যাইতে ননদী দিল বাধা
ভাঙ্গিল কাঁখের কলসী হাতে রৈল কাঁধা।
মুরলী বাজায় শ্যামে কদম তলে বসি
শুনিতে রাধার তনু পড়ে খসি খসি।
মুরলী বাজায় শ্যামে কদম্বের স্থানে,
চলিছে বিনোদী রাধা কানু দরশনে
মুরলী বাজায় শ্যামে কদম্ব তলে রৈয়া,
কদম্বের পত্র সারি বন্ধুর পদের ছায়া।
কদম্বের তলে থাকি করে পুরবীর সান
শীতল বাঁশীর স্বরে না রহে পরাণ।
ফাজিল নাসিরে ভণে শুন ব্রজনারি
মুরলীর স্বরে রাধার প্রাণি নিল হরি।

॥ ৭৪ ॥

[আশোয়ারী]

হামো নারী অতি হরি-প্রেমের দাস
তোমার পিরীতি হরি হইল রাধার বৈরী
জাতি ধর্ম করিল বিনাশ। ধু
তোমার পিরীতি বাদে কলঙ্কিণী হৈল রাধে
তথাপি তোমার মনে রিষ
পন্থ নিরখি থাকি কায়-প্রাণে ভজি ডাকি
কান্দিয়া গোঙাই অহঃনিশ।
প্রেম মূলে দাসী করি কি হেতু না চাহ ফিরি
নিশি দিশি অই মোর দুখ
রাধার পরাণ তনু মীন-প্রায় জল বিনু
না দেখি হরির চন্দ্রমুখ।
হীন আলি রজা বোলে হরি রাধা পদতলে
শুন ঠাকুরাণী রাধা সার।
যে রামা হরিরে ভজে কদাচিত নাহি তেজে
হরি নিত্য বিদিতে তাহার।

॥ ৭৫ ॥

[সুহি সিন্ধুরা]

সই সই কহিতে খাঁথার পিয়ার বেভার
শুন প্রাণ সইরে। ধু
সই সই কি মোর রান্ধন কি মোর বাড়ন
কি মোর হলদি বাটা।
মনের আগুনে বনেত যাইমু
রাখিমু সোয়ামীর খোঁটা ॥
সই সই গাছে ধরে ফল নারাঙ্গি কমল
বাদুরে চুিয়য়া খায়।

আমার সোয়ামী হালিয়া গোঁয়ার
স্তুতিলে সে নিদ্রা যায় ॥
সই সই যাহার সোয়ামী রসিয়া নাগর
সে নারীর কিসের দুখ।
দিনের পাপ খানি দিনেতে খণ্ডাইব
দেখিয়া সে চান্দমুখ ॥
সই সই বাপ না মায়েরে কি দোষ দিমুরে
কুল চাহি দিল বিহা।
হাতে হাত ধরি গলায় বান্ধি দড়ি
সাগরে ডুবাইল নিয়া ॥
সই সই কি মোর নিশি কি মোর দিশি
কি মোর এ রবি শশী।
ঘরের সোয়ামী হাসিয়া না বোলায়
মুঞি অপরাধী দোষী ॥
সই সই না জানি কি দোষে
প্রিয় মোরে রোষে
নিদয়া হৃদয় পিউ।
কহে সিরতাজে সোয়ামী উদ্দেশে
সহজে তেজিমু জিউ ॥

॥ ৭৬ ॥

[রাগ ভৈরব]

কেন রে যমুনা আইলুম জল ভরিবার
অপরূপ রূপ দেখি হইলুম ধন্ধকার। ধু
ডংশিল অনঙ্গ নাগে হানি কামবাণ
কিবা রূপ দেখাইয়া হরিলা পরাণ
সে অবধি প্রাণ মোর নাহি রহে ধড়ে
ঘর মু' আইতে নারি 'উড়ম্ উড়ম্' করে।
পুনি যদি সেই রূপ দেখি আর বার।
জীবন যৌবন দিমু নিছনি তাহার ॥
কহে নাসির মোহাম্মদ স্থির কর মন।
ভাব প্রভু গোপতে পাইবা দরশন ॥

॥ ৭৭ ॥

[রাম ক্রিয়া]

রাখিমু তোরে হিয়ার মাঝারে।
পরাণ-যতন করি রাখিমু তোমারে ॥ ধু
যমুনাতে আনাগোনা কদম তলে থানা।
মুই নারীর বাড়িতে আইতে তোরে
কে করিবে মানা ॥
যে খনে পীরিতি কৈলা মিঠা মিঠা বাণী।
গলে প্রেম-ফাঁসি দিয়া নিতে চাহ প্রাণি ॥
কহে হীন চম্পা গাজী শুন প্রাণেশ্বরী।
এবে তোমার প্রেমে নাম জপে হরি ॥

॥ ৭৮ ॥

[ধানসী]

রাধার ভাবে কানুর মন
'বাহির হম্ বাহির হম্' করে
যে খনে রাধিকার সনে
দেখা হইল বৃন্দাবনে।
সে অবধি প্রাণি না রয় ধড়ে। ধু ॥
রাধিকার আনন হেন মেনকা সমান যেন
নাসা খগ জিনি সম কীর।
হেম বেসর দোলে কাঁচুলি হৃদেত লোলে
দেখি কানুর প্রাণি না রয় থির।

দেখি রাধার দুইটি স্তন
বন্দী হইল কানুর মন
সাধ করে ধরিতে পাণি রে।
তবে কানু গাহি গীত
উদাস কৈল রাধার চিত
তবে রাধা আসে ধীরে ধীরে ॥
যে ক্ষণে রাধিকা কানু হইবেক এক তনু
তখনে তন টুটিব তাপ।
হীনাতি চামারু কহে এমন উচিত নহে
রাধা কানু নহে ভিন্ন ভাব ॥

॥ ৭৯ ॥

[পটমঞ্জরী]

কেনে রাধার বন্ধু ডাক মোর নাম ধরি। ধু
ঘর থু বাহির হৈতে সই চাল ঠেকিল মাথে
বৈরী হৈল দুরন্ত ননদিনী।
এ রূপ সুরত লইয়া দূরদেশে গেল বঁধুয়া
নারী হৈল পরের অধিনী।
এই স্বামী মরি যাউক
দেওরেরে বাঘে খাউক
তুমি আমি চল যাই দূরে।
স্বামী মরিয়া গেলে কেমতে রহিব ঘরে
কাল বুদ্ধি দিল কোন্ ছারে।
শাশুড়ী হীরার ধার ননদী দুর্জন আর
এই না বাঘের ঘরে আমার বসতি
হীন গয়াসের বাণী শুন রাধা বিরহিণী
ভাবিলে পাইবা নিজ পতি।

॥ ৮০ ॥

[রাগ কেদার]

শ্রীমুখ দহে বিরহ আগুনি। ধু
যবে করে রোষ তবে হইব দোষ
তে কারণে বসিছিল
আলো রাই ননদিনী পিছে লাগিয়াছে শনি
সেই কহিয়া দিল।
মোহাম্মদ হাসিমে কহে গুরুজনের ভয়ে
মুখে না আইসয় বাণী
কহিলে এক কথা মনে লাগে ব্যথা
অকীর্তি হইবে জানি।

॥ ৮১ ॥

[বড়ারি]

মুররী আনয়া দেয় রাই মোরে
মুররী আনিয়া দেয় মোরে। ধু
ঠিক দুপুরিয়া বেলা, কদম তলে নিদ্রা গেলা
বাঁশী রাখিয়া বাম করে।
নিদ্রার আলসে পাই ঘুমেতে চৈতন্য নাই
মুররী লইয়া গেল চোরে।
হাত নাড়া নাড়ি বাহু ঝাড়া ঝাড়ি
একেলা পাইয়াছ মোরে।
তোমার মুররী আমি যদি নিয়া থাকি
সেই সাক্ষি বোলাইবা কারে।
আবাল ভাগিনা না চাওরে আঙ্গিনা
কান্দ লুটাইয়া ধূলে
আবাল ভাগিনা দেখি কোলে লইলুম সখি
সেহ মোরে কু বোল বোলে।

রাধিকা কানাইয়া জল পরীক্ষিতে
কানাইয়া নামিল আগে।
আবাল ফকিরে কহে এই বাক্য মন্দ নহে
রাধিকার বড় দয়া লাগে।

॥ ৮২ ॥

[ভূপালী]

আগ সই কানুর লাগি প্রাণ মোর কান্দে
কু খেনে ঠেকিয়া রইলুঁ পীরিতির ফান্দে। ধু
এক সখী উঠি বোলে ঘরে চল যাই।
আর এক সখী বোলে চল রঙ্গ চাই॥
আর এক সখী বোলে ঘরে না লয় চিত।
আর এক সখী বোলে শুনি বাঁশির গীত॥
সব সখী মিলিয়া যমুনার জলে যায়।
কাঁখের কলসী থুইয়া সবে রঙ্গ চায়॥
নব বালকে কহে শুন ধনি রাএ
জাতিকুল ত্যাগিয়া ভজ রাঙ্গা পাএ॥

॥ ৮৩ ॥

[রাগ পূরবী]

আগ সই কি করি কোথায় যাইমু
কালা লাগিল মোর মনে। ধু।
কালিয়া কালিয়া করি ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরি
কালা হৈল প্রাণ-বৈরী
আঁখির পোতলি করি
বন্ধুরে রাখিতে নারি
অঝরণে ঝরে দুই আঁখির পানি।

॥ ৮৪ ॥

[রাগ কোড়া]

কার ঘরের রসবতী জলে নামিয়াছ
চল রসবতী পাটের শাড়ি পর।
তুমিত সুন্দরি রাধে কলসী কেনে ভর
জল ভর সুবদনী হেট মাথা হইয়া।
কে তোরে পাঠাইল জলে
কঠিন তাহার হিয়া।
সে কেমন রসিক কালা বসি থাকে ঘরে
প্রভাত সময় তোরে পাঠাইয়াছে জলে।
জল ভর সুবদনী মাগি লহ বর।
বাণিজের কাজ নাহি স্বামী আসুক ঘর॥

॥ ৮৫ ॥

[কামকেলি]

নিত্য নিত্য যাচ রে ভোমরা
চাঁপা ফুলের মোহন মালা
সাপলাএ উঠি বোলে আমি জলস্থলে ভাসি
রাত্রি নিশি হইলে আমি
চান্দের সনে হাসি।
নাগেশ্বরে বোলে আমার সর্ব অঙ্গে রেণু
আমার বৃত্তান্ত জানে নন্দের ঘরের কানু
কেতকীএ উঠি বলে আমার সর্ব অঙ্গে কাঁটা
আমার বৃত্তান্ত জানে নন্দের ঘরের বেটা।

॥ ৮৬ ॥

[গাত বিবসা রাগিনী]

শ্যাম বন্ধু মোর আয় রে আয়
পাহাতে[১] চড়ালুম ক্ষীর

---

১ উনুনে

প্রাণি মোর না রয় স্থির।
বিভোলেতে ননীতে দিলুম পানি।
যখনে পিরীতি কৈলা
দিবারাত্রি আইলা-গেলা
কার ভোলে বন্ধু ভাঙ্গিলা পিরীতি।
ভাবেতে মজিল মন
কিবা হাড়ি কিবা ডোম
যাউক জাতি রহি যাউক পীরিতি।

॥ ৮৭ ॥

[রাগ সিন্ধুরা]

সজনি বোল এমন হৈল বা কেনে
সেই হোন্তে মোর অন্তরে অন্তরে বেয়াধি
শ্যাম রূপ ভাবিতে মনে। ধু
গোকুল নগরে শ্যাম বন্ধুর রূপ
কেবা নাহি দেখে রৈয়া।
হায় অভাগিনী জনম তাপিনী
তখন না মৈলু ঁ কেনে হৈয়া।

॥ ৮৮ ॥

[মাধবী]

সোনা বন্ধুরে ওরে আমার প্রাণের ধন।
এদেশে আমার বসতি হবে না। ধু
বন্ধু যাইবা দূর দেশে খাইবা নুনা পানি
কোমরের কাটারি বন্ধু থুই যাও নিশানি।
বন্ধু যাইবা দূর দেশে মনে লাগে ধান্ধা
কোমরের পেটিকা বন্ধু থুইয়া যাও বান্ধা।

॥ ৮৯ ॥

[পুরবী]

সজনি সই বন্ধুয়া বোলিমু কোন্ লাজে। ধু
বন্ধুয়া বন্ধুয়ারে কালিয়া তোর নাম।
প্রত্যুষে বেহানে কর পরের ঘরের কাম।
পরের ঘরের কাম কর বাথানে রাখ ধেনু
ষোলশ গোপিণী মাঝে এক রাধা কানু।
বন্ধুয়া বন্ধুয়া করি বসাইলু ঁ ঘরে
আঁখি ঠারাঠারি বন্ধু ননদিনী করে।
জিয়া থাক ননদিনী খাও দুটি আঁখি
কানুর চরণে আমি মজিয়া থাকি।
সোনার যে নাও বন্ধু রূপার যে নাও
সোনার গুঁড়া হে বন্ধু না দিও যে পাও।
নাও খানি উড়ে পাটাতন খানি ভাসে
রাধিকারে কোলে করি কানু জলে ভাসে।[১]

॥ ৯০ ॥

[কানাড়ী]

শ্যাম বন্ধুরে হৃদে থাকি দেখা না দেও মোরে।
বন্ধুয়ার কপট মায়া বুঝিতে না পারি
দেখা দিয়া রাখ প্রাণ না দেখিলে মরি।
বন্ধু যাইবা দূর দেশে আমি ভাল জানি
কোমরের কাটারি দিয়া তেজিমু পরাণি।
বন্ধু যাইবা দূরদেশে মনে লাগে ধান্দা
বন্ধুর হাতে মোহন বাঁশী থুইয়া যাউক বান্ধা।
বন্ধুর হাতে মোহন বাঁশী থাইমু না বিলাইমু
হৃদের 'পরে থুইয়া বাঁশী রজনী গোঁয়াইমু।

---

[১] মনোহরেরও অনুরূপ একটি পদ আছে। বংশী খণ্ডে দ্রষ্টব্য।

॥ ৯১ ॥

[কল্লাট]

কেনে পরিহার প্রভু আপনার দাসী
সম্ভাষা করিতে আইলাম মনে ভয় বাসি। ধু
শাশুড়ী ননদী মোর আর পরিজন
আপনে মোহিত হইল তা সবার মন।
যে সকল বাদী ছিল সেহ হইল ভাল
এবে সে জিনিলাম মোর ঘরের জঞ্জাল।
এ রূপ-যৌবন মোর তোমার নিছন
রাধার সম্বাদ কয় দীন বোলন।[১]

॥ ৯২ ॥

[কোড়া]

কে রে কে রে তরুয়া কদম্বতলে কে রে।
কদম্ব তলে কে রে রসের বিনোদিনী। ধু
কালা দাগুাই আছে বিধির ঘটন
ললাটের লেখা মাত্র না যায় খণ্ডন।
মিটন না যায় জান ললাটের লেখা
যার তরে পলাইয়াছি তার সনে দেখা।
চূড়ার উপরে মালা তাতে কত মধু থাকে
মধু লোভে ভোমরায় ফিরে লাখে লাখে।

॥ ৯৩ ॥

[গান্ধার]

সোনা বন্ধুর লাগিয়া সদায় পোড়ে হিয়া
মুই নারীর মরমে জানে। ধু
দৈবে তোমার লাগি হৈয়াছম বৈরাগী
তাতে কি লোকের ডর।
পিরীতি অবশেষ না থাকিমু এই দেশ
আগুনি দিয়া যাইমু ঘর।
আম না গাছেতে কোকিলা কুহরে
ডালিম্ব গাছেতে শুয়া।
এদেশের পাড়াপড়ি সকল প্রাণের বৈরী
কার দি পাঠাইমু পান গুয়া।
হাকিমে জানিল জগতে শুনিল
লোকের মুখেতে হৈল হাসি
মুই নারীর যৌবনখানি যাচিয়া না দিলুম রে
অনামূলে হৈলাম তোমার দাসী।

॥ ৯৪ ॥

[রাগ কেদার]

রাধা কানু নিকুঞ্জ মন্দির মাঝেরে
ভাগ্যবতী রাধিকা কানু লাগি সাজেরে। ধু
যখনে শিশুমতি না ছিল সুরতি
তখনেহ প্রিয় পরবশে।
এবে হৈল যৌবন প্রিয়ের লাগি পোড়ে মন
প্রিয়কে দেখিতে হাবিলাষে।
রাজার দুয়ারে গজমোতি হস্তী চড়ে
আসি মোরে নিল প্রিয়ে।
স্বামীর কোলেতে বসি
সুস্বপন দেখিলাম আসি
না জানি প্রাণের বন্ধু কোন্ মতে জিয়ে।
উঞ্চল পর্বতে মলয়া ছাড়িতে
বহয়ে বসন্তের বাও।
চম্পা নাগেশ্বরে পালঙ্ক শিয়রে
কোকিলে কাড়ে ঘন রও।

১ দীন ভবানন্দেরও এইরূপ একটি পদ আছে।

॥ ৯৫ ॥

সখিগণে লয়ে সঙ্গে   রাধিকা চলিলা রঙ্গে
যায় রাধা যমুনার ঘাটে।
কদম্বের তলে বসি   কানাই বাজায় বাঁশী
ধবলী শাঙলি চরে মাঠে।
কানাই বসিয়া বাটে   রূপ দেখি প্রাণ ফাটে
আজ মোর কি হয় না জানি।
চল সখি ঘরে যাই   কদম্ব তলে কানাই
প্রাণ ফাটে তার বাঁশী শুনি।
অধীন রজার বাণী   শুন রাধা শুবদনী
বন্ধুয়া না দিব তোমা ছাড়ি।
চতুরালি দূরে যাবে   পশরা ভাঙ্গিয়া খাবে
বলে ছলে লৈব ঘট কাড়ি।
দেখিয়া মথুরা পতি   স্থির নহে তোর মতি
এই বাটে কেন আইলি পুনি।
তুই যে অবলা নারী কানাই প্রাণের বৈরী
এই ভাবে হারাবি পরাণি।

॥ ৯৬ ॥

প্রাণে ধৈরজ না মানে
প্রাণ সদায় ঐ বন্ধুয়ার সনে। ধু
সে বড় চিকণ কালা
গলে বনফুলের মালা
দিয়াছে প্রেম জ্বালা।
প্রেমবাণ হানিছে প্রাণে
সদায় প্রাণ কালার সনে।
মধুর মধুর হাসি
কদম ডালেত বসি
সদায় বাজায় বাঁশি।......
(অসমাপ্ত—কমর আলি)

॥ ৯৭ ॥

চাহিলে না প্রাণ কেন আমার দহিছে জীবন
আঁখি দুইটি ফেরে কোথা জীবন মরণ।
তোমার এইরূপ হইবে
আঁখি না চায় মোরে ফিরে
না পারি ত্যাগিয়া তোমায় করিতে গমন।
কাতর হৈয়া ঝুরি আমি চাহিয়া না দেখ তুমি
রূপমগ্ন হৈয়া তোমার হারাইছি জ্ঞান।
পুন কি আর এমন দেখা
অদৃষ্টে আমার আছে লেখা।
কিবা দেখাব রে প্রাণ
রূপের সাগর তুমি দেখি মোহ গেছি আমি।
(এবাদত রচিত)

॥ ৯৮ ॥

ও গো সই, কে বলে কালিয়া সোনা
অন্তরে বাহিরে কালা কালা নহে
রস বিনোদিয়া।
মোহর নসিবে লেখা নয়ানে নয়ানে দেখা
নয়ান ভাবে জর জর হিয়া।
সৈয়দ মর্তুজা কয় পর কি আপনা হয়
মন বাঁধা পিরীতির লাগিয়া।

॥ ৯৯ ॥

কেনে আইলুম যমুনার জলে। ধু
যাইতে যমুনার জলে,
কি দেখিলুম কদম তলে
সে অবধি ঘরে না লয় মোর প্রাণি।

হানিয়াছে কালা-বাণে জাগিয়াছে মোর মনে
আমারে বধিব হেন জানি।
বিষ লাগে গৃহকাজ আর কিবা কুলের লাজ
ঘর বাড়ি তেজিমু সকল।
ননদীর নাহি ডর কি মোর আপন পর
কালা-রূপে করিলা বিভোল।
সব সখী আইল সঙ্গে তারা গেল রঙ্গে ঢঙ্গে
মুই কেনে ঠেকিলুম কালার ফান্দে।
মির্জা কাঙ্গালীর বাণী শুন রাধা ঠাকুরাণী
মরমে হানিছে কালাচান্দে।

॥ ১০০ ॥

ওহে প্রাণনাথ মোরে নিদয়া হৈও না।
আনলের কুণ্ডেত ভ্রমিয়া ঝাম্প দিতুম।
বধিতে সঙ্কট প্রাণ একা তুমি যাবে কেমন।
তুমিত মরিবে সেথা আমি ও বাঁচিব না।
কষ্টয় ফেলিয়ে মোরে যাবে কেনে প্রাণ-ধরে।
না হেরিয়া তব রূপ প্রাণ মোর জীব না।
হানিছ তাপের জার হৃদয়ের মাঝে মোর
এ দায় ঠেকিছে যার সেই এ জন নয়।
নিবারণ কর চিতে থাক বন্ধু হরষিতে।
প্রদীপ বিনে পতঙ্গের প্রাণ ধৈর্য ধরে না।
এরাদত কহে লাখওয়া সুজনে সুজনে
দেখা হইল কলাবতী তাঁহা তুমি জান না।

॥ ১০১ ॥

[রাগ-ললিত]

পহুঁ মাধব পরিহর কৈতব বাদে
বনচর নিচয় সুনাদে। ধু।
হাম নারী কুলবতী প্রেম আরতি মতি
লুবধ হে তুয়া গুণ নামে।
গুরুজন ভয়ে ভীত চিত কিয়ে আকুলিত
নিশি ভেল অবশেষ যামে।
রভসে কমল দলে মধু লাগি মধুকরে
চললিহ নিজ কুল পাঁতি।
হরিষে চকোরগণ ঘিরি তম-নাশন
বিরহ মুকুত দুখ আতি।
নাগর যদুমণি নিবেদহোঁ পুনি পুনি
বারিদ পদ ধরি মাথে।
হামো বড় অভাগিনী কুলটা দুখিনী
মার্গ ধরি দেও হাতে।

॥ ১০২ ॥

[তুড়ি-রাগ]

হাসিয়া বোলান দিতে অরে সোনার বন্ধু
তাহে কত ধন লাগে।
না যায় কঠিন প্রাণি আমার
দাণ্ডাইছি তোমারে আগে। ধু।
অন্তরে কালা বাহিরে কালা
মালতী পাইয়াছি সাক্ষি।
মুখানি তুলিয়া কেনে বা না চাহ
নিলাজ তোমার দুটি আঁখি।
কদম্বের তলে রূপে ঝলমলে
তা দেখি আকুল চিত।
সুজন বলিয়া শরণ লইনু
শুনিয়া বাঁশীর গীত।

॥ ১০৩ ॥

[নট গান্ধার]

আমার কাঁচা সোনারে
যাইতে বোলাইঁ দিয়া যাওরে। ধু।
আকাশে উদয় তারা সুরুজ সে ভালা
আবরিছে গগনের চান্দা।
কাঁচা সোনা গোরা গাও না সহে ফুলের বাও
কাঁচা তনু রোদে পুড়ি হই যাইবে মন্দা।

॥ ১০৪ ॥

[রাগ পঞ্চম]

আল সজনি তরু অবলম্বনে কে। ধু।
শ্যামরূপ দেখিয়া প্রাণি বিদারল
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা শেল হানিছে
মজাইতে কুলে ভণে আলাওলে
মরমে সাধ হৈছে ॥

॥ বংশী ॥

॥ ১০৫ ॥

বাঁশী বাজান জান না।
অসময়ে বাজাও বাঁশী পরাণ মানে না।
যখন আমি বৈসা থাকি গুরুজনের কাছে
তুমি নাম ধৈরা বাজাও বাঁশী
আমি মরি লাজে।
ওপার হইতে বাজাও বাঁশী
এপার হইতে শুনি
অভাগিয়া নারী হাম হে
সাঁতার নাহি জানি।
যে জড়ের বাঁশের বাঁশী
সে জড়ের লাগি পাও
জড়ে মূলে উপাড়িয়া যমুনায় ভাসাও।
চাঁদ কাজী বলে বাঁশী শুনে ঝুরে মরি
জীমুনা জীমুনা আমি না দেখিলে হরি।

॥ ১০৬ ॥

[বসন্ত-পঞ্চম]

নাগর যায় রে রাধার মন্দিরে
নাগর যায় রে। ধু
'পিয়া রাধা' বুলিয়া
বিনাইয়া বাঁশি বাহে রে। ধু
বাঁধিছে মোহন চূড়া তাতে নবগুঞ্জা সাজে
রাঙ্গা চরণে সোনার নেপুর
না চলিতে বাজে।
সৈয়দ মর্তুজা কহে শুন লো রমণি
কিসকে রৈয়াছ ঘরে শুনি বাঁশির ধ্বনি ॥

॥ ১০৭ ॥

[ধানসি পরহ]

জানি জানি আগ রাই
কালা যাইবে আমারে সমঝাই। ধু
কালা যাইব না'এ না'এ
আমি যাইমু তীরে।
কালার আমার হৈব দেখা
ওহি কদম তলে।
ও কূলে কালার বাড়ী মাঝে ক্ষীর নদী
উড়ি যাইতুম সাধ করে পক্ষ না দে বিধি
ও কূলে বাজায় বাঁশি ঘরে বসি শুনি।
কিরূপে হইমু পার কোলে যাদু মণি।

সৈয়দ মর্ত্তুজা কহে শুন বনমালি।
পালিয়া পুষিয়া যৌবন কারে দিমু ডালি।

॥ ১০৮ ॥

[পঞ্চম সিন্ধুরা]

বন্ধু মোরে ছুঁইওনা ছুঁইওনা রে
নন্দের ঘরের কালা কানু রে মোরে
ছুঁইও না। ধু
কদম তলে থাক কানু রে কদম পুষ্প
চাইয়া।
প্রাণ হরিয়া নিলা শ্যামে বাঁশিটি বাজাইয়া॥
কদম তলে থাক কানু রে
বাজাও মোহন বাঁশি
বাঁশির স্বরে খসি পড়ে কাঁখের কলসী।
রাজপন্থে থাক কানু রে করো বাটোয়ারি।
ছাড়ি দেও নেতের অঞ্চল
বন্ধু ভাঙ্গিব গাগরি।
মাঠে থাক ধেনু রাখ রাখোয়ালের মতি।
তুমি নি রাখিতে পার বন্ধু
সুজনের পিরীতি।
জাঙ্গালে সে আইস বন্ধু জাঙ্গালে সে যাও।
কত ধন দিবা করি বন্ধু ফিরিয়া না চাও।
সৈয়দ মর্তুজা কহে বন্ধু মনেত ভাবিয়া।
তুমি নি আসিবা বন্ধু রাধার লাগিয়া।

॥ ১০৯ ॥

[রাগ মালব]

সজনি গো সই তুমি কি আমারে বোল
কালিয়া কানুর বাঁশী বোলে কত বোল। ধু
দেখা নাহি শুনা নাহি নাহি পরিচয়
অকারণে কানাইর বাঁশী রাধার নাম লয়।

চূড়ায় শিখণ্ডী পুষ্প জলধর কালা
বয়ানে পূরল বাঁশী গলে মোহন মালা।
শুনিতে বাঁশীর ধ্বনি পিকবর জিনি
হেলায় হারাল মন কুলের কামিনী
সৈয়দ মর্তুজায় কহে শুন শুন রাধা।
নাম ধরি ডাকে বাঁশী তোর নাম রাধা।

॥ ১১০ ॥

[ধানসী]

তোর নি বাঁশীর রব শুনি গো কালা
তোর নি বাঁশীর রব শুনি ॥ ধু
উজানে বাজাও বাঁশী মথুরা বইয়া শুনি
কামিনী হরল কাম বাঁশী
তপস্যা ছাড়ে মুনি ॥
কোন্ দেশে তরল বাঁশী বাজাইল বন্ধুয়া।
রাধের প্রাণ হরিতে বাঁশী
আনিল কানাইয়া ॥
যে খনে বাজাও বাঁশী সে খনে নাগাল পাম্
শিকুড়ে উফারি বাঁশী সাগরে ভাসাম্ ॥
সৈয়দ মর্তুজা কহে যৌবন দিমু ডালি।
তন ছাড়ি প্রাণি টান তন হৈল খালি ॥

॥ ১১১ ॥

[রাগ কানড়া]

রে শ্যাম তোমার মুরলী বড় রসিয়া।
উচ্চস্বরে বাঁশি বাজে গোকুল কামিনী সাজে
কোটি কোটি চান্দ পড়ে খসিয়া। ধু
তোমার হৃদের মাঝে অমূল্য রতন আছে
দেখিলে গোপিনী নিব কাড়িয়া।
নন্দের ছাওয়াল বসি পথে করে ঠেলাঠেলি
কালিয়া কদম্ব তলে বসিয়া ॥

সাধিয়া আপনা কাজ কুলেতে রাখিলা লাজ
জলের নিয়ড়ে রৈলু্ঁ বসিয়া।
সৈয়দ মর্তুজা কয় পর কি আপনা হয়
কলঙ্ক রহিল জগ ভরিয়া॥

॥ ১১২ ॥

[রাগ—মারহাটি]

ঘাম না সহে সজনি রে
রোদে উনাইয়া পড়ে ঘাম। ধু
তোমার বাঁশীর স্বরে প্রাণ মোর বিদরে
রহিতে না পারি ঘরে।
হেন লয় হিয়া প্রেম-ডুরি দিয়া
বান্ধিয়া রাখি তোমারে॥
হেন লয় মনে বন্ধুর চরণে
ভজি থাকি রাত্রি দিন।
দয়ার ঠাকুর না হইও নিঠুর
দেখি বড় অতি হীন॥
কহে আফজল আলি শরীর কৈলুম কালি
তুমি সে বন্ধুয়ার লাগ্নি।
পিরীতি বাড়াইয়া যদি যাও ছাড়িয়া
নিশ্চয় হইমু বৈরাগী॥

॥ ১১৩ ॥

[কানড় গীত]

হাহা রে বন্ধুর বাঁশি চিকণ ফাঁসি
লাগিয়া রইল রাধার গলে।
বন্ধুর বাঁশি চিত্ত চোর
লাগাইয়া প্রেমের ডোর
যুবতী রমণী ধরি টানে।
কুলবধূ কুল হিয়া
হরি নিল বাঁশি দিয়া
আনলেতে তনু দিয়া
জ্বলিয়া পুড়িয়া হইলাম ছালি।
কহে হীন আলাওলে
জল ঢাল সে আনলে
নিবাও আনল রস দিয়া।

॥ ১১৪ ॥

[বাইশ রাগের গীত]

শ্যাম অঙ্গে বংশী রব হে অমিয়া তরঙ্গ।
শুতিছি বন্ধুর সঙ্গে জড়ি যে অঙ্গে অঙ্গ।
আহীর বালক মিলি করন্ত যে রাস কেলি
কদম্ব হেলানে কহু ললিত ত্রিভঙ্গ॥ ধু
মিশ্রিত ভৈরব নাদ শুনিয়া মালব জাত
নানা স্বরে শব্দ পূরে শ্রীমন্ত মোহন।
শুনিয়া বসন্ত তান কাষ্ঠ শিলা দ্রবমান
মল্লার মিশ্রিত আশাবরী শুভগান॥
মন্দ মন্দ বহে ঔর সোহি ধ্বনি সুমধুর
নটবর রায় ভালা কেদার বাজাএ।
বড়ারি সুস্বর পূরি তাহে পট মঞ্জরী
সিন্ধুরা সুনাদে পশুপক্ষী মোহ পাএ।
ধানশী সুমঙ্গলা মায়ূরী মিলিছে ভালা
ভাটিয়ালে শুনি অতি ভুজঙ্গম খেলাএ।
করুণ বাঁশীর স্বরে কেহ মরে কেহ জীএ
শুনি হীন আলাওলে গড়াগড়ি যায়॥

॥ ১১৫ ॥

[মায়ুরী]

চলহ সখি নাগরি! মান তুমি পরিহরি
দেখ আসি নাগর রায়।

যত কুল ব্রজনারী অঞ্জলি ভরি ভরি
আবীর ফেপেন্ত শ্যাম গায় ॥
ক্ষণে যায় যমুনার জলে,
ক্ষণে ক্ষণে তরু মূলে,
ক্ষণে ক্ষণে বাঁশীটি বাজায়।
শুনিয়া বাঁশীর সান তেজল রমণী মান,
শ্রুতি মন নিত্য তথা ধায় ॥
কহে নাসির মোহাম্মদে ভজ রাধে শ্যাম পদে
বিলম্ব করিতে না যুয়ায় ॥

॥ ১১৬ ॥

আ লো সজনি ও কে মুরলী বাজায়
শুনিয়া বাঁশির সান তেজিয়া যে লাজ মান,
শ্রুতি-মন নিত্য ধায়।
বিনা দরশন জ্বালা অনুক্ষণ
কানুক রাখিমু ভায়॰।
নাসির্ বচনী শুন লো রমণী
ভক্ত-অন্ত ব্রজরায়।

॥ ১১৭ ॥

[তুড়ী-গুঞ্জরী-কেদার]

যশোয়া মাতা নিরোধ নন্দন আপনা।
কুলের বৌয়ারি লৈয়া
বাটে ঘাটে রৈয়া রৈয়া
না করএ যেন ঢেঙ্গপণা ॥ ধূ
ব্রজরামা জলে যায় পন্থ আগুলিয়া তায়
মাগে আলিঙ্গন-রস ডালি।
সঙ্গিয়া বালক যত চঞ্চল চঙ্গিয়া মত
হাসি হাসি নাচে দিয়া তালি ॥
কালিয়া কাজল আঁখি কালিন্দী কূলেত থাকি
মুরলী আলাপে অনুপাম।
গোপী আসিব আ.শ
বাঁশি সানে নানা ভাষে
একে একে ধরি নামে নাম ॥
শুনি ও বাঁশির নাদ রাধিকার পরিবাদ
গোকুলে হৈয়াছে জানাজানি।
আইনুদ্দিনে বোলে রাই
বাঁশিয়ার দোষ নাই।
ভোলাইছে ওই সোহাগিনী ॥

॥ ১১৮ ॥

[করুণ ভাটিয়াল]

বদলে থুইয়া যাও বাঁশী রে রাধার বন্ধু
বদলে থুইয়া যাও বাঁশী। ধূ
এই বাঁশী মথুরা যাইব
পুনি নি গোকুলে আইব
লাগ পাইলে মথুরা নাগরী।
এই বাঁশী যতন কৈলুম
দুই কুলে কলঙ্কী হৈলুম
বাঁশী হইল মোর প্রাণের বৈরী।
মন মোর ঘোর নিশি তুমি মোর প্রাণ শশী
রসিয়া নাগর যেই জন।
যার সঙ্গে নিত্য হাসি অমিয়া সাগর-বাসি
সে নারীর সাফল্য জীবন ॥
মীর্জা কাঙ্গালী কহে সোনা নহে রূপা নহে
তরল পাকের যে বাঁশী।
আজ্ঞা কর প্রাণনাথ বাঁশী দেও মোর হাত
অনামূলে হৈয়া গেলুম দাসী

॥ ১১৯ ॥

[কানড়া বা পুবরী]

বন্ধুয়া বলিমু কোন্ লাজে রে সজনি সই
কালিয়া বলিমু কোন্ লাজে। ধূ

বন্ধুয়া বন্ধুয়া কালিয়া তোর নাম
প্রভাত হইতে কর ঘর-গৃহ কাম।
গৃহ-ঘরের কাম কর বাথানে রাখ ধেনু
ষোলশ গোপিণী মাঝে এক রাধা কানু।
আরের বন্ধুয়া বসে পালঙ্গ মহলে
আসিলে আমার বন্ধু বসে কদম তলে।
কদম্বের তলে থাকি শ্যামের বাঁশী টানে
মন উদাসিনী কৈল সেই বাঁশীর সানে।
দেখি মনোহরে কহে কদম্ব মালা গলে,
দিবেক সে সব মালা কাঁচা রাধার গলে।

॥ ১২০ ॥

[ধানসী]

হরিয়া লই গেল জাতি কুল
মদনের বাঁশী। ধু
অখণ্ড মহিমা যার নাহিক তুলন
মারিয়া জিয়ায় বংশী না জানি কেমন।
না হয় বংশীর ধ্বনি পূর্ণ কামশর
আলাপ করিতে মাত্র প্রাণ তেজে ধর।
অব্যর্থ কুসুম বাণ চিত্তান্তরে হানে
বংশীর বেশে নামে গোপিনী বান্ধি আনে।
যার নাম বেদশাস্ত্র অক্ষরে না ধরে
পরম বংশীর সানে সে নাম নিঃসরে।
শাহ কেয়ামদ্দিন গুরু বংশী নাদে বশ
আলী রজা কহে বাঁশী অমূল্য পরশ।

॥ ১২১ ॥

[ধানসী]

বংশী স্বরে পূরে যন্ত্র রাধা হৃদান্তরে। ধু
রাধার মন্দির মাঝে পঞ্চ শব্দে বাদ্য বাজে
রাধা কানু লীলায় পিরীত
প্রেম যশে গাহে যন্ত্র গীত।
রাধিকার কায় মন ঠাকুরের বৃন্দাবন
ষড় ঋত রাগ তথা বৈসে।
ছয় চক্র জ্ঞান-ঘর তাতে সপ্ত সরোবর
রাজহংস শত শত ভাসে।
বৃন্দাবনে বনমালী রাধা সঙ্গে করে কেলি
কাম প্রেম রসেত ডুবিত।
দারুণি পিরীতি রসে মাধব রাধার বশে
গুপ্তরূপে হইছে মোহিত।
গুরুর চরণ মূলে থাকি আলি রজা বোলে
রাধা হোন্তে নহে কানু দূরে
অল্পদিনে দুখিনী ঠাকুরকে লয় চিনি
নিত্য শ্যাম রাধার মন্দিরে।

॥ ১২২ ॥

[মালব]

বনমালী শ্যাম তোর মুররী জগপ্রাণ। ধু
শুনি মুররীর ধ্বনির ভ্রম যায় দেব মুনি
ত্রিভুবন হয় জরজর।
কুলবতী যত নারী গৃহবাস দিল ছাড়ি
শুনিয়া দারুণি বংশীর স্বর।
জাতিধর্ম কুলনীতি তেজিব দুর্লভ পতি
নিত্য শুনি মুররীর গীত।
বংশী হেন মূর্তি ধরে তনু রাখি প্রাণ হরে
বংশী মূলে জগতের চিত।
যে শুনে তোমার বংশী সে বড় দেবের অংশী
প্রচারি কহিতে বাসি ভয়।
গৃহবাসে কিবা সাধ বংশী মোর প্রাণনাথ
গুরু পদে আলি রজা কয়।

॥ ১২৩ ॥

[রামক্রিয়া]

রাধা কানু সর্বতে বিলাসি।
রাধিকার মন মাঝে কালিকা শ্যামের বাঁশী
জগতে ব্যাপিত যুক্ত কৃষ্ণ যার নাম।
সকল গোকুলে সে রাধার বন্ধু শ্যাম॥
শশী রবি যার রূপ দেখি লজ্জা পায়
সেই রূপ সতত রাধার মনে ভায়।
শাহ কেয়ামদ্দিন গুরু প্রেম গানে বশ
রাধা সঙ্গে বনমালী ভুঞ্জে প্রেম রস।

॥ ১২৪ ॥

[রামক্রিয়া]

গোপী-শ্যাম প্রেমের রসাগার
রাধা-কানু পিরীতি সাগর। ধু
নিত্য মাঠে থাকে হরি রাখোয়াল সঙ্গে করি
বংশীর ঠমকে গাহে গীত।
শুনি মুরলীর ধ্বনি কম্পিত রাধার প্রাণি
পিরীতি বিরহে দহে চিত।
করুণ বংশীর স্বরে দেব মুনি জ্ঞান হরে
যার হৃদে জাগে পঞ্চবাণ
পঞ্চবাণ বংশী সুর জ্ঞান-গর্ব করে দূর
জাতি-ধর্ম-লাজ-কুল-মান।
রাধা সে বংশীর নাদে
মাঠে গেল কাম সাধে
জল ছলে কালিন্দীর কূলে
হীন আলী রজা ভণে
রাধা কানু রতি রণে
প্রেমলীলা কদম্বের তলে।

॥ ১২৫ ॥

[আশাবরী]

কানু বিনে রাধার না লয় আন চিত।
জগতের কায়-মনে যার যন্ত্র গীত। ধু
প্রেম বিনু রাধায় না জানে কোন কাম
অষ্ট অঙ্গ রাধার নিঃসরে শ্যাম নাম।
ভক্ষ্যক্রিয়া তেজি রাধা শ্যাম প্রেমে বশ
সতত হরির সেবা অমূল্য পরশ।
গুরুর শরণে হীন আলী রজা ভণে।
জন্ম জন্ম ভক্ত রাধা হরির চরণে।

॥ ১২৬ ॥

[রাগ গান্ধার]

না জানোঁ না চিনোঁ কেবা যমুনার কূলে
দূরে থাকি বাজায় বাঁশী ফুলের মালা গলে।
ক্ষেণে হাটে, ক্ষেণে বাটে ক্ষেণে তরু মূলে
ক্ষেণে ক্ষেণে তার বাঁশী 'রাধা রাধা' বোলে
ক্ষেণে ক্ষেণে বাঁধে চূড়া
ক্ষেণে ক্ষেণে খোলে।
ক্ষণে ক্ষণে বাঁশীর নাদে জল তুলে কূলে।
মোহাম্মদ হাসিমে কহে ভুবন মোহিলে
কার বাঁশী হেনহি বলিবে ব্রজ কূলে।

॥ ১২৭ ॥

কৈলে বঁধুর কথা কৈও
গাইলে শ্যামের গীত গাইও, মন্থরা ভাই।
বেদ অংশ দিয়া এ ঘর বান্ধিয়া
তাতে খেলে ঘরের গৃহী।
হৃদের অন্তরে যেই পঞ্চ-বাজারে
বাজে রাজধ্বনি শ্রী।

মন সদাগরে যেই পঞ্চ-বাজারে
নিত্য কিনে রাজধ্বনি।
তেজি ভব মায়া চিন নিজ কায়া
গুরুকাছে তত্ত্ব জানি।
উপরে মূড়া তাতে সপ্ত দ্বার
বেদ দ্বারে সুরধ্বনি।
দক্ষিণ উত্তরে এ যুগ দুয়ার 'পরে
বাজায় বংশী শুনি
যত মুনি ঋষি নিত্য বাজায় বাঁশি
আপে গুরু সূক্ষ্ম ধ্যানী।
তত্ত্ব পন্থ সার বংশী বিনে আর
নাহি জানে শুদ্ধ জ্ঞানী।
আলি রজা গুরু পদে এর্শাছুল্লাহ ভণে
নিত্য লীলা-দাঁড় বাইও
ভাটি আর উজানি সঙ্গে নৌকাখানি
সদায় পরম নাম লইও।

॥ ১২৮ ॥

ও মন দেখ রে সতত মুরলী ফুকে কে। ধু
নন্দিয়া কিনারে কদম্ব শিকড়ে
শুন মুরলীর স্বরে।
হারাই যে জ্ঞান, ছটফট প্রাণ
রহিতে না পারি ঘরে।
শুনিতে মুরলী ছাড়ি গৃহবাড়ী
স্থির নহে নারীর চিত।
হেন হি মাধুরী সে বাঁশীতে ভরি
সদা গাহে হেন গীত।
মুইতো অভাগী ঋতু সঙ্গী লাগি
নিকালিতে নাহি পারি।
গৃহকর্ম ছাড়ি সঙ্গে আর চারি
তার ভয় করি নারী।
দেওরিয়া ঘরে ননদিনী ডরে
শাশুড়ী কালের কাল।
সতিনীর জ্বালা সদা মুখ কালা
বিষ-প্রায় হৈল জা'ল।
সদা মনে দুখ গৃহে নাহি সুখ
পড়শী হইল অরি।
কহিতে লাগব নাহিক বান্ধব
সতত এ দুখে মরি।
সকল হারাই পন্থ নাহি পাই
গুরু বিনু লক্ষ্য আর।
সেই পদ বিনে ত্রিলোক ভুবনে
সেই বস্তু নাহি সার।
কাতর কিঙ্করে ডাকে বারে বারে
শাহ আলি রজা পায়।
সারেঙ্গির স্বরে কান্দিয়ে নির্ভরে
হীন সর্ফতুল্লাহ গায়।

॥ ১২৯ ॥

[তুড়ি জালালী]

শ্যামের মুররী আকুল কৈল রে
কালার বাঁশির স্বরে। ধু
তরুয়া কদম্ব তলে অধরে মুররী পূরি
ডাকে বাঁশি 'আয় আয় কদম তলে।'
একেত চিকণ কালা
গলে শোভে মোহন মালা
হাতে শোভে মোহন মুররী।

যাইতে যমুনার জলে আচম্বিত তরু মূলে
না ভজিতে যাঁচে গলার মালা
ডংশিল কালিয়া নাগে বেদমন্ত্র নাহি লাগে
জীবনের কি হবে উপায়।

॥ ১৩০ ॥

[লাচাড়ি]

দেখা দিয়া জুড়াও পরাণ। ধু
অবলা মন্দিরে বসি
প্রাণের নাথ বাজায় বাঁশী
অভাগিনী শুনি বাঁশীর গীত।
অই বন্ধুর বংশীর সানে
ধৈরজ না মানে প্রাণে
আকুল করিল নারীর চিত।
শুনিয়া মোহন বাঁশী হইলুম তোমার দাসী
ভজিলুম তুই শ্যামের চরণে।
না দেখি তোমার জ্যোতি *
স্থির নহে মোর মতি
একবার দেখা কর নারীর সনে।
দয়ার ঠাকুর তুমি তোমার ভাবক আমি
তুমি দয়া না করিলে মোরে।
তুমি প্রাণনাথ বিনে আর দয়া করিব কোনে
তুমি বিনে কে আছে সংসারে।
তোমার কৃপার ফলে মোহর ভাগ্যের বলে
আসিয়াছ অবলা মন্দিরে।
এই ঘর আঁধার করি একদিন যাইবা ছাড়ি
কেনে দেখা না দেও রাধারে।
তনুর অন্তরে পশি মনুরা রহিছে বসি
কিরূপে ভজিলে দেখা পাই।

কহন্ত বদিয়ুদ্দিনে গুরুর আদেশ বিনে
দেখিবার আর লক্ষ্য নাই।

॥ ১৩১ ॥

কহ সখি জীবনের উপায় রে
শ্যামের মুরলী। ধু
পঞ্চ-দণ্ড পুরাইতে পূরবী রাগিনী গাইতে রে
সিদ্ধি কুচগিরি লইয়া রে।
কদম্ব গাছেতে বসি বাজায় মোহন বাঁশি
বাঁশির সুরে রইতে না পারি রে।
রাধে যায় জল ভরিতে
কানু হাসে কদম গাছেতে
রাধার পরাণ 'বাইরহম বাইরহম' করে
উত্তর থু দক্ষিণে যাইতে
মোরে পাইল রাঙ্গ পন্থে রে
ধূলায় নিল রাধার শিষের সিন্দুর রে।

॥ ১৩২ ॥

বিনোদ কানাই
শ্রীবৃন্দাবনে কানু গো রে
মুরলী রব শুনি। ধু
বিরহে বেদনা তনু পূরয় মোহন বেনু
ললিত ত্রিভঙ্গ শ্যাম রায়।
পায়ের উপর পাও থুইয়া
নীপমূলে শ্যাম দাণ্ডাইয়া
'রাধা' বলি মুরলী বাজায়।
কেহো ছিল রন্ধনে কেহো দুগ্ধ আউটনে
কেহো পরে সীমন্তে সিন্দুর।
কেহো গুন্থে রত্নহার কেহো পরে অলঙ্কার
কারো শোভে চরণে নেপুর।

॥ ১৩৩ ॥

[কল্যাণ জালালি]

না বাজাইও না বাজাইও বাঁশি রে মুরারি
আমি তোমার দাসের দাসী রে। ধু
মুরারি না মুরারি সুমধুর পূরবি
নবরঙ্গ বেশ বানাইয়া।
কত না বড়াই রাখ নাম ধরিয়া ডাক
রে মুরারি লৈয়া যাইবে রাজ দরবারে।

॥ ১৩৪ ॥

শ্যামের বাঁশীএ মান রবে না। ধু।
শুনিলে মোহন বাঁশী
ঘরে রৈতে পারি না।
শ্যামের বাঁশী কেমতে শুনি
শাশুড়ী করে ঘরে গঞ্জনা॥

॥ ১৩৫ ॥

নিকুঞ্জ বনে বাঁশী বাজিল।
প্রাণ সই বাঁশী ডাকে 'রাধা রাধা' বলি।
সই যমুনার কিনারে বসি
কানাইয়া বাজায় বাঁশী
বাঁশীর স্বরে মন উদাসী।

॥ ১৩৬ ॥

[রাগ ভাটিয়াল]

প্রাণের সজনি সই রে
কালারে মানাইয়া মোরে দে।
বনমালা ফুল গলে লইয়া
সে কালারে মানাইমু গিয়া।
মানাইমু চরণে ধরিয়া
সাত পাঁচ সখী লইয়া।
যমুনা স্নানেতে গিয়া
নোয়ালি যৌবন দিব দান।
তরুয়া কদম্ব তলে অধরে মুরলী পূরে
নিল প্রাণি কালার বাঁশীর স্বরে।

॥ ১৩৭ ॥

জলে যাইও না যাইও না রাধা
তরুতল দিয়া রে জলে যাইও না। ধু
তরুতল দিয়া রে কদম্ব তল দিয়া
রাধিকায় বৈসাইছে চৌকি কানুর
লাগিয়া রে॥
জলে যাইতে সুবদনী সাজি আইল রে।
থাকুক দূরের বণিজ
সোয়ামী আসুক ঘরে রে
জল ভর যে সুবদনী হেট মাথা হৈয়া
যে তোরে পাঠাইছে জলে
কঠিন তার হিয়া রে॥
জলে নামি সুবদনী ধামালী খেলায়।
তরুতলে আসি কানু মুরলী বাজায় রে॥

॥ ১৩৮ ॥

রূপ দেখি কেবা যাইব ঘরে।
চিত্ত-কাড়া কালার বাঁশী
লাগিছে অন্তরে। ধু
কিবা দিনে কিবা ক্ষেণে বন্ধুর সনে দেখা।
যেবা ছিল জাতিকুল না যাইবে রাখা।
সে যে জানে কালার বাঁশী লাগিয়াছে যারে
ছাড়িবে জগত মায়া ডরাইবে কারে।
মোহাম্মদ হাসিমে কহে রূপের নিছনি।
কিবা আছে কিবা দিমু সবে সুধা প্রাণি।

॥ আক্ষেপ ॥

॥ ১৩৯ ॥

[ধানশী]

ও কুলের বধূ রে।
মজালি, মজালি, মজালি রে জাতিকুল। ধু
একেত কুলের বধূ আর ত অবলা
কতেক সহিমু নাথ কলঙ্কের জ্বালা।
ঘরে গঞ্জে গুরুজন বাহিরে রবির তাপ
পরের পিরীতি নাথ আন্ধার ঘরে সাপ।
ঐ কূলে বন্ধুর বাড়ী মাঝে ক্ষীর নদী
উড়ি যাইতাম সাধ করে, পাখা না দেয় বিধি
সৈয়দ মর্তুজা কহে মনেত ভাবিয়া
তন জ্বলে মন পোড়ে ঐ বন্ধুর লাগিয়া।

॥ ১৪০ ॥

[রাগ তুড়ি]

আহা রে যৌবন ফুল বৃন্দাবন
অধরে ধামালি খেলা
বসন্ত পবন আনন্দ ভুবন
ফলি ফলি চলি গেলা। ধু
এ লাস বিলাস হাস্য পরিহাস
পিক ঝিক কুহু রোল
রসের মণ্ডলী অমৃত কুণ্ডলী
পিয়া সোহাগের কোল।
জীবন গুমান রূপ সম্মান
জীবন যাবত জানি
নাসিরদ্দিনের এ দুঃখ মনের
মরমে রহিল হানি।

॥ ১৪১ ॥

[মারাট্টি]

আ লো সজনি ঘরে গিয়া কি বোল বুলিমু
শাশুড়ী ননদী বৈরী আর দুষ্ট পাড়াপড়ি
কোন মতে ভাবিলুম। ধু
সই কেনে রে আইলুম জলে।
আচম্বিত কানু আসি ফেলিয়া হস্তের বাঁশী
আলিঙ্গিয়া 'রাধা রাধা' বলে॥
সইরে অধরে অধর দিয়া
কুচ যুগ তাড়িয়া কাঁচুলি বিদারি ফেলে
নখঘাত দিয়া॥
সইরে এ দুঃখ কহিমু কারে।
মাতুল বনিতা আমি হই তাহান মামী
কলঙ্কিনী করিল মোরে॥
সই রে এ সব নাসিরে ভণে
রাধে তেজ সেই রোষ হও পরিতোষ
দুঃখ না ভাবিও মনে॥

॥ ১৪২ ॥

[গুর্জরী]

নাগর কানাই রে
কি দেখিলাম যমুনার ঘাটে। ধু
জঙ্গম মেঘের আড়ে যুগল খঞ্জন নাচে রে
তা দেখিয়া মোর হিয়া ফাটে রে॥
যমুনার জলে যাইতে বৃষ্টি পাইল রাজপন্থে
ধোলাইল শিরের সিন্দূর রে।
বেহানে পড়িল বাধা
কেনে গেলুম কলঙ্কী রাধা

শ্যামের অঙ্গে অঙ্গ মোর
পড়ি গেল ঢেশা রে ॥
পদ 'পরে পদ থুইয়া কদম্ব হেলান দিয়া
বাজায় বাঁশী পিয়া নাম নিয়া রে।
দংশিল অনঙ্গ নাগে বেদমন্ত্র নাহি লাগে রে
বিষে ছাইল সর্ব অঙ্গ রে।
মুহম্মদ আলিএ ভণে না ভাবিও দুঃখ মনে
ভাব প্রভু এক সার রে ॥

॥ ১৪৩ ॥

[গড়া]

সোনা বন্ধুর কি হৈল বেয়াধি
তাহার ঔষধ তোমরা কেহ জান যদি। ধু
আমি ত অবলা নারী কিছু ত নাহি জানি
হৃদের অন্তরে আছে প্রেমের আগুনি।
ধন্বন্তরীর পাশে যাই চাহ জিজ্ঞাসিয়া
তারা নি পারিব বিষ নামাইতে ঝাড়িয়া।
সৈয়দ মর্তুজা কহে শুন রে কাহিনী
তোমারে দংশিয়া আছে প্রেমের আগুনি।

॥ ১৪৪ ॥

[সুহই]

বল দেখি কি বুদ্ধি করিব
কানুর পিরীতি বড় পরমাদ
দৈবে মরিয়া যাব। ধু
শাশুড়ী ননদী মোরে কুবচন বলে,
কভু নাহি ঠেকে রাঙ্গা নয়ান হিলোলে।
নাসির মাহমুদে কহে লই ল' কথা
যে ছিল করমে তোর লিখিল বিধাতা।

॥ ১৪৫ ॥

[ধানসী]

আরে মোর এ কি পরমাদ হইল
ছট ফট করে হিয়া কহ না বন্ধুরে গিয়া
কিবা দিয় কিবা গুণ কৈল। ধু
জী'তে মোর সাধ মিছামিছি পরিবাদ
মিছা পাকে ঠেকিয়া রহিনু।
এমন করম মোর কলঙ্কের নাহি ওর
কলঙ্কে কলঙ্কে মুই মৈনু।
সহিতে না পারি আর কৃপা কর করতার
জনম অবধি দুঃখ পাইনু।
অধম ফতনের সাধ ক্ষেম প্রভু অপরাধ
রাঙ্গা পায় শরণ লইনু।

॥ ১৪৬ ॥

কি করিল সখী সবে মোরে নিদে
জাগাইয়া। ধু
আইল চিকণ কালা সময় জানিয়া।
চাপিল প্রেমের নিদে শ্যাম কোল পাইয়া
কহিছে বিনয় করি উরে হাত দিয়া।
যৌবনের গরবে মুই না চাহিলুঁ ফিরিয়া
'পিউঁ পিউ' বুলিয়া বালিস লৈলুঁ উরে।
চৈতন্য পাইয়া দেখোঁ
পিয়া নাই মোর কোলে।
মনের আকুতে মুই একলা নিদ যাম
কেনে রে দারুণ বিধি মোরে হৈল বাম।
কহে কবি লাল বেগে স্বপ্নেত জাগিয়া
খণ্ডিল জন্মের দুখ চান্দমুখ চাহিয়া॥

॥ ১৪৭ ॥

ও সই করি হাউসে পিরীতি,
শরীরে না সয় রে দুর্গতি। ধু
না বুঝি কালার সনে করিলাম পিরীতি,
রাত্রিদিন চিন্তা মনে,
হৈবে আমার কোন্ গতি।
সন্ধ্যাকালে শুতিলে হয় রাতের নিশি।
শয়নে না ধরে নিদ্রা
মোহন বাঁশী ফুকে নিতি ॥
নিশি দিশি কালাচান্দে বাজায় মোহন বাঁশী
নাম ধরিয়া ডাকে বাঁশী,
'আইস রাধে শ্রীমতী ॥'
শ্রীকমর আলি কহে শুনু রসিক যুবতী
সঙ্গে মিলি কর কেলি
সুখে জনম যাউক বিতি।

॥ ১৪৮ ॥

কালা চান্দে আকুল কৈল
সে কি জানে মন্ত্রনা ?
দুতীগো, আর ত প্রাণি বাঁচে না ॥ ধু
নিশি দিশি হৃদে মোর অই সে ভাবনা !
ত্রিভঙ্গে ভুলাইয়া গেল,
দিয়া প্রেমের যন্ত্রনা ॥
নিত্য নিত্য আসি ব্রজে সেই রসিক জনা।
প্রেম-পসরা লুটি চোরা
পুনি ব্রজে আইসে না ॥
যেন আনলে কানন বন করে দাহনা
তেমনি জ্বলে চিত্ত,
শ্যাম কিছু তার জানে না ॥
শ্রীকমর আলি কহে,
পেয়ারী না করিও ভাবনা
আসিবে তোর কালা চান্দ
থাকিলে তোর বাসনা ॥

॥ ১৪৯ ॥

[কাফি]

হায় রে মরি রে প্রেমের যন্ত্রনা
আর পিরীতি করব না। ধু
পিরীত করি কুল মজাইলুঁ তাহে
নারী বুঝিলাম না
সাদরে বাড়াইলাম পিরীত
প্রেম-জ্বালায় প্রাণ বাঁচে না।
অবলা গোপালের মেয়ে
প্রেম জ্বালায় প্রাণ বাঁচে না।
শাশুড়ী ননদী বসি সদায় করে গঞ্জনা
কুলের বধূ আকুল কৈল সে কি জানে মন্ত্রনা
জাতি-কুল-মান গেল
গোকুলে রইল ঘোষণা
রাখাল জাতির হীন মতি
প্রেমের বেদন জানে না।
প্রেম-পসরা রসের ভরা
ভাঙলে জোড়া লাগে না
কহে শ্রীকমর আলি
পীরিত কেন জানলে না
জগতে কলঙ্ক করি ছাড়ছ প্রাণ বাসনা।

॥ ১৫০ ॥

[বিভাস]

ফুলের মালা গলে রে চম্পার মালা দোলে
রূপ যৌবন হরি নিল মালতীর মালে। ধু

সুক্ষণে গাঁথিয়াছে মালা মাঝে মাঝে ফুল।
ফুলের মালা গলে দিয়া নিল জাতিকুল।
সেকালি ফুলের মাঝে গন্ধরাজ ফুল
ফুলের মহিমা জানে নন্দের ঠাকুর।
হীন হাসিমে বোলে
ফুলের মালা গলে দোলে
রূপ যৌবন হরি নিল মালতীর মালে।

॥ ১৫১ ॥

ভ্রমে অভাগিনী না চাহিলাম গুণমণি
আসিল রে প্রাণবন্ধু না কৈলাম দরশন
ধরি পড়শীর বোল হাম অভাগিনী
বন্ধুয়া নাগর গুণের সাগর
গোপত পরশ হায়।
হাম অভাগিনী
পুরান পিরীতি ছিল যত ইতি
সই সব লাগে ধান্দা।
এবে দিনে দিনে চিত্ত বিঁধে ঘুণে
জীউ রহে মাত্র বান্ধা।
কহে শমসেরে গুণের সাগরে
এখনে বন্ধুরে পাম।
মনের আগুনি কহিয়া কাহিনী
চরণে মিশিয়া যাম।

॥ ১৫২ ॥

ওরে প্রেম-তুফানে পড়ি আমার প্রাণ গেল
সজনি সই অখনকার উপায় বোল। ধু
আমি কি করি উপায়
ভাবি ভাবি প্রাণ যায়
বোল গো সই কি হবে নিস্তার।
ভাঙ্গা তরী সই সইরে
ভাঙ্গা তরী কি ঝকমারি
আস্তে আস্তে বাহি চল।

॥ ১৫৩ ॥

লালসা দি যৌবন লুটিল
বুঝিলাম না কানুর ফাঁকি
হায় গো নারীর উপায় কি। ধু
প্রেমের ভরা লুঠ্যা চোরা
মোরে দিয়া গেল ফাঁকি।
হৃদে বৈয়া মধু খাইয়া শ্যামে কৈলা উদাসী
হাতে বাঁশি মুখে হাসি কদম্ব ডালে বসি
বংশীর স্বরে কুল মজাইলুঁ
জগতে হৈলুঁ কলঙ্কী।
মাখন-চোরা কি ক্ষেণে পোড়া পন্থে হি
চৌকি দে
লুটিল যৌবন ভাঙ্গিল কুম্ভ
কুবোল বোলে সন্ধ্যে।
হৃদে কালা মুখে কালা চিন রাখাল জাতি
গোঠে থাকে ধেনু রাখে
সে কি জানে পীরিতি।
প্রেম সাগরে ভাসাই মোরে
ভাঙ্গিল শ্যামের পিরীতি
জাতি গেল কুল গেল
এবে নারীর কোন্ গতি।
শ্রী গো রাধের যুগল পদে
কমর আলি ভণ্যাছি
বুঝিয়া চরিত করিও পিরীত
কে হয় মরণের সাথী।

॥ ১৫৪ ॥

প্রাণি মোর কান্দে
কি ক্ষেণে ঠেকিয়া রহিলুঁ পিরীতির ফান্দে।
পিরীতি কানু ছাড়িলা আমারে
তাপের তাপিনী হইয়া ভাসিলুঁ সাগরে
যার প্রেম রাখিয়া লোকের হইলুম বৈরী
দারুণ প্রেমের জ্বালা না দেখিলে মরি
পিরীতিজনের কালা মরণের দারু
পিরীতি সবের বৈরী পরাণের গুরু।
হীন আলি রজা কহে সরস বুকে
কাল নাগে ডংসিলে ঔষধ গুরু মুখে।

॥ ১৫৫ ॥

প্রেম নগরে আমারে লোকে বোলে কলঙ্কী।
আমি প্রেম কৈরা হইয়াছি শোকী ॥
নব অনুরাগে আমি প্রেম করিছি।
পরেরে আপনা বলি প্রাণ সঁপিছি ॥
না পূরিল মন সাধ
লাভ হইতে হইল
এহি লোক পরিবাদ।
আমি সরমে না মুখ তুলি
সই মরমেতে মজিয়া থাকি।
আগেতে জানিতাম যদি এমনি হবে
এ ছার পিরীতে আমি মজি কি তবে?
আমি গুমরি গুমরি থাকি
সই আমার ঘুরে দুই আঁখি।
পরের দুঃখে দুঃখিত হই হল একি দায়
ভাবিএ ভাবিএ আমার চির দিন যায়
আমি বন্দী হইএ থাকি
সই যেমন পিঞ্জরার পাখী ॥

॥ দান ॥

॥ ১৫৬ ॥

[রাগ মারাটি]

আ ল সই রে চলিলুম হাটের কারণ
দধির পসার মাথে লুটিল দৈবকী সুতে
আর মাগে নোয়ালি যৌবন।
সই একি শুনাল রে
কালা বিনে জীবন বিফল।
সই রে, কানুর লাগি আমি মরি
দেখ কানু বারে বারে
বাট 'পরে লুট করে
কুচযুগে করম কর জুড়ি
সই না ল কলঙ্কী করিল মোরে।
মুই গেলুম যমুনার জলে
আচম্বিত কানু মিলে
চাপিয়া ধরিল গলে।
কুচযুগে বাড়াইল দুইকর সই না ল।
কলঙ্কিনী কৈল মোরে ঘাটে।
অলক্ষিতে আলিঙ্গিয়া অধরে মধুর দিয়া
জাতিকুল নৈল কামপাটে।
সই রে কি কাম করিলুম মুই নারী।
যাচিয়া যৌবন খানি বন্ধুরে দিয়াছি আমি
লোকের চর্চায় আমি মরি।
সই রে বাতুয়া গাছেতে বেল
দেওরিয়া লাগি ফাঁদ পাতিয়াছি
ভাশুর বাঝিয়া গেল।
সই রে মধুর মধুর বাণী
কাজল ফোটার মাঝে বন্ধুরে রাখিয়াছি
ডাকাতে করে টানাটানি সই রে।

॥ ১৫৭ ॥

চিকণ নাইয়া কানাইয়া রে পার কর তুমি।
তুমিত 'না'এর মাঝি
'না' ধরিএ মাঝামাঝি
ধরণী ধরিএ আমি রইএ আজি ॥

॥ ১৫৮ ॥

বন্ধু বিনে না রহে জীবন
আমার বন্ধু বিনে না রহে জীবন।
চলিলুম মথুরার হাটে দধির পসার মাথে
লুটিল দৈবকী সুতে
আর মাগে নোয়ালি যৌবন।
দেখ কানু বারে বার হাট পন্থে লুটোয়ার
কুচ যুগে বাড়ায় দুই কর।
মুই গেলুম যমুনার জলে
আচম্বিত কানু মিলে চাপিয়া ধরিল গলে
না, লো, সজনি বাতুয়া গয়াসে বোলে
আপনে না খাইলুম
বন্ধুরে না দিলুম
হেলায় যৌবন গেল।[১]

॥ ১৫৯ ॥

অ কি সই না লো সই
সাক্ষী হইও তুয়া পায়।
দেখ সখি বাটে বাট
কানু কৈল মহা ঠাট
কুচযুগ মাগি পরিহার।
মুই গেলাম হাটে বিহানে
দধির পসার মাথে
লুটিল দেবকীর সুতে
নয়ালি যৌবন মাগে দানে।
কলঙ্কিণী কৈল ঘাটে
শ্যাম চিকণিয়া হাটে
দৈবে নাই মোর ঠাঁই।
উরুযুগে চাপি তনে
ঘুচাইমু রাঙ্গা সনে
যদি পন্থে মিলে সে কানাই
মনোহর শুনে ভাণে
তেজ রাধে লাজ মানে
দেও রাধে রতি দান
দুখ না ভাবিও প্রাণ।

॥ ১৬০ ॥

[ললিত]

পন্থ ছাড় হাটে যাই নিলাজ কানাই
পন্থ ছাড়ি দাও হাটে যাই।
লাবণ্য তোমার আশে মনেত আদর বৈসে
কানু আমি কিছু নাহি কই। ধু
'মাথায় পসার করি
চলিয়াছ গোপালের নারী
কোথায় তোমার ঘর বাড়ী
মথুরা যাইতে চাহ কিছু দান দিয়া যাহ
অনাদানে না দিমু ছাড়ি।'
আমি হই গোপালের নারী
গোকুলেত ঘরবাড়ী
মথুরাতে করি হাট ঘাট।

[১] এই পদটি পূর্বপদের অনুরূপ।

চিরকাল এহি পন্থে না দেখিছি দান লৈতে
আজু কেনে রোধিয়াছ বাট।
তুমিত নন্দের স্থত কর্মকর অদ্ভুত
পন্থমধ্যে কব বাটওয়ারি।
রাজা আছে কংসশূর বড়াই করিব চূর
পাছে দোষ না দিও আমারি।
হীন শেখচান্দের[১] বাণী শুন রাধে ঠাকুরাণী
ভজ গিয়া কানু গুণসার।
তরিতে পাতকী লোক
না ভাবিও মনে দুখ
কানু বিনে গতি নাহি আর।

॥ ১৬১ ॥

মথুরার বাজারে যাই,
পার করি দেয় নন্দের কানাই॥
চলিছে রাধে মথুরার বাজার
ভাণ্ড ভরি মাথে করি দধির পসার।
ঘাটে চৌকি নন্দের কানাই
বলে দধি দে রে খাই
নানা ভোলা নূতন যৌবনী।
কি দিয়া মানাই যাইমু ঘাঠোয়াল মাঝি
তুমি কমল আমি ভ্রমর,
কো কুঞ্জে চল সাধ পুরাই॥
কহে হীন মোসন আলি, রাই
দান কর নয়ালি যৌবন,
পার করুক কানাই!
[তুমি নাগর ধর কাণ্ডার
আমি দিমু তোরে পান বানাই॥]

॥ ১৬২ ॥

[বিভাস]

জাগ চল ঘরে যাই রে সুন্দরী রাধে
জাগ চল ঘরে যাই। ধু
জাগালে না জাগে ওরে সুন্দরী রাধে
গায়েতে চন্দনের ছিটা
রাত্রি পোহাই গেলে লোকে দেখিব তোরে
গোকুলে রহিবেক খোঁটা।
উঞ্চল টঙ্গিতে বৈসে অরে সুন্দরী রাধে
বহে বসন্তের বাউ
আজুকার নিদে দুই আঁখি ঢলু ঢুলু
চান্দ মুখে নাই তোর রাও,
এহি পান্থে না যাইও ওরে সুন্দরী রাধে
এই পন্থে কানু বাটোয়ার।
দধি দুগ্ধ খাইব ভাণ্ড ভাঙ্গিব
ছিঁড়িব গলার হার।
[এ পুষ্প ফুটিল অরে সুন্দরী রাধে
ফুটিল চম্পার কলি মধুর লোভে
পড়িয়া রইলা রে।
রহিলেক রাধিকারে ভুলি।]

॥ ১৬৩ ॥

[বরাড়ি]

সজনি সই কেনে আইলুঁ যমুনার ঘাটে
দিনশেষ হৈল 'না'য় উগি রবি অস্ত যায়
না গেলুম মথুরার হাটে। ধু
দারুণি সখীর বোলে
মুঞি আইলুঁ যমুনার জলে

---

১ হীন সেরবাজের বাণী।

মথুরা যাইমু পার হৈয়া।
নষ্ট হইল ক্ষীর দধি পার না করিল বিধি
আজুকার হাট গেল বৈয়া।
পদে ধরি বোলম তোরে
পার করি দেও মোরে
অখনেহ হাট গেলে পাই।
সহজে হইলুঁ দাসী মানস পুরাওঁ আসি
যে ক্ষণে ঘরে চলি যাই।

॥ ১৬৪ ॥

আইস কদম্ব তলে বৈস বিনোদিনী রাধা
দারুণ সূর্যের তাপে মুখানি ঘামিয়াছে
বদন বাহিয়া পড়ে ঘাম।
চিনিয়া না চিন তুমি
আ ল বিনোদিনী আমি
নন্দের ঘরের শ্যাম।
ক্ষুধায় আকুল তিষ্টায় ব্যাকুল
শুন ভাগ্যবতী রাধা
ননী দুগ্ধ দৈ মূল্য করি নও
মোহন মুরলী রাখ বাঁধা।
আমি যে ডাকি তুমি না শুন শ্রবণে
না ফিরাও আঁখি
কানাই আকুল হইলে এই বধ লাগিবে তুয়া
কদম্ব রইল সাক্ষি।
আশর বাটা ভরি এহ লবঙ্গ সুপারি
পারিব বাটা ভরি পান
আবাল ভাগিনা হৈয়া অরে বিনোদিয়া
মামীরে কেন মাগ দান।

॥ নৌকা ॥

॥ ১৬৪ ॥

[ভহিনী ভাটিয়াল]

পার কর পার কর মোরে নাইয়া কানাই।
কানাই মোরে পার কর রে। ধু
ঘাটের ঘাটিয়াল কানাই পন্থের চৌকিদার
নয়ালি যৌবন দিমু খেয়ার পাই পার।
হইল হাটের বেলা না হৈল বিকিকিনি
মাথার উপরে দেখ আইল দিনমণি।
সৈয়দ মর্তুজা কহে রাধে গোপালিনী।
কানাইয়ার বাজারে নষ্ট যত গোয়ালিনী।

॥ ১৬৬ ॥

[তুড়ী]

না যাইমু মুই মথুরার হাটে
নৌকা ফিরাইয়া দে। ধু
মুই অভাগিনী নৌকাতে চড়িলুম
কানাইয়া ধরিল খেবা।
হেনহি সময়ে মোর বৈরী হয়ে
চলিল মলয়া দেবা।
একে আভাঙ্গা নাও কিবা বইটা বাও
চৌদিকে উঠে পানি।
এহা কি পরিহাস জাতিকুল নাশ
ধনে প্রাণে হইলুম হানি।
দধি দুগ্ধ মোর যতেক আছিল
সব হইল ঘোল।
যেই ঘাটে কানাই নৌকাতে চড়িলুম
সেই ঘাটে নিয়া মোরে তোল।

শুন শুন রাই তোমারে বুঝাই
পীর মোহাম্মঁদে বলে
এই ঘাট পার হইয়াছ বার বার
মথুরা যাইবার ছলে।

॥ ১৬৭ ॥

ধীরে ধীরে নীরে কর পার।
তুফান দেখে হাল ছেড়ো না
রসিক কাণ্ডার।
কুক্ষণে মেলিলা খেবা
অঘোর করিছে দেবা
মাঝে মাঝে ডুবাইলে তরী
কলঙ্ক তোম্যর।
কহে হীন ছুলামিয়া
শুন লো ব্রজের মাইয়া
ভজ গো রসিক নাইয়া
হইবে সুসার।

॥ ১৬৮ ॥

[রাগ—তুড়ী]

না যাইমু রে মুঞি মথুরার হাটে
নাও ফিরাই মোরে দে। ধু
একে ভাঙ্গা নাও কিবা বৈটা বাও
চৌদিকে উঠএ পানি।
একি পরিহাস জাতিকুল নাশ
ধনে প্রাণে দোঁহো হানি॥
মুঞি অভাগিনী চড়িলুঁ নাও খানি
কানু ধরিয়াছে খেবা।
হেনহি সময়ে ঝড়ি বরিষএ
বাতাস চালাইল দেবা
প্রভাত সময় চড়িলুঁ নৌকায়
বহিয়া গেল রে দিন।
জর্জর তরণী খরতর ঢেউ
বাইয়া বল বড় হীন॥
দধি দুগ্ধ ননী উচ নীচ ভেল
সব হই গেল ঘোল
যে ঘাটে আছিল কানুর নৌকা
সে ঘাটে নি মোরে তোল।[১]

॥ অভিসার ॥

॥ ১৬৯ ॥

[মাধবী]

বিনোদ আজু যাও ঘর
তোরে খাইব বাঘে সাপে কলঙ্ক হৈব মোর
উঠানেত হাঁটু পানি সমুখে গড়-খাই।
সোনা হেন কায়া খানি রাখিমু কোন্ ঠাঁই
ধরেত খসুয়া কুকুর চৌদিকে মাদার।
কেমতে হইব বাহির ঘর হৈতে আমার।
ঘরে আছে ননদ জা'ল, বিনোদ,
আর বাপ ভাই
মাঝিয়ালে সুতিয়াছে ভাগিনী জামাই।
তোমার বাড়ী যাইতে বন্ধু পন্থ বহু দূর
মুই নারীর বাড়িতে আছে ভুখিলা কুকুর।
কহে সৈয়দ আইনুদ্দিনে মন কর শান্ত
এক চিত্তে প্রভু ভাব মিলাইব কান্ত।

১ এটি পীর মোহাম্মদের পদের প্রায় অনুরূপ।

॥ ১৭০ ॥

[মল্লার]

নাইহরের বন্ধুরে দেখি আজু কেনে মান।
এ বুক বিদরে দেখি মলিন বয়ান ॥ ধু
মুখে মুখ দিয়া পতি করিছে শয়ন।
তিলে তিলে ননদী জাগএ গুরুজন ॥
এ মেঘ আন্ধার রাত্রি গহন প্রবেশ।
হাতে প্রাণ লই আইলু' কি কহিমু বিশেষ
কহে সৈয়দ আইনুদ্দিনে পহু' নিঠুরিয়া।
আজু পতি পাইলে সে না দিমু ছাড়িয়া ॥

॥ ১৭১ ॥

কালা রে মোর মনোহর রসের গুননিধি
এত রূপ গুণ দিয়া সৃজিলেক বিধি। ধু
বন্ধু, এ মেঘ আঁধার রাত্রি বিজলীর ছটা
ধীরে ধীরে বাড়াও পাও পিছল হৈছে ঘাটা।
এ মেঘ আঁধার রাত্রি ভুজঙ্গিণী চরে
ভাল মন্দ হৈলে বন্ধু খোঁটা দিবে মোরে॥
এ মেঘ আঁধার রাত্রি আর বাঘের ভয়।
বন্ধুয়া আসিবে করি মোর মনে লয়।
এ মেঘ আঁধার রাত্রি আর আসিছ ধাইয়া।
কতদুঃখ পাইয়াছ বন্ধু অভাগীর লাগিয়া ॥
এ মেঘ আঁধার রাত্রি গহীন প্রবেশ
এত রাত্রি আইলা বন্ধু কি দিমু উদ্দেশ ॥
কহে শ্রী আইনুদ্দিনে বন্ধু নিঠুরিয়া।
আজ সে পাইলে পতি না দিমু ছাড়িয়া ॥

॥ ১৭২ ॥

[মালব]

কালা মনোহর বন্ধু রস গুণ নিধি
এত রূপ গুণ দিয়া সৃজিয়াছে বিধি। ধু
এ মেঘ আন্ধার রাত্রি বন্ধু কেহ নাহি সাথে
একেলা আসিছ বন্ধু প্রাণি লই হাতে।
এ মেঘ আন্ধার রাত্রি বন্ধু বিজলির ছটা
ধীরে ধীরে বাড়াও পাও
পিছল হৈছে ঘাটা।
এ মেঘ আন্ধার রাত্রি বন্ধু ভুজঙ্গম চরে
এতরাত্রি আইলা বন্ধু লইয়া যাও মোরে।
ঘর খানি ভাঙ্গা-চোড়া দুয়ারখানি নড়ে
কোন ছলে বাহির হৈমু দেখা দিতে তোরে
এত রাত্রি আইলা বন্ধু শয্যা নাহি পাটি।
যদি বন্ধুর দয়া থাকে শয়ন কর মাটি।
রাধারে অঞ্চলে বান্ধি লই যাও মোরে
পন্থেত রান্ধিয়া ভাত যোগাম তোমারে।
সৈয়দ মর্তুজা কহে মনেত ভাবিয়া
মন পোড়ে তন ঝুরে ঐ কালার লাগিয়া।

॥ ১৭৩ ॥

[পটমঞ্জরী]

এত রাতে কেন রাজ পন্থে রে,
ওরে রাধারে বল।
এত রাতে কেন রাজ পন্থে রে। ধু
একেত আন্ধার রাতি,
কেহ নাহি পন্থের সাথী
চোরা বলি মারিব তোমারে।
তুই বন্ধু আসিবি করি
দুয়ারে না দিলুম বারি
ধন এড়ি যৌবন কৈল চুরি
পালঙ্গে না ছিলুম নারী
ফুলের পালঙ্গ হইয়া গেল খালি।

॥ ১৭৪ ॥

[ললিতা রাগিনী]

আজ নিশি যাইমু বন্ধুর বাড়ি
অবলার বন্ধুরে। ধু
কিসকে তোল রে বন্ধু নাতুরী চাতুরী
সেই না শোকে বন্ধু তুপরে বসি রান্ধি
তুমি যমুনায় বোল আসিছ কি কারণ
কাপড় পরশ্যা হইয়াছে রাধে।
ও বেটি ধোলার ঝি ভাল, মাইনয়্যের বেটি
একটি কথা পুছার না লম লাজে।
তুমি মোর খাও মাথা সত্য করি কহ কথা
কাপড় পরশ্যা হৈছে রাধে।
আম ধরে গোল গোল কদম্ব ধরে ফুল
তেঁতুল খানি ধরে বাঁকা বাঁকা
তোমার চোকতা খানি কত পরিমাণ
কাপড় তুলিয়া দেখাও মোরে
অমাবস্যা পূর্ণিমা তাহাকে পাইল রে
তাতে দেখম নারীর মুখ।
আমিত অবলা নারী
কাপড় তুলিতে নারি তুমি নি পারিবা
ধরাতে বুক।

॥ ১৭৫ ॥

[রাগ ধানসী]

বন্ধুর ভাবে জাগিতে চাপিল কাল ঘুমে। ধু
ধরিয়া মোহন বেশ মন্দিরে কানু পরবেশ
বিনোদিনী শুতি আছে সিংহাসনে।
ঘুমের আলসে রাই নিদ্রাতে চৈতন্য নাই
কোরে কানু রাধা নাহি জানে।
অধরে অধর দিয়া শ্রুতিমূলে কথা কৈয়া
শুন রে রমণী ধনি রাই।
অঙ্গের সৌরভ পাইয়া
গাওখানি মোড়া দিয়া
উঠে রাধে চান্দমুখ চাই।
শুনিয়াছি রাধিকা রাই গোকুলে বসতি নাই
ব্রজকুলে বোলে হরি হরি।
সৈয়দ মর্তুজা কয় রাধা কলঙ্কিনী হয়
ঐহি ভাবে ঝুরি ঝুরি মরি।[১]

॥ ১৭৬ ॥

[রাগ বড়ারি]

ধীরে ধীরে বাড়াও
এ মেঘ আঁধার রাত্রি বাঘের বড় ভয়
তুমি বন্ধু আসিবে করি মোর মনে লয়।
এ মেঘ আঁধার রাত্রি ভুজঙ্গিনী চরএ
নবীন জলের মৎস্য ধরিতে নামএ।
এতো রাত্রি আইলা বন্ধু
লইয়া যাও মোরে।
পন্থেতে রান্ধিয়া ভাত যোগাইম তোমারে।
এত রাত্রি আইলা বন্ধু
শয্যা নাহি মোর পাটি
মোরে যদি দয়া থাকে শয্যা কর মাটি।
সৈয়দ মর্তুজা কহে রাধা প্রাণের বৈরী
দেখিলে ধৈরজ ধরে না দেখিলে মরি।

[১] দ্বিজ রঘুনাথের ভণিতায় প্রায় অনুরূপ একটি পদ আছে।

।। মিলন ।।

।। ১৭৭ ।।

[বিভাস]

[ঝামর কেন রে দেখি হরি নন্দ হুলাল]
ঝামর দেখি নন্দের কানাই
ঝামর কেন দেখি। ধু
নন্দের নাগর গুণের সাগর
ঝামর কেন রে দেখি।
রাধা-ব্রজহরি, সখী সবে বেড়ি
রাধার কাননে করে কেলি।
চূড়ার উপরে মালতীর মালা
প্রভাতে নীহার ঝরে।
পীত ধড়া গাছি ধরিতে ধরিতে
খসিয়া খসিয়া পড়ে।
রঙ্গের রঙ্গিয়া রজনী জাগিয়া
আছিল বিবিধ আশে।
ছুটিয়া যাইতে ঢলিয়া পড়িল
মদন মোহন লাসে।
আমি একেলা নারী বন্ধুর ভাবে মরি
চিন্তা না করিয়ে মন্দা।
সৈয়দ মর্তুজা কয়, পর কি আপন হয়
প্রেমে মজি সবে করে ধন্দা।

।। ১৭৮ ।।

[আশাবরী বা গোড়ী]

[নন্দ আসি জয় দেয় রে, আমার গোপল
আইসে ঘর। ধু]
মনেতে আনন্দ অতি ঘরে কেহ নাই
আজ রাধার শুভ দিন মিলিল কানাই।
অপরূপ বিপরীত কি বলিব কারে
নানারূপে করে কেলি ভ্রমরা না ছাড়ে।
জল নাহি কলসে যমুনা বড় দূর
চলিতে না চলে রাধার চরণে নূপুর।
ভৃঙ্গারের জল দিয়া পাখাল দুই পাও
গঙ্গার জল সাঁচরি বন্ধুরে করি বাও।
কহে সৈয়দ সুলতানে মনেতে ভাবিয়া
পার কি আপনা হয় পিরীতি লাগিয়া।

।। ১৭৯ ।।

[সুহি সারঙ্গ]

আজু সুখের নাহি ওর
আনন্দে মন বিভোর
শ্রীপতি আসে চিত্তের মানসে
নাগর সদন মোর। ধু
কাক পিক শশোদর চন্দন ফুলে ভ্রমর
আছিল অহিত এবে ভেল মিত
বহুল বাহিনী সঙ্গ বিরহ মত্ত মাতঙ্গ
মধুরি মদন শর রঙ্গ
হরি দরশনে অঙ্গ পরশনে
সসৈন্য হইল ভঙ্গ।
সুধারস গুণনিধি আনি মিলায়ল বিধি
বহুল যতনে দেব আরাধনে
ভেল মনোরথ সিদ্ধি।
রূপে তুমি পঞ্চবাণ নানা রসে অবধান
শ্রীযুত মাগন আরতি কারণ
হীন আলাওল ভাণ।

।। ১৮০ ।।

[দেশকারী]

বৃন্দাবনে রাধা-কানু রঙ্গের রঙ্গিয়া। ধু
তুমি তো চিকণ কালা রূপেত মোহন

কনক বরণ রাধে মিলিছে আপন।
রাধা বালা পূর্ণশশী. কানু পূর্ণ চাঁদ
একি অপরূপ রাধে চাঁদের উপরে চাঁদ।
রূপেত নৈরূপ বসে রূপে অনুপাম
রূপনাথ কেলি করে রাধা-কৃষ্ণের নাম।
কহে সৈয়দ আইনুদ্দিনে হেরি রূপপুর
সব রূপ একি রূপ রূপ কি মধুর।

॥ ১৮১ ॥

[রামক্রিয়া]

সই দেখ রে রঙ্গ কেলি
এ নাট মন্দিরে নাচে রাধা-বনমালী
খেলে রাই-কানু মিলি দুই তনু
সই রূপে উজলএ জিনি কোটি ভানু
ক্ষেণে ক্ষেণে শ্যাম নাগর গোকুলে ব্যাপিত
শ্যাম রূপ হেরিয়া রাধা হরষিত।
কহে সৈয়দ আইনুদ্দিনে আনন্দ কথা
শুনিতে শ্রবণে সুখ গাও যথা তথা।

॥ ১৮২ ॥

[বরাড়ি]

আজু ল পহুঁ দেখিয়ে আনন্দ চিত
কমল নয়ান অমল বয়ান
মোহন চান্দ বিদিত। ধু
এ ঘোর মন্দির উঝল করিল
অনন্ত আনন্দ ভেল
পিয়া দরশনে যত দুঃখ মনে
ধন্দ হই চলি গেল।
বহু দিনে নিধি আনি দিল বিধি
আনন্দ কি উপাম।
চিত্ত পুলকিত তনু উলসিত
হরি পহুঁ গুণ ধাম।
শাহ আইনুদ্দিন সো পহুঁ প্রধান
দেখি আনন্দ পরাণ।
হীন মনোহর মাগে জুড়ি কর
মোকে দেয় দয়া দান।

॥ ১৮৩ ॥

[বসন্ত]

বরজ কিশোরী ফাগু খেলত রঙ্গে
চুয়াচন্দন আবীর গোলাব
দেয়ত শ্যামের অঙ্গে।
ফাগু হাতে করি ফিরত শ্রীহরি
ফিরি ফিরি বোলত রাই।
ঘুমট উঠায়েঁ বয়ান ছাপায়ত
বেরি বেরি যৈছে মেঘসে চাঁদ লুকাই।
ললিতা একা সখী ফাগু হাতে করি
দেয়ত কানু নয়ানে।
বৃকভানু কিশোরী দুঁহু বাহু ধরি
মারত শ্যাম বয়ানে।
আওর এক সখী জীউ জীউ করি
কাঁহা লাগাও আবীর।
কমরি ফাগু লেই কান নয়ান বেরি বেরি দেয়ত
হা হা করত কবীর।

॥ ১৮৪ ॥

[বরাড়ি]

গোকুলে আজু আনন্দ অধিক ভেল।
বহু আরাধনে শ্যাম দরশনে
দুঃখ দয়া দূরে গেল। ধু

আজ হোস্তে যতি গোকুলে বসতি
আকুল ব্যাকুল ছিল।
বঁধু আগমনে হরিষ বাজনে
আনন্দিত হই গেল।
সবহি গোকুল উৎসব মঙ্গল
ঝুম ঝুম শবদ উল্লাস।
জয় জয় রোল আনন্দ উল্লোল
দশ দিশ হইল উক্কাস
আসাউদ্দিন কহব এ নব উৎসব
রাখিহ প্রভু চির দিন।
মন মনোরথ হইল পূর্ণিত
সহায় শাহ আইনুদ্দিন।

॥ ১৮৫ ॥

নিশি হৈল শেষ রে প্রাণের বন্ধু
নিশি হৈল শেষ। ধু
রাত্রি পোহাইয়া যায়, কোকিলে পঞ্চম গায়
নিদ্রাতে পাইয়াছে বড় সুখ।
অভাগিনী বসিয়া রে নিশি গোঁয়াইলুম
উঠ এবে দেখি চান্দ মুখ।
আমার মাথাটি খাও উঠ এবে ঘরে যাও
কাকুতি করিয়া বলি তোরে।
রাত্রি প্রত্যূষ হৈলে লোকে দেখিব তোরে
কলঙ্কিনী করিব আমারে।
কলঙ্ক রাখিলে মোর ভাল না হইবে তোর
মোর রৈব জনমের খোঁটা।
আমি নারী অভাগিনী এই দুঃখে দহে প্রাণি
ননদিনী হৈল মোর কাঁটা।
ফকির ওহাব কয় প্রাণি দিবার মনে লয়
তিলেক না দেখি চান্দ মুখ।

॥ ১৮৬ ॥

শরমে শরম পলায়ে গেল
রাই-কানু দুটি তনু যেমন দুটি জলে
মিলায়ে গেল।
চাঁদের কোলে চকোরী
না সুধায় ডুব্যা অবশ হল।
সে সুধার পাথারে পথ না হেরিয়ে
জনমভর ডুব্যা রহিল।
গরীব তাই দেখার লাগি মনের দুঃখে
মন গুমরি পাগল হল।
সে রসের পাথার পেল না কোথায় শেষে
অঘোর ভূঁয়ে পড়ি যে মল।
জানি কার রূপ পাথারে
ডুব্যা চাঁদ উদয় হয়েছে
যেমন করে বাসত ভাল
সে ওর মন মত আছিল
ও মন আছিল রূপের কাছে।
গরীব কয় ধরমু বলে ডুব্যা পেলে না
তাই ক্ষ্যাপি নদেয় এসেছে।

॥ ১৮৭ ॥

[বেহার]

আলো রাই সঙ্গে নিবা নি মোরে। ধু
হরির সঙ্গে রাধা সখী করয়ে বিহার
হরির পদে নেও মোরে সঙ্গেতে তোমার।
আকাষ্ঠা কাষ্ঠের নাও খানি যমুনার মাঝ
কাঙ্কাকুরা কালা নিশান শুধু রাধার সাজ।
আঁখির মাঝে আঁখি গুলি
রাই নিরখিয়া চাও
নায়ের মাঝে আছে হরি চরণে নেপুর দেও

কর্ণের মাঝে কর্ণ দিয়া রাই নাসিকায়
দাঁড় বাইও
মুখের মাঝে মুখ দিয়া
রাই হরির মধু খাইও।
গলই মধ্যে নায়ের পন্থ রাই স্বর্গমুখে যায়।
সুপন্থে চলিলে রাধা হরির লাগ পায়
কহে বাণী গোলাম হুছন রাই
রূপের ভমরা
দেখিলে জীবন ধরে না দেখিলে মরা।

॥ ১৮৮ ॥

বায়ে সখিগণ বিবিধ বাজন
বায়ে অতি অনুপাম রে।
মৃদঙ্গ চঙ্গ উপাঙ্গ সুমধুর।
সপ্তসুর তিন গাম রে।
কোই নাচত তাল বজায়ত
নাচত শ্যামা শ্যামে রে।
আনন্দে তরঙ্গিত বহই যমুনা
এ রূপ সখি সুখ ধাম রে।
নব সাগর কানু রাধা তরুণী
নবজলধর কিয়ে শোভিত দামিনী
মোহিত নারদ সুর নর মুনি
মোহিত ব্রহ্মা শঙ্করে।
চাঁদ কিরণহি বিকসি কুমুদিনী
শোভিত সুভগ সরোবরে।
হংস সারস তবকী তাণ্ডব
ডাহুকি শবদ মনোহরে
সালবেগ পিয় নিরখি লাবণি
বরণি নহি কছু যাও রে।

॥ ১৮৯ ॥

[কর্ণাট রাগ]

কালা চান্দ কালা চান্দ চিকণ কালিয়া।
কালিয়া নাগর বৈসে রহিছে জড়িয়া। ধু
নিকুঞ্জ কাননে রাধে গোপীর পসায়।
মৃগ মদ বেচে রাধে কানু বনিজায়॥

॥ ১৯০ ॥

[রাম গরা]

ঝলক নাচে মোর রঙ্গ শ্যাম। ধু
চৌদিকে দেয়ালি দিয়া করতালি
রসবতী আনন্দ বিভোর।
রূপে ঝলমল নয়ানে কাজল
পিষ্টে দোলে পাটকি ডোর
চূড়াটি বানাইয়া বামে টালাইয়া
ধেনু চরাইতে যায়
যতেক গোপিনী কাম তরঙ্গিনী
সঙ্গে রঙ্গে গীত গায়।
কহে ফতে খানী যো হি পাইল ধনি
সোহি পুরুখ বর জান।
পূরল মনোরথ সকল কলাবত
শ্রী আলাওল খান।

॥ ১৯১ ॥

[রাগ কয়াট]

দেখ সখি আজু নিশি রঙ্গ
শুইয়া ছিলুম বন্ধুর সনে
জড়ি অঙ্গে অঙ্গ।
আজুকা বন্ধুর সনে নিশি কৈলুম ভোর
বন্ধুয়ার পঞ্চম সুরে হিয়া জর জর।

মোর অঙ্গে লাগিয়াছে সুগন্ধির স্বর
না বুঝিয়া মোরে বোল প্রেমের কাতর
নিশির সময়ে ঋত হইল প্রকাশ
হেন সমে প্রাণকান্ত আইলা মোর পাশ।

॥ ১৯২ ॥

আঁখি যুগ প্রভাকর সুন্দর বদন
সব প্রিয়াগণ সঙ্গে খেলে বৃন্দাবন। ধু
চারিপাশে শশিমুখী দেখিতে বিরাজ
মন সুখে প্রিয়া সঙ্গে খেলে বৃন্দাবন মাঝ।
একা কানু সহস্র গোপী করিয়া মণ্ডলী
মাঝে থাকি নাট করে, বাজায় মুরলী।
যত ফুল শঙ্খ সিঙ্গা কার কার হাতে
বসনে ভূষিত তনু শিখি পুচ্ছ মাথে।

॥ সম্ভোগ ॥

॥ ১৯৩ ॥

দূরে থাকি বাজাও বাঁশি ঘরে বসি শুনি
বাঁশির স্বরে বাহির হইলুম পাছেরে ননদিনী
কোলের ছাবাল কাঁদে থুইয়া আইলুম ঘর
কোটি কোটি নমস্কার বাঁশি ক্ষেমা কর।
জল ভরিতে যায় রাধা যমুনার তীরে
কাঁখেত কলসী করি কথা কহে ধীরে।
হেন কুঞ্জ মঞ্জু করি করিল সাজনা
কানুরে করিল দান যজ্ঞের দক্ষিণা
এক জল ভরিতে রাধা আর জলেত যায়
ভিজা বসন রাধের ধূলা কেনে গায়।
তুমি না জান ননদিনী সে ঘাটের বেভার
কাঁখেত কলসী রাধা খাইয়াছে পাছার
জিউ জিউ ননদিনী খাইও দুইটি আঁখি
শ্যামের চরণ সাধি আমি রাধে থাকি।

॥ মান ॥

॥ ১৯৪ ॥

তোর শরীরে দয়া নাই।
থাউক থাউক তোর মিছা পিরীত ভাই। ধু
ছুঁইও না ছুঁইও না মোরে তুই
বড় ছি ছি তোর লাজ কানাই।
বারে বারে দাগা কর
ছি ছি তোর লাজ কানাই
গোপনে করিলা পীরিত
তাই কিছু তোর মনে নাই।
কলঙ্কিনী করিয়া গেলি
কোন্ ভাইথাকির শলা পাই
নগরে বেড়াইয়া চাইলুম
তোর সমান বেবুঝদার নাই
হইয়াছম জগতের বৈরী
তুই বন্ধুর পীরিতির লাগি
হৃদে তোমার কালি কপট মিছা মায়া
মুখে ভাই।
সারারাত গোঙাইয়া ছিলা
কোন্ কামিনীর লাগত পাই।
কহে শ্রীকমর আলি শুন কামিনী রাই
এই ধন যৌবন দিলে
পরকে আপনা বানাই।

॥ ১৯৫ ॥

হাসি বুলি কণ্ঠ ধরি বাড়াই মিছা পিরীতি
ডুবাইলা শ্যাম অবলার জাতি। ধু
হৃদেতে কালি রাখিয়া শ্যাম
মুখে মিছা মায়া দিয়া পূরাইলা মনস্কাম।

লোকের বৈরী মোরে করি
ছাড়ি গেলা কুমতি।
আমার এখন একূল ওকূল
দোনকূল ডুবাইলা
কোন্ কামিনীর ফাঁদে গেলা,
ও নাগর কানাই।
আমার এই মনের দুঃখ কইমু কারে
কি জন্য নিদয়া জানি হইলা আমারে।
নিদয়া হৈয়া কেন কালা
না পূরাইলা আরতি
হীন বকসা আলীর বচন
রাখ রাধা শ্রীমতি।

॥ ১৯৬ ॥

শ্যাম কি করব তোর পিরীতে
পারলি না মোর মর্জি ধরাইতে। ধু
হাসি হাসি প্রেম করিলা আসি ব্রজেতে
লালস দিয়া যৌবন লুটি রৈলা মধুপুরেতে।
পুরুষের কপট মায়া না পারি বুঝিতে
ফাঁকি দিয়া গেলা মোরে
চন্দ্রাবলীর কুঞ্জেতে।
নারীর মন তুমি না পার রাখিতে
প্রেম পসরা লুট্যা চোরা আইসে না ব্রজতে
রাখাল জাতির এমনি ধারা
বুঝিলাম চরিতে।
হৃদে তোমার কালি কপট
মিছা মায়া মুখেতে
শ্রীকমর আলি কহে ভাবিয়া চাহ মনেতে
পর কভু আপনা হয় মিছা পিরীতে।

॥ ১৯৭ ॥

[প্রভাত]

বড় কঠিন তোর হিয়া
প্রাণের বন্ধু রে তুই বড় বিনোদিয়া। ধু
তুমি বড় বিনোদিয়া নিত্য নিত্য আসিয়া
কি টোনা করিলা মোরে
ঘটে না রয় মন সদা প্রাণ উচাটন
কেমনে পাসরিম তোরে।
তুই বন্ধুর প্রেম জ্বালা সদায় শরীর কালা
কৈমু মনের দুঃখ কারে।
মুই অভাগিনী এই তাপের তাপিনী
রহিতে না পারম ঘরে।
কলঙ্কিনী নারী ঘোষে জগৎ ভরি
ননদী বোলে বিপরীত।
লাগাই প্রেমের ফাঁসি হস্তে রাখিছ রশি
সদায় খিচ নারীর চিত।
শ্রীকমর আলি বাণী শুন ওহে সুবদনী
পুরুষের কঠিন হিয়া
মধু খাইয়া গেলে পুনি না আইসে ফুলে
জাতিকুল যায় ডুবাইয়া।

॥ ১৯৮ ॥

[কোড়া]

বসন্ত আইল প্রাণের বৈরী তোর,
তোরা দেখ লো সখি রে
বসন্ত আইল প্রাণের বৈরী।
আইল বসন্ত ঋত ফুল ফোটে সুললিত
মধু লোভে গুঞ্জরে ভ্রমরা
কামিনী পরশে ভানু কামে অঙ্গ দহে তনু
বৃন্দাবনে ফুটিছে কমলা।

আইল শিশির বৈরী অঘোর গম্ভীর করি
নিশি দিশি নাহি মেলে আঁখি
দাহুরী কামদ গায় ত্বরিতে নয়ান ধায়
শুনি কহে বৃকভানুর সুতা।
অঘোর সাঁজুয়া বেলা
কি বোল বলিয়া গেলা
যদি না আসিবা ছিল মনে।
এক কহ আর হয় এমন উচিত নয়
এত দুঃখ কেন দাও মোরে।
বহুল যতন করি শয্যা সাজাইলাম নারী
নানান সুগন্ধি পুষ্প দিয়া
বাটায় তাম্বুল ভরি অষ্ট অলঙ্কার পরি
সব নিশি জাগিলাম বসিয়া।
যখনে পিরীতি কৈলা ·
রাত্রিদিন আইলা গেলা
ভিন্ন ভাব না আছিল মনে।
সাধিয়া আপনা কাজ কুলেতে রাখিয়া লাজ
এবে সে না চাহ চোখের কোণে।
তোমার কঠিন হিয়া আনলেতে কাষ্ঠ দিয়া
কোথা গিয়া রহিলা ভুলিয়া।
অধীন হাসমত বলে জল ঢাল সে আনলে
নিবারহ প্রেম-রস দিয়া।

॥ ১৯৯ ॥

[না গোধা ভাটিয়াল রাগ গান্ধার]

কামিনী না কর গুমান ধনি
যৌবন রূপ-ধন না রৈবে নিদানি। ধু
আমার বচন তোমা না সাধিলা কাল।
অবসর গেলে পাছে ঠেকিবে জঞ্জাল।
না হকে বুঝল সখী তোমা নাহি গেয়ান
আসিতে যাইতে আসে
নিশি শেষে বেয়ান।
কহে মছন তাজ সখি শুন দিয়া কান
সুপুরুষের বোল কভু না টালিবে জান।

॥ ২০০ ॥

[কাফি]

শ্যাম, এই আছিল তোর মনেতে
তবু কেনে প্রেম কৈলা গোপতে। ধু
জাতিকুল মান গেল শ্যামের পিরীতে
তোর পিরীতে কলঙ্কিনী হৈলুম জগতে।
যখন গেলা বৃন্দাবনে ধেনু চরাইতে
বংশী স্বরে প্রেমবাণ হান্যাছ মোর বুকেতে
বিরহিনী একাকিনী থাকি ব্রজেতে
কার ভাবে ভুলাছ মোরে নাই গো
তোমার মনেতে।
কাঙ্গালিনী কৈলা মোরে ব্রজকুলেতে
গোপাল জাতির এমনি ধারা,
দয়া নাই তোর মনেতে।
সেই ভোমরা মাখন-চোরা
আসবে মধু পানেতে।

॥ ২০১ ॥

[দীপক]

গেলা গেলা অরে শ্যাম না গেলা বোলাই
আরে ওরে শ্যাম গেলা কোন দেশ। ধু
আকাশরে চাঁদ পিয়া নয়নের মণি
আসিবা আসিবা করি গোঁয়াইলুম রজনী।

চান্দের চন্দন দিয়া সূর্যের বাতি
যদি চান্দে করে দয়া আজুকার রাতি।
আউলাইয়া মাথার কেশ কভু নাহি বান্ধে
রাধা কানু অভিমানে গোপিনী সব কান্দে।
আড়ালা চাউলের ভাত ক্ষীর নদীর পানি
জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠে হৃদের আগুনি।
কানু যাইব শ্বশুর বাড়িত মনে লাগে ধান্দা
রাধার হাতে মোহন বাঁশি
থুইয়া যাউক বান্ধা।
সোনা নহে রূপা নহে অঞ্চলে বান্ধি থুইতুম
হৃদের 'পরে থুইয়া বাঁশি রজনী
গোঁয়াইতুম।
সৈয়দ মর্তুজা কহে শুন পরবাসী
মনের মাঝে আছে বুলি তারে বলি বাঁশী।

॥ ২০২ ॥

[সুহি বোলোয়ার]

শ্যাম মোর বন্ধুয়া না রে! ধু
পাহায় চড়াইনু ক্ষীর প্রাণ মোর নহে স্থির
বিভোল দুগ্ধেত দিলুঁ পানি না রে।
যে খনে পিরীতি কৈলা
রাত্র দিনে আইলা গেলা
কার বোলে তুমি নিঠুর হইলা।
যাহাতে মজিল মন কিবা হাড়ি কিবা ডোম
যাউক জাতি রহুক পিরীতি।
মুই কেনে যমুনায় আইলুঁ পাই নিধি
হারাইলুঁ
হারাইলুঁ মুঞি রসের নাগর।
সৈয়দ মর্তুজার বাণী শুন রাধে ঠাকুরাণী[১]
কাঞ্চা ঘুমে তোর কে দিল ভাঙ্গনি।

॥ ২০৩ ॥

[বিভাস]

সবাই বলে রাধার পরাণ কানাই
তুমি রজনী বঞ্চিলে কোন্ ঠাঁই। ধু
কেমন বেসাল চূড়া শ্রবণে তুলিছে
খুলিতে নার দুটি আঁখি
হব না মথুরা গতি কি কব চূড়ার ভাতি
শ্যাম অঙ্গে লাগি আছে সাক্ষি।
কুঙ্কুম কস্তুরী আর সুগন্ধি তাম্বুল
থুইয়াছিলুঁ শিয়র উপরে
'হা হরি হা-হরি' করি
জাগিয়া পোহানু নিশি
তুমি ছিলে কাহার মন্দিরে।
শেখ ভিখনে ভণে বড় দুঃখ রাইয়ের মনে
পাসরিলে পূরব পিরীতি।
আমার করম দোষে তুমি থাক অন্য পাশে
হোক মনে রাধার মিনতি।

॥ ২০৪ ॥

[রামগড়া]

রে শ্যাম বিশেষ চাতুরী ছোড়
কপট না কর কোঁর। ধু
আছিলা কোথায় শ্যাম সুধাময়
স্বরূপে কৈয়ার এথা।

১ সৈয়দ মর্তুজা কহে পর কি আপনা হয়
মিছা কাজে জনম গোঁয়াইলুম।

হামো পরিহরি কার সনে নিশি
রজনী গোঁঙাইলা কোথা।
নিশি উজাগর নয়ন রাতুল
বয়ান ঝামর ভেল।
কোন বিগদধি কামকালা নিধি
রস নিঠুরিয়া গেল।
অহোনিশি জাগি নিদে ডগমগি
নয়ান উহার সাখি।
যেহেন চকোর দেখি দিবাকর
উড়িতে নারএ পাখি।
সুরঙ্গ অধর কাজলে মলিন
সিন্দুর উঝল ভালে
বিম্বফল 'পর যেহেন ভ্রমর
সুর শোভে ঘন মালে।
আফজলে কহে ধনি দয়াময়
ও যুগ জীবন সার।
হেন গুণ নিধি চাহ নাকি আঁখি
আপে আপ পেখিবার।

॥ ২০৫ ॥

[সুহি সিন্ধুরা]

সই সই কহিতে খাঁখার প্রিয়ের বেভার
শুন প্রাণ-সই রে। ধু
কি মোর রান্ধন কি মোর বান্ধন
কি মোর হলদি বাটা।
মনের আগুণে বনে ত যাইমু
রাখিমু সোয়ামীর খোঁটা।
সে গাছে ধরে ফল নারাঙ্গী কমল
বাছুরে চুষিয়া খায়।
আমার সোয়ামী হালিয়া গোঁয়ার
সুতিলে সে নিদ্রা যায়।
সই সই, যাহার সোয়ামী রসিয়া নাগর
সে নারীর কিসের দুখ।
দিনের পাপখানি দিনেত খণ্ডাইব
দেখিয়া সে চান্দমুখ।
সই সই, বাপ না মায়ের কি দোষ দিমুরে
কুল চাহি দিল বিহা।
হাতে হাত ধরি গলায় বাঁধি দড়ি
সাগরে ডুবাইল নিয়া।
সই সই, কি মোর নিশি কি মোর দিশি
কি মোর এ রবি শশী
ঘরের সোয়ামী হাসিয়া না বোলাএ
মুঞি অপরাধী দোষী।
সই সই, না জানি কি দোষে
প্রিয় মোরে রোষে
নিদয় হৃদয় পিউ
কহে সিরতাজে সোয়ানী উদ্দেশে
সহজে তেজিমু জিউ।

॥ ২০৬ ॥

[রামকেলি]

কিরে শ্যাম, এমন উচিত নহে তোমার। ধু
আঘোর সাঁঝুয়া বেলা কি বোল
বলিয়া গেলা
সাঁচা যদি না আছিল মনে।
এক কহ আর হয় এমন উচিত নয়
এই দুঃখ না সহে পরাণে
যখনে পিরীতি কৈলা
দিবারাত্রি আইলা গেলা
ভিন্নভাব না আছিল মনে।

সাধিয়া আপনা কাজ কুলেতে রাখিয়া লাজ
ফিরিয়া না চাহ আঁখি-কোণে।
বহুল যতন করি শয্যা সাজাইলুঁ নারী
নানান বরণ পুষ্প দিয়া।
বাটায় তাম্বুল ভরি অষ্ট অলঙ্কার পরি
সারা নিশি পোহাইলুঁ জাগিয়া।
তোমার কঠিন মন মোরে হও বিস্মরণ
কুখেনে পিরীতি তোর সনে।
তুমি বন্ধুর কঠিন হিয়া অনেলেতে তৃণ দিয়া
কোথা গিয়া রহিলা ভুলিয়া?
মীর্জা কাঙ্গালী ভণে জল ঢাল সে আনলে
নিবাও লো প্রেম-রস দিয়া।

॥ ২০৭ ॥

[রামকেলি]

মরম দগধে প্রেমবাণে।
বন্ধুয়া রে, শরীর ভেদিল কামবাণে। ধু
তোমা সঙ্গে করি প্রেম
হারাইলুঁ জাতি ধর্ম
আর মরি লোক পরিবাদে।
তোমা কি কহিব বন্ধু আমার কপাল মন্দ
কি করিলা অই দীননাথে।
তোমার কঠিন হিয়া ভজ নানা নারী লৈয়া
কোথা গেলা বসি রৈনু আমি।
পালঙ্ক সাজাই নারী জাগিয়া কান্দিয়া পুড়ি
নিশি গেল না আসিলা তুমি।
কহে সৈয়দ আইনুদ্দিনে
প্রভু ভাব রাত্রি দিনে
মায়াজালে না করিও হেলা।
আমারে অনাথ করি তুমি যাও মধুপুরী
আর কি পাইব তব মেলা।

॥ ২০৮ ॥

[রাগ—আসোয়ারি]

মুনি মন মোহনে মানিনী মনে
মৃগেন্দ্র মাতঙ্গ মস্তকে মারল
মন হোহে মারে মদনে। ধু
মোহন মূরতি মণিময় মোতি
মনোহর মুখ-মুকুরে
মালতী মঞ্জুল মুকলিত মাল
মকরন্দ মত্ত মধুকরে।
মলয়া মারুত মধুকর মণ্ডল
মিলিত মৌলিত মাতে
মৃগমদ মলয়জ মঞ্জন মর্দন
সানন্দ মনমথ মাথে।
মথুরার মাঝে মন্দয় মন্দয়
মূরছএ মুরলী মধুরি।
মতি পির মোহাম্মদ মজিত মূরছিত
মানস মিলব মোহোরি।

॥ ২০৯ ॥

[রামগরা]

কার ঘরের নাগর তুমি কালিয়া সোনা
কার ঘরের নাগর তুমি। ধু
আউলাই কুন্তল মুখানি ঝাঁপিয়া রৈছ
ভালে চিনিতে নারি আমি। ধু
নয়নের কাজল বয়ানে লাগিছে
কোথায় ছিলা পরবাসী ঘুমের আলসি

হালি ঢলি পড়ে শুতি না ছিলা আজু নিশি
প্রেমের আনলে সকল শরীর জ্বলে।
কি হৈল জঞ্জাল দিয়া
হীন পোতনে কহে ওরে সোনার বন্ধু
কঠিন তোমার হিয়া।

॥ ২১০ ॥

বন্ধু কি কাজ তোমার এথা
যার সনে গোঞাইলা নিশি
চলি যাও তথা। ধু
আঙিনাতে উঠি বসি না ছুঁইও আমারে
পোড়া পাপে পর ছুঁতে
ধরিয়াছে তোমারে।
নিদ্রার আলসে রাএ ভুলাই আছে মাথা
হিঙ্গুল বর্ণ দুই আঁখি মধুর মধুর কথা।
সিন্দুরের বিন্দু বিন্দু কাজলের রেখা।
নবীন মেঘের আড়ে চান্দে দিল দেখা॥

॥ ২১১ ॥

[রাগ সারঙ্গ ভাঙ্কা]

সখী সব নিদে তু জাগাই কি করিব মোরে। ধু
আইল চিকন কালা সময় বুঝিয়া।
চাপিল পাপের নিদে মোরে শ্যাম ফেলাইয়া
দেখা না দিল গিয়া।
মরিমু মুই জলে ঝাম্প দিয়া।

॥ ২১২ ॥

এবে শুনিয়াছি কানু আরের বন্ধু হইলা
বন্ধুর পীরিতি খানি কুমারের পোবনি
উপরে লেপনি দিয়া অন্তরে আগুনি।

॥ বিরহ ॥

॥ ২১৩ ॥

[নটগান্ধার]

মন মোর কি দিয়া বান্ধিমু
আজু কালু করি মন কতেক ভাঁড়িমু॥ ধু।
উঠিল তরঙ্গ ঢেউ প্রাণি থর থর
প্রিয়া বিছোড়নে লোর ঝরে নিরন্তর॥
আপনা করমের দশা কি বলিমু কারে।
খেমা কর অপরাধ কৃপা কর মোরে॥
সৈয়দ মর্ত্তুজা কহে তেজিলুঁ সংসার।
পরাণের বৈরী হৈল পিরীতি তোমার॥

॥ ২১৪ ॥

[রামক্রিয়া। মালশী]

সখি নাগর কানাই বিনে
আর জীব না রে। ধু।
প্রিয়া প্রিয়া করিয়া বালিস দিলুম কোড়ে
উলটি পলটি দেখি প্রিয়া নাই মোর ঘরে॥
কলসীতে জল নাই যমুনা বহুদূর।
চলিতে না পারি আমি চরণে নেপুর॥
ঘরে আছে গুরুজন তারে না ডরাই।
মনের ভরমে মুই কানুরে হারাই।
কেহ বোলে কালা কালা কেহ বোলে শ্যাম।
মুসলমান কলমা পড়ে হিন্দু বোলে রাম॥
সৈয়দ মর্ত্তুজা কহে প্রেম অনুদিন।
রাধা-কানু এক প্রাণ শরীর মাত্র ভিন॥

॥ ২১৫ ॥

[রাগ-অহির]

মালিনি রে লই যা রে তোরধু ফুল।
সোয়ামী ঘরেত নাহি চিত বেয়াকুল॥

এক হাতে সর শঙ্খ আর হাতে ক্ষীর।
একলি শয়নে মোর আঁখি বহে নীর ॥
গলার গলিয়া মোর শিষের সিন্দুর।
কেবা হরি নিল মোর পায়ের নেপুর ॥
মন্দিরে আছএ মোর খাট সিংহাসন।
কোন্ বিধি হরি নিল গায়ের উড়ন্ ॥
চারিমাস বরিষা মুঞি আছিলুঁ ভাল।
মাঘ ফাগুনের শীতে বুকে লাগে শাল।
কাহাকে না পাম লাগ কহিয়া পাঠাম।
আনল গরল বিষ খাইয়া মরি যাম।
সৈয়দ মর্ত্তুজা কহে করমের পাক।
তম গেলে হরি আইলে
পাইবা পহুঁ লাগ।

॥ ২১৬ ॥
[বিরহ শঙ্কা]

আড়ালা চাউলের ভাত ক্ষীর নদীর পানি
জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠে হৃদের আগুনি।[১] ধু
বন্ধু যাইব দূর দেশে মনে লাগে ধান্ধা
বন্ধুর হাতের মোহন বাঁশী থুইয়া
যাউক বান্ধা।
সোনা নয় রে রূপা নয় রে অঞ্চলে বান্ধিতাম
হৃদের উপর থুইয়া বাঁশী
রজনী গোঁয়াইতাম।
প্রিয় মোরে বিস্মরণে তিলে যুগ জানি।
প্রিয় বিনে জীবন হৈয়া গেল কানি।
যথা তথা যাইও বন্ধু আসিও সকালে।
তিলেক বিলম্ব হইলে ঝম্প দিব জলে।
সৈয়দ মর্তুজা কহে ওহে পরবাসী
পঞ্চদিন লাগিয়া কেন এত উপহাসি।
আকাশের চন্দ্র প্রিয় নয়ানের মণি
আসিবা আসিবা করি,
পোহাইলাম রজনী।

॥ ২১৭ ॥
[রাগ ধানসী]

দারুণ প্রিয় হামো না বানাএ।
দারুন জীউ মোর ধরান না যাএ। ধু।
একহি শাশুড়ী মোর বহুল সতীন
সব ভেল ভাগ্যবতী হাম ভেল হীন।
বসন না রাখিমু অঙ্গে মুড়াইমু কেশ
ঘরে ঘরে প্রিয় লাগি করিমু উদ্দেশ।
শিঙ্গা ফুঁকি মুখে ডম্বুরু বাজাইমু।
দেশে দেশে প্রিয় লাগি
ভিক্ষা মাগি খাইমু।
সৈয়দ মর্তুজা কহে হাম অভাগিনী।
জীবনের সাধ নাই তেজিমু পরাণি।

॥ ২১৮ ॥
[রাগ—জালালি]

কি আজু কুদিন ভেলিএ
ছাড়িয়া গোকুল নন্দলাল
মথুরা চলিয়া গেলিএ। ধু।
আজু মথুরা উঝল ভেলিএ

---

১ ওরে শ্যাম গেলা কোন দেশ
কোন দেশে গেলা ওরে শ্যাম না পাইলাম উদ্দেশ। ধু

গোকুল মলিন আজু রাত্রিএ।
মর্তুজা গাজীএ কহএ সারএ
নন্দসুত বাটোয়ার কানু নিশ্চএ।

॥ ২১৯ ॥

[বেলাবলী]

পলকে সখি রে, নিশি না পোহায়॥ ধু।
গগনে গর্জয়ে মেহু, শিখরে ময়ূর।
আমাকে ছাড়িয়া সখি রে প্রিয় মধুপুর॥
কর আঁখি স্বনে ডাকে রাধিকা সুন্দরী···
যে কাজে যমুনার ঘাটে কার সঙ্গে যাইব
কে দিব আনিয়া শ্যাম, কোথা গেলে পাব।
বাপে দিল জনম জননী দিল ক্ষীর
কহেন মর্তুজা আলি জনমের ফকির।

॥ ২২০ ॥

[রাগ কেদার]

আর নিবা কি বন্ধু রে আর নিবা কি।
তুমি দিবসে ভুলিলা জীবারে সাধ কি॥ ধু
ধন নিলা জন নিলা করিয়া নৈরাশ।
তরাসে ছাড়িয়া আইলুম নিজ গৃহ বাস॥
কি কহিমু মনের দুঃখ কহিতে বিশেষ।
কুমারের চক্র হইয়া ভ্রমি নানা দেশ॥
সৈয়দ মর্তুজা কহে দিয়া যদি নিলে।
সোণার বরণ তনু বিধি বিড়ম্বিলে॥

॥ ২২১ ॥

[রাগ বেলাবলী]

ভজ সখি নন্দ কিশোর
কেলি কলা রসে ভোর। ধু
গগনে গরজে মেহু শিখরে ময়ূর।
আমারে ছাড়িয়া প্রিয় রৈলা মধুপুর॥
অন্ন নাহি খায় সখি আন নাহি ভায়।
আঁখির পলকে সখি নিশি না পোহায়॥
বন্ধুরে পুছিও সখি জীবনের উপায়।
চান্দ মুখ দরশনে সখি নয়ান জুড়ায়॥
সৈয়দ মর্তুজা কহে সখি অকূল পাথার।
নদীয়ার কিনারে ঝুরি না জানি সাঁতার॥

॥ ২২২ ॥

[বসন্ত]

সব ঋতু সঙ্গে আইল রস রঙ্গ সহিত
বিরহিনী ক্ষীণ তনু মদনে চিন্তিত।
আইল বসন্ত ঋতু লইয়া নব শর
মনোজ সারথি লইয়া সঙ্গে···
তরু সব হরষিত সতত যে পুলকিত
দশ দিক শোভে নানা রঙ্গে।
ফিরএ কন্দর্পবর হাতে লইয়া ধনু শর
সমীর তুরঙ্গে সোয়ার।
নানা তরু লতা ফুলে শিরীষ চামর দোলে
ষটপদ যন্ত্রের ঝঙ্কার।
কহে আকেজল হিত বরিখে মাধবী ঋত
নিবারিতে কাম দুঃশাসন।
সৈয়দ ফিরোজ শাহা সুধাময় অবগাহা
ভজ সখি সুরঙ্গ চরণ।

॥ ২২৩ ॥

[রাম কচ্ছ]

প্রাণ-সই কি কহব হাম হতভাগী
দুঃসহ মদন শরে দহে মোরে নিরন্তরে
উটি বসি নিশি রহোঁ জাগি॥ ধু।

বসন্ত খরিএ গেল পাউকের ঋত ভেল
এবেহ না আইসে, পিউ মেরা।
ঘনঘন গরজন বিজুলি চমকে ঘন
দশ দিশে বহে ঘন ধারা।
কুলিশ দাদুরী নাদ পাপী অতি পরমাদ
কুসুম পরশে তনু কাম্পে।
মৃগমদ সৌরভ চন্দন পরিমল
পিয়া বিনে সকল সন্তাপে।
কিএ বিধি ভেল বাম পিয়া গেল দূর ধাম
তনু সে যৌবন গেল ভারা।
যদি সে না মিলে পিউ
আনলে তেজিমু জিউ
পিউ বিনে সব আন্ধিয়ারা।
কহে ফতে খানে সখি উপায় আছএ নাকি
শ্রীযুত ইব্রাহিম খান।
ভব কল্প-তরু জানহ আন্ধার
পীর মীর শাহ সুলতান।

॥ ২২৪ ॥

[কৃষ্ণ বসন্ত]

আহা কৃষ্ণ প্রাণনাথ কে নিল হরিয়া।
কান্দে সব গোপ-নারী গোবিন্দ ধেয়াইয়া
নন্দ কান্দে, যশোদা কান্দে, কান্দে রোহিণী
আহার তেজিয়া কান্দে বনের হরিণী।
না কান্দ না কান্দ গোপী স্থির কর মন
কংস বধিয়া কৃষ্ণ আসিব এখন।
জাতী যুথি মালতী পুষ্প দ্বারে লাগাইলুম
নিঠুর কালিয়ার সনে পিরীতি বাড়াইলুম।
ফুটিল মালতী ফুল গন্ধ গেল দূর
ছাড়ি গেল প্রাণ নাথ নিমায়া নিঠুর।
মীর ফয়জুল্লাহ কহে ধৈরজ ধরহ চিত
ফিরিব কানাই মনে না ভাবিহ ভীত।

॥ ২২৫ ॥

[পঞ্চম]

আ লো সখি কহ মুঝে কৈসে মিলায়ব কান
ঘটেত না রহে প্রাণ। ধু।
না জানি কি হৈল কি দিয়া কি কৈল
না জানি নসিবে আছে কি।
বিনি দোষে কালা দিলা এত জ্বালা
ঐ না দুঃখে প্রাণ যায় তেজি।
অবিরত পোড়ে মন কালা মোকে নিদারুণ
ভুলিয়া রহিলা ভিন্ন দেশ।
বিরহে দারুণ মদন দাহন
তনু ক্ষীণ প্রাণি শেষ।
চন্দন আগর শীতল মন্দির
কিছু না লাগএ অঙ্গে
হীন আলাওলে ভণে এহি না দুঃখ রহিল মনে
কানাইয়া দেখা না হৈল তোর সঙ্গে।

---

১ ক আঁখি কালা, পাখী কালা, কালা বনমালী
খঞ্জনের বুক কালা চিত্ত ধরাইতে না পারি।
মীর ফয়জুল্লাহ কহে কেলি কলা লাল
চারি খণ্ড ঘরখানি বঞ্চে মহীপাল।
খ কহে সৈয়দ আইনুদ্দিনে কেলির কারণ
রাধা সঙ্গে গোপী রঙ্গে খেলে বৃন্দাবন।

॥ ২২৬ ॥

[কুমারী]

উদ্দেশ না পাইলুম বন্ধু করিবারে সেবা। ধু
তোমার সুখের খবর কোথায় গেলে পাইমু
সেবিয়া তোমার পদ আর কিছু লৈমু।
যেখনে করিলা বন্ধু এ রাঙ্গা পিরীতি।
কি না দোষ দিয়া বন্ধু হইলা ভোরমতি।
কাহাকে কহিমু দুঃখ কে জানে বেদনা।
সঙ্গের সঙ্গিয়া ভাই কেহ নহে আপনা
হীন গয়াসে[১] কহে করিয়া আরতি
মুর্শিদ চরণ ভজ পাইবা নিজ পতি ॥

॥ ২২৭ ॥

[পহিড়া]

পবনা হে গমনেত না করিও বাধা
পঁহুরে কহিও দুখ বিদেশে কেমন সুখ
নারী বধে তেঞি ভেল সাধা। ধু
কনক অঙ্গুরী ছিল সে পুনি বলয়া ভেল
সে বলয়া হৈয়া গেল তাড়।
প্রভুরে কি দিমু গালি
না আইসে আজি কালি
পরাধিনী জীবন আমার।
যদি প্রিয় আইসে কালি প্রিয়কে
পাড়িমু গালি
পরাধিনী হইলুম নিপাত।
হীন গয়াসের বাণী প্রভু ভাব বিনোদিনী
অবশ্য মিলিব অকস্মাৎ।

১ হীন আমীরে কহে

॥ ২২৮ ॥

[ভাটিয়াল]

কিরূপে ধরাইমু প্রাণ প্রিয়া নাহি ঘরে
বৃন্দাবনে ভৃঙ্গ নাচে মলয়া সমীরে ॥ ধু।
ডালে ডালে কীরকে ফুকরে ঘন ঘন।
তা শুনি অবলার মন করে উচাটন ॥
পিক নাদে ঝি ঝি ঝাঁঝি উঠে ঝনকার।
নব যৌবনীর নব যৌবন বিকার ॥
কহে আইনুদ্দিনে সখী না চিন্তিও আর।
রজনী গঞিলে সাজ প্রিয়া ভেটিবার ॥

॥ ২২৯ ॥

[তুরি রাগ]

না দেখি রহিতে নারি ছটফট করে হিয়া
মুই নারী পাগল কৈল
না জানি কি দিয়া। ধু।
মনের আরতি মোর না পূরায় পিয়া।
হামো ছোড়ি দূরে যায় পিয়া নিঠুরিয়া।
মুঞি ভাবম পিউ পিউ পিয়া বাসে ভিন।
সহজে হইলুঁ দাসী প্রেমের অধীন ॥
পিয়ার উদ্দেশে দিমু জিউ বলিহার।
পিয়া বিনে মন্দিরেত না রহিমু আর ॥
কহে আইনুদ্দিনে সখি স্থির কর মন।
সতীহীন হৈয়া ভাব হইব মিলন ॥

॥ ২৩০ ॥

[রাগ পহিড়া]

মলয়ানিল বন্ধুতে কহিও পরণাম।
যাইতে নারি ডরে রিপুগণ আছে ঘরে।

দগ্ধএ হিয়া বাণ কাম।
সোয়ামি দুর্জন অতি শাশুড়ী চঞ্চল মতি
দেওরিয়া বড়ই চতুর
ভাই শ্বশুরে না বাসে ভালো
জায়ের বিষম জ্বাল
নিতি কহে বচন কঠোর।
সতিনী বিশাল অতি ননদিনী চাণক্য ভাতি
নূপুর আছএ মোর পায়
পদ অনুসরি যবে ঝনাঝুনি বাজে তবে
কোলের ছাওয়ালে কান্দে রায়।
যদি বন্ধু আইস এথা বিরলে কহিমু কথা
খণ্ডিব মনের দুঃখ ভার
সৈয়দ আইনুদ্দিনে কহে কিরূপে জীবন রহে
সুজন বিচ্ছেদ হয় যার।

॥ ২৩১ ॥

[নটরাগ—দীর্ঘছন্দ]

অ, কি মাধব আর রোষ ক্ষেমা কর মোহে।
না জানি কি কৈরাছি দোষ
তাত নাকি কর রোষ
করপুটে নিবেদহোঁ তোহে ॥ ধু ।
হাম কুল বিহিনী তুয়া নাম গুনি গুনি
রহল যামিনীবর জাগি।
এ নব যৌবন ভার সহিমু কতেক আর
সতত দহএ মন আগি ॥
এ চুয়া চন্দন মোহে গরল সে উগাহে
তুয়া বিনে আন নাহি জাগে।
করিয়া যোগিনী বেশ যাইমু মথুরা দেশ
পূরিবে মানস থাকে ভাগে ॥
শবদ শুনিয়া হাট ধাই আইলুঁ যমুনা ঘাট
তাত নাহি মাধবের দেখা।
হীন মনোহরে ভাণ ভজ গুরুপদ জান
ভাবিলে পাইবে, থাকে লেখা ॥

॥ ২৩২ ॥

[রাগ—নট সিন্ধুরা]

নিল মোর নাগর কে হরিয়া
কিরূপে রহিমু ঘরে কালারে
না দেখিয়া। ধু।
জীবের জীবন নাগর মোর সেই বন্ধুয়া।
যুগল নয়ন কালা মোর ভাল বন্ধুয়া ॥
বল বুদ্ধি জ্ঞান নাগর এ রঙ্গ রঙ্গিয়া।
রসের রসিয়া নাগর কে নিল ভাঁড়িয়া ॥
হেন যদি জানি নাগর যাইবে ছাড়িয়া
মনোহরে কহে হৈতুম তার সঙ্গে সঙ্গিয়া ॥

॥ ২৩৩ ॥

[রাগ গান্ধার]

আ লো রে পরাণের সই
নিঠুর কালারে আইনা মোরে দে।
মানাইয়া মোরে দে। ধু।
এতেক প্রকারে ভজিনু কালারে
যৌবন-ধন দিয়া দান।
নিঠুর কালাবর এবে না ভেল মোর
দৈবে সে তেজিমু প্রাণ।
জাতিকুল ছিল সব তেয়াগিল
তবেহ মোরে বিমতি।
নিঠুর কালাধনে আর না লয় মনে
না জানি কি হইবে গতি।

মোর নিবেদন শুন সখীগণ
কহিও বন্ধুর আগে।
দরশন দিতে শ্যাম কেন বা হইবে বাম
দেখিতে কতেক ধন লাগে।
মির্জা কাঙ্গালী ভণে
কেনে দুঃখ ভাব মনে
তোরে নাহি শ্যামের মন।
পরের পীরিতি খানি
ভাটিয়া জোয়ারের পানি
জানিলু˜ নিশির স্বপন।

॥ ২৩৪ ॥

কে মিলাইবো কে মিলাইবো
কে মিলাব কান।
ঘটেরে না রহে পরাণ। ধু
কি জানি কি হৈল কি দিয়া কি কৈল
কি জানি করমে আছে কি।
কিবা দোষে কালা দিলা এত জ্বালা
প্রাণি লইয়া যায় তেজি।
কি জানি এমন কালা নিদারুণ
ভুলি রহল দূর দেশ।
অনঙ্গ বেদন মদন দহন
তনু ছাড়ি প্রাণ শেষ।
এই চান্দ চন্দন শীতল মন্দির
আন না জুড়ায় অঙ্গ
হীন আক্কানে ভণে এ তিন ভুবনে
দেখ কানাই তোমার সঙ্গ।[১]

॥ ২৩৫ ॥

[বরাড়ী]

শুন লো সজনি কিছুই না জানি
কি বুদ্ধি করিব আমি।
তরিতে নারিব দৈবে মরিব
নিশ্চয় জানিও তুমি।
শয়নে স্বপনে শ্যাম বঁধুর সনে
সুখে গিয়াছিনু নিদ।
পাঁজর কাটি শ্যাম বঁধুরে কেবা
দিয়া নিল সিঁদ।
শয়নে স্বপনে ঘরেতে পিরীতি
করিনু শ্যামের সনে।
সেই হইতে মোর চিত বেয়াকুল
কিছুই না লয় মনে।
তোমারে কহিনু সখী পিরীতির এই রীতি
সদাই পর বশ দে।
শেখলালে কয় যে জন তাহার হয়
সে বিনে জানিবে কে।

॥ ২৩৬ ॥

[দেশকার]

বল কি উপায়, সই রে বল কি উপায়। ধু
কিবা গৃহবাস, মোর কিবা অভিলাষ,
এ রূপ-যৌবন কালে প্রিয় নাহি পাশ।
হৃদের অন্তর মোর, হানিল কামশর
নিঠুর হইয়া কালা গেল দূর দেশ।
কহেন নাসিরে, শুন, প্রিয় নহে দূরে
ভাব প্রভু পাইবা ধনি নিজ অন্তঃপুরে।

---

[১] এটি আলাওলের পদের অনুরূপ।

॥ ২৩৭ ॥

বোল কি উপায় সই রে।
প্রাণ-প্রিয়া বিনে হিয়া ধরন না যায়। ধু
কিসের গৃহের কাজ মোর কিসের অভিলাষ
এ রূপ-যৌবন কালে প্রিয় পরবাস।
হৃদের অন্তরে মোর হানিল কে শেল
আমাকে ছাড়িয়া প্রিয় কোন্ দেশে গেল।
কহে নাসির মোহাম্মদ প্রিয় নহে দূরে
ভাব ধনি পাইবা নিজ অন্তঃপুরে।[১]

॥ ২৩৮ ॥

[পঞ্চম]

যাই কোন্ ঠাঁই, সজনি সই
বন্ধুর লাগি যাব কোন্ ঠাঁই ॥ ধু।
প্রেম বাড়াইয়া কালা,
দিলি মোরে এত জ্বালা,
কোথা গিয়া রহিলি ছাপাই।
এ চারি প্রহর নিশি, শয্যার উপরে বসি,
ঝুরি ঝুরি রজনী গোঁয়াই ॥
যৌবন হইল ভারী, ধৈর্য ধরাইতে নারি
কিসে মন রাখিমু মানাই ?
এতিম নাসিরে ভণে, যাও ধনি কদমতলে
যদি চাহ সুন্দর কানাই ॥

॥ ২৩৯ ॥

আর মুই ল পাসরিতে নারি
চাহিতে না দিল রূপ, আঁখি তুলি ধরি। ধু
আঁখির পোতলি মোর জীবের জীবন
আমারে ছাড়িয়া গেলা নিশির স্বপন।
কি লাগি দারুণ বিধি আমারে রাখিল
পালিলুঁ তনু শূন্য করি বিলাইএ নিল।
এতিম নাসির কহে এই না দুখে মরি।
যার লাগি এত কৈলুঁ সেহ গেল এড়ি।

॥ ২৪০ ॥

[ভাটিয়াল]

জীবের ধন, আমায় ছাড়ি গেলা
কোন্ দোষে ?
তোমার পিরীতিখানি, মরমে রহিল হানি
তনু ক্ষীণ প্রাণি হয় শেষে। ধু
মুই যদি জানিতাম জ্বালা মোরে
দিলা জ্বালিয়া
তবে কেনে বাড়াইলাম পিরীত।
অন্তরে বাহিরে দহে কত বা পরাণে সহে
জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠে চিত।
কি মোর গৃহে কাজ কি মোর লোকের লাজ
কিবা মোর গুরুর গঞ্জন।
এই ভাবনা মনে, প্রাণ করে উচাটনে
কবে পাইমু বন্ধুর দরশন।
কহে নাসির মাহমুদে ভজ ধনি প্রভু পদে
তবে পাইবা কানুর উদ্দেশ।
কদম্বের তলে বায়, বন্ধুয়া আসে যায়
তিলে তিলে ধরে নব বেশ।

॥ ২৪১ ॥

কি হৈল আমারে বন্ধু কি হৈল আমারে
দিবা নিশি ঝুরে প্রাণি না দেখিয়া তোরে।

---

১ পুর্ব্ব পদ ওএটি মূলত একই পদের রূপভেদ।

এই সাধ করি মনে তোর লাগ পাই।
তোমার পদের ধূলা নয়ানে লাগাই।
কামবাণে হানে প্রাণি না দেখিলে প্রিয়া
গৃহছাড়া হইয়া যাইমু তুই বন্ধুর লাগিয়া।
সাধিয়া আপনা কাজ ছাড়ি গেলা মোরে
পাগল হইলাম বন্ধু না দেখিয়া তোরে।
ফকির ওহাবে কহে এই সাধ মোরে
গলে হার করি বন্ধু গাঁথিয়া রাখম তোরে।

॥ ২৪২ ॥

[দেশকার]

সহিমু কত বিরহে আগুনি। ধু।
যবে করি রোষ তবে হৈবে দোষ
তেকারণে বসি শুনি।
কহিলে এ হয় আনলে বা হিয়ে দএ
পিছে লাগি আছে শনি।
মোহাম্মদ হাসিমে কএ গুরুজনের ভএ
মুখে না আইসএ বাণী
কহিলে এ কথা মনে লাগে ব্যথা
অকীর্তি হইবে জানি।

॥ ২৪৩ ॥

[রাগ-দীপক]

অরে শ্যাম গেলা কোন্ দেশ।
কোন্ দেশে গেলা শ্যাম
না পাই উদ্দেশ। ধু।
পিয়া মোরে বিছোড়ল তিলে যুগ জানি
পিয়া বিনে হই গো পনি।
আকাশের চন্দ্র প্রিয়া কিবা শিরোমনি
আসিবা আসিবা করি গোঁয়াইলাম রজনী।
মুহম্মদ হাসিমে কহে নিরবধি হিয়া দহে
মুখে না আসে বাণী গুরুজনের ভয়ে।

॥ ২৪৪ ॥

[প্রভাত]

অরে বন্ধু না চিনিলুঁ তোরে
অরে কার ডরে কার ভয়ে বোলাই না
গেলা রে। ধু
একেলা মন্দিরে বসি জপি বন্ধু বন্ধু।
দেখা দি পালাই গেলা যেন নব ইন্দু॥
একেত আন্ধার রাত্রি কেহ নাই সাথী।
কিরূপে হাঁটিয়া গেলা নিশিভাগ রাতি॥
মথুরার হাটে আমি পাইলুঁ খবর।
ত্রিবেণীর ঘাট দিয়া পার হৈলা একসর॥
ত্রিমোহানী ত্রিবেণী ঢেউ প্রতিনিত।
কেমনে হইলা পার না বুঝি চরিত॥
দিন লাহুতেতে ডুবি ডুবি কৈলুঁ সার।
কিসকে নিমায়া হইয়া তেজিলা আমার॥
এতিম কাসিমে কহে যুগ কর জুড়ি।
তুঞি বন্ধুর বিচ্ছেদ-খেদে ঝুরি ঝুরি মরি॥

॥ ২৪৫ ॥

কানু রে দেখিলা নি যাইতে
রে তোমরা সব।
বৃক্ষ উপর থাক রে পক্ষী দেখ পন্থ বহু দূর।
এই পন্থে যাইতে দেখছ নি দয়াল ঠাকুর।
উঞ্চল বৃক্ষে থাকি রে আমরা দেখি
পন্থ বহু দূর।
মোদের নি ভাগ্যে আছে দেখিতাম ঠাকুর।

এখানে আছিল হরি জগত ভরিয়া
আমা এড়ি গেলা হরি অনাথ করিয়া।
দুঃখিত অনন্তে কহে শুন মুনি জনা
অনুদিন হরি মোরে করিল মস্তানা।

॥ ২৪৬ ॥

[গুর্জরী]

শুন সখী সার কথা মোর।
কুলবধূ প্রাণি হরে সে কেমন চোর।
সে নাগর চিত্ত-চোরা কালা যার নাম।
জিতা রাখি প্রাণি হরে বড় চৌর্য-কাম।
মোর জীউ সে কি মতে লই গেল হরি।
শূন্য ঘরে প্রেমানলে পুড়ি আমি মরি।
গুরুপদে আলি রজা গাহে প্রেম ধরে।
প্রেম খেলে নানা রূপে প্রতি ঘরে ঘরে।

॥ ২৪৭ ॥

[সিন্ধুরা]

বনমালি, কি হেতু রাধারে ভাব ভিন!
তোমার প্রেমের ঘায় দগধে জীবন কায়
নিত্য রাধা মদন অধীন। ধু
কি সাধ জীবনে ভক্তি ঘরে নাহি প্রাণপতি
হৃদে মোর মদন প্রবল।
প্রজাপতি-সুত বাণে ধৈরজ না লয় মনে
প্রজ্বলিত বিরহ আনল।
তেজিয়া কপট মায়া শ্যাম, পদে দেও ছায়া
রাধা প্রেম দুখের তরাসি।
ক্ষেম অপরাধ শত পূর্ণ কর মন সাধ
জনমে মুই হৈলু° দাসী।
গাহে আলি রজা হীনে
রাধাকানু সীম ত্রিভুবনে
প্রেম ভক্ত নাহি দেব মুনি।
জীব যত পক্ষী নর এক নহে সমসর
কোন ভক্ত রাধার নিছনি।

॥ ২৪৮ ॥

বাঁকা শ্যামেরে কৈও
নয়ান ত্রিভঙ্গে ভাঙ্গে কুলধনি মান। ধু
নাশে জ্ঞানমূল কিসে জাতিকুল
যাচি যৌবন কর দান।
জগত নাশক অস্থির ঘাতক
তুয়া কটাক্ষের শর।
মুঞি সে অবলা কোমল সরলা
সহিতে শঙ্কিত বড়।
হেরি প্রাণ হরে অর্ধ-মৃত্যু করে
এমন বধক কোথা।
বিষ-পানে মরি কহিতে না পারি
শ্যামের চরিত্র কথা।
অবলা বধিলে কিবা সুখ মিলে
রসিক নাগর রায়?
জীবন যৌবন কৈলু° সমর্পণ
ভজিলু° ঐ রাঙ্গা পায়।
ভজমান[১] ছাড়ে কেমন নাগরে
কুলের কলঙ্কী হৈব।

১ ভজিতেছে এমন

কাম হুতাশন   না সহে জীবন
যমুনাতে ঝাম্প দিব।
শ্রীহীন দানেশ   কহে উপদেশ
খেদ পরিহরি রায়।
সেই দয়া সিন্ধু   বিরহিণী বন্ধু
সেবিতে ঐ রাঙ্গা পায়।

॥ ২৪৯ ॥

[করুণ ভাটিয়ালী]

তুই বন্ধুর সুরতের বালাই লৈয়া।
মুই মরি যাইতুঁ, তুই বন্ধুর বালাই লৈয়া॥
পিরীতি আনল ঘাতে,
দহিল মুই নারীর মাথে,
পুড়িয়া হৈলুম্ ভস্ম ছালি।
যদি আসে প্রাণ পিয়া, হিয়ার উপরে হিয়া
এ রূপ-যৌবন দিমু ডালি।
মানিক্য পাইলুম্ বাটে,
লইলুম্ আপনা হাতে
হৃদেতে রাখিলুম্ কতকাল।
পড়শী হইল বৈরী, বন্ধুরে নিলেক হরি,
নয়ালি যৌবন হইল জঞ্জাল॥
করিয়া ঘরের কাম   জপিএ তোমার নাম,
নিশি দিশি জাগিয়া পোহাই।
ভজমান নারী ছাড়ি, যাও বন্ধু কার বাড়ী,
হাম নারীর আর লক্ষ্য নাই॥
বিনি বসন্তের বায়, যৌবন বাড়িয়া যায়,
না দেখিয়া প্রাণবন্ধু মুখ।
চম্পাগাজী ভণে, পিরীতি যতনে
রাখিলে পাইবা সুখ॥

॥ ২৫০ ॥

[বিভাস]

ভাবি মনান্তরে,   কিছুই না পাই রে
যামিনী ঘোর অন্ধকার।
নয়ান-আনন্দে,   বিধির নির্বন্ধে,
দেখিলুঁ বিজুলি আকার।
হাতে দিয়া নিধি,   হরি নিল বিধি,
ভাসাইল বিরহ সাগরে।
কুল না পাইলুঁ,   ভাসিতে লাগিলুঁ,
পড়িলুঁ সাগর মুরে॥
বিরহ-সাগরে,   ডুবাইয়া মোরে,
হরিয়া নিল পুন বিধি।
শূন্য রাখি মন,   কোন প্রয়োজন,
তেজিয়া উদ্দেশিব নিধি॥
মনের মরম,   কহিলুঁ ভরম,
এমন আশা কেন বন্ধু?
ভাবি করতার,   অন্ধ হয় পার,
তরএ হই ভবসিন্ধু॥
কোন্ বিধি দিল,   নয়ানে দেখাইল,
কেবা লৈয়া গেল ভাঁড়ি।
নুর মহম্মদ,   ভাবিয়া সে পদ,
ভণিল বিরহ লাচারী॥

॥ ২৫১ ॥

শুন প্রাণনাথ নিবেদন পদে
বিরহিণী সম্বাদ। ধু
তুমি ত চিকণ কালা গলে নানা ফুল মালা
যার নাম নিলাজ কানাই।

তুমি আমি এক জাতি জন্ম ভিনে
হইলুম জ্ঞাতি
সে নিমিত্ত তোরে বলি ভাই।
যার হাতে হেন বাঁশি সে মুখে সতত হাসি
নাম শ্রীবৃন্দাবন শ্যাম।
যদি কৃপা কর বন্ধু লেখিয়া কমল পদে
রাখ বিরহিণী রাধার নাম।
হীন আলি রজা ভণে এই শ্রধা করে মনে
দাস হই রাঙ্গা চরণে
যে মুখে সাগর ধার সঙ্কট হইতে পার
উদ্ধার নাহিক গুরু বিনে।

॥ ২১২ ॥

কেনে মোরে দিলি° অপমান
হাউষের পিরীতি ভাঙলি কালা-চান। ধু
কার বোলে ভাঙলি পিরীতি
ডুবাইয়া জাতি কুল মান।
আসিবি বুলি না আসিলি তুই বড় বেইমান
গোকুল নগরে ঘোষে কলঙ্কিনী
রাধার নাম।
শ্রধা মনে তোর সনে বৈরাগিনী হৈয়া যাম
দেশে দেশে ভ্রমণ করি মথুরায় তোর
লাগ পাম।
ফৌজদারে ত দরখাস্ত দিয়া
ভাঙ্গিব তোর গুমান।
যার বোলে ভাঙ্গিলি পিরীত
তারে যদি লাগ পাম।
হীরার কাটায় মারি তারে
সাধিম মনের এই সম্মান
শ্রীকমর আলি কয়, পেয়ারী
না করিও অভিমান
পিরীত করি ছাইড়া গেল
যে বড় নিঠুর শ্যাম।

॥ ২১৩ ॥

আল সই প্রেম-আনলে দহে হৃদেতে।
রৈয়া রৈয়া জ্বলে চিত্ত নারি সহিতে।
যে প্রেম করিয়াছে সে বুঝেছে
পিরীতি বিষম জ্বালা।
প্রেম জ্বালায় শরীর বিষম কালা।
এই শ্রধা মনেতে আমার
শ্যাম সনে মনের বাঞ্ছা পূরাই বারে বার
রাধা প্যারী কান্দ্যা মরি
লুটাইছে প্রেমের ভরা
আর না আসে ননী-চোর ভোমরা।
শ্রী কমর আলি কহে শুন শ্রীনন্দের কানাই
কুল কামিনীএ আকুল কৈলা
এবে মনেতে নাই।
কুল মজাইয়া মধু খাইয়া
এখন রইলা মথুরায় ও মনচোরা।

॥ ২১৪ ॥

কান্দি কান্দি বলিতেছে শ্রীমতি রাই।
সই আইন্যা দে মোর নাগর কানাই। ধু
শুন আয় বৃন্দা দূতী বলি তোমারে
মথুরায় গেল হরি আন্যা দে মোরে।
শ্যাম বিনে ব্রজপুরে আর
আমার ব্যথিত নাই।

প্রেম আনলে দহে মোর হৃদয় অন্তরে
বৃন্দাবনে বসি যত কোকিল কুহরে
সেই সে মনের দুঃখ
কইতে নারি কার ঠাঁই ।
কে হরিল প্রাণ দূতী ব্রজের শশি
বৃন্দাবনে রাধা বলে ডাকে না বাঁশি
অভাগী রাধারে দয়া শ্যামের মনে নাই ।
কহে শ্রীকমর আলি শুন গোপ নারী
নিকটে আছে তোমার প্রাণের হরি ।
ধ্যানে ভঙ্গ নাগর কানাই
না কাঁদ শ্রীমতি রাই ।

॥ ২৫৫ ॥

সই বোল কি উপায়
প্রাণ প্রিয়া বিনে হিয়া ধরন না যায় । ধু
কি হাবিলাষ মোর কিবা গৃহবাস
এ রূপ-যৌবন কাল পিয়া পরবাস
হৃদের উপরে মোর হানি কাম-শেল
নিঠুর হৈয়া প্রিয়া কোন্ দেশে গেল ।
কহে হীন আলাওলে পিয়া নহে দূরে
ভাব কান পাইবে নিজ অন্তঃপুরে ।

॥ ২৫৬ ॥

ধনি ধনি চলিতে খঞ্জন ধরএ
চপল ধবল রমনী ধনি ধনি ।
আল সখি অন্ন নাহি খায়
আন কলা না লয় ভায় ।
কহিও বন্ধুর আগে সব বিষ লাগে
কি হউক জীবন উপায় ।

॥ ২৫৭ ॥

কানু হে নিকুঞ্জ মন্দিরে আইস
ভাগ্যবতী রাধিকা, কানু ভাল সাজে । ধু
আছিলুম শিশুমতি না জানিলুম সুরতি
এইক্ষণে প্রিয় লাগি পোড়ে মন
এবে হৈলুম যৌবন প্রিয় লাগি পোড়ে মন
প্রিয়কে দেখিতে হাবিলাষ ।
রাধিকারে ডংসিল প্রেমের ভুজঙ্গমে
ঢলিয়া পড়িল শ্যামের গায়
রাধিকারে কোলে করি কানাইয়া ধরণী ধরায়
অধরে অধরে মিলি যায় ।

॥ ২৫৮ ॥

সাঁজ হৈল বেলা গেল প্রতি ঘরে বাতি
তবুত না আইসে যাদু দিনান্তে উপাসী । ধু
অপরূপ বিপরীত কি বলিমু কারে
নানারূপে করে কেলি ভ্রমরা না ছাড়ে ।
জল নাহি কলসে যমুনা বহু দূর
চলিতে না পারে রাধা চরণে নেপুর ।
ভিঙ্গারের জল দিয়া পাখাল দুই পাও
শীতল বিজনী দিয়া করিমু তোমা বাও ।
বারে বারে কহি নন্দ বেটিয়া পেলাও ধেনু
গোকুলে মাগিয়া খাইমু কোলে লইয়া কানু
কহে সৈয়দ সোলতানে মনে ত ভাবিয়া
পর কি আপনা হয় পিরীতি লাগিয়া ।

॥ ২৫৯ ॥

[সাত গাঁইয়া ডাকা ছুহিরাগ]

শুন সই রে কাহে লাগি
এ প্রেম বাড়াইলা ।

ঘড়ি এক বলি বন্ধু গেলা মোর লগে
কত যুগ ভেলা। ধু
চান্দ চন্দনে না জুড়ায়
পিয়া বিনে মোর মন না ভায়।
একেলা মন্দিরে বসি জাগি।
পিয়া বিনে মোর মন আগি।
কহে তুফানুদ্দিন এহি বিশ্বাসে।
পাইবা রসবতী মানসে।

॥ ২৬০ ॥

[রাধিকার বারমাস]

প্রথম বৈশাখ রাধার মনে শোক
দারুণি রবির জ্বালা।
নূতন অবলা আমা ছাড়ি গেলা
মথুরা নগরে কালা।
গোকুল নগরে প্রতি ঘরে ঘরে
ফিরিব যোগিনী হৈয়া।
যে ঘরে পাইব আপনা বন্ধুয়া
বান্ধিব বসন দিয়া।
জৈষ্ঠ মাসেতে রাধার ব্রজেতে
চাতকী সুনাদ বোলে।
পাইয়া গোপিনী প্রভু শিরোমণি
রহিয়াছে কুতুহলে!
আষাঢ়ে বরিষা জলে চড়ে হাঁসা
হাঁসিনী করএ জোড়।
ঘোরতর করি যামিনী ছটরি
হেরিতে নয়ান ভোর।
শ্রাবণে শ্রীমতি করিয়া ভকতি
কৃষ্ণপদ মনে স্মরি।
গেল প্রাণনাথ করিয়া অনাথ
ছাড়িয়া অবলা নারী।
ভাদ্রেতে পূর্ণিমা স্বর্গেতে চন্দ্রিমা
দেখিতে উঝল অতি।
প্রাণনাথ বিনি আমি অভাগিনী
কেমনে বঞ্চিব রাতি।
আশ্বিনে রজনী জলে কুমুদিনী
দেখিতে লাগএ শোভা।
পুরুষ নিঠুর রহিল মধুপুর
কি মোর জীবন প্রভা।
কার্তিকে কুমারী থাকে ব্রজপুরী
কাকুতি মিনতি সার।
গেল প্রাণনাথ করিয়া অনাথ
কি ফল জীবনে আর।
অগ্রাণ মাসেতে ভোগী নাই সাথে
যৌবন বিলাইব কারে।
নূতন কামিনী রসের যামিনী
কেমতে রহিব ঘরে।
পউষেতে পূর্ণিমা উঝল চন্দ্রিমা
দারুণ হেমন্ত ঋত।
আমি একসর নাহিক দোসর
সদা দগধে চিত।
মাঘেতে পঞ্চমী জগতের স্বামী
বসন্ত হৈল রাজা।
গেল প্রাণনাথ করিয়া অনাথ
যৌবনে কারিতুম পূজা।
ফালগুন মাসেতে রাধার ব্রজেতে
জ্বলিল মনের আগুনি।
দারুণ কোকিলে বৃন্দাবনে বোলে

পাষাণ বিদরে শুনি।
চৈত্র মধুমাস পূরাইল বারমাস
হীন হাসিমের বাণী।
কাকুতি করিয়া কৈলে আরাধন
আসিয়া মিলিব পুনি।

॥ ২৬১ ॥

এই মোর কপালে ছিল
প্রাণনাথ ছাড়িয়া গেল
সখী লই যাব মথুরাতে।
মথুরাতে প্রাণধন
চল চল সখীগণ
ছাড়ি গেল সখা প্রাণনাথে।
হা হা প্রভু দীননাথ
তুমি বিনে পরমাদ
তুমি বিনে আঁধার বৃন্দাবন।
শ্রীআলিমুদ্দিনে কহে
শুন রাধে মহাশয়ে
কৃষ্ণ সাথে হৈব দরশন।

॥ ২৬২ ॥

[কোড়া]

সহন না যায় দুঃখ সহন না যায়।
যৌবন চলিয়া গেলে পিয়া না বোলায়। ধু
সব নারী পিয়া সনে করে আনন্দিত।
আমার মন্দিরে পিয়া কেন রে বঞ্চিত।
বেদন হুতাশে দহে কিবা রাত্রদিন।
হেরিতে পিয়ার পন্থ আঁখি হৈল ক্ষীণ।
আজু-কালুকা করি দিন গেল বইয়া।
না ভজিলাম পিয়া মোর যৌবন ভেটিয়া।
এবাদুল্লা কহে ধনি ভজ গুরুপদ।
কদম্ব তলে গিয়া দেখ পিয়ার সম্পদ।

॥ ২৬৩ ॥

[কাফি]

কোথা গেলে কালা চান্দের দেখা পাইব
না দেখিলে দিব্য-চরণে প্রাণে মরিব।
ওরে আমি কুল-কামিনী।
কালাচান্দের ভাবে হৈলাম
তাপের তাপিনী।
অবিরত দহে তনু মদন ভাবে।
আমি নারী ছিলাম অবলা
মোরে পরাধিনী করি গেল
ঐ চিকণ কালা।
আরে যোগিনীর বেশে আমি
নগর ভ্রমিব।
বুঝি সে বর নাগর
কুবজার প্রেমের ভাবে মথুরা নগর।
কৃষ্ণ নামটি শ্রবণেতে প্রাণি রাখিব।
আরে, বৃকভানুরাজ কুমারী,
কৃষ্ণ লাগি ভাবিও না, ওগো কিশোরী
শ্রীকমর আলি কয়, পেয়ারী
ব্রজের মাধব আসিব।

॥ ২৬৪ ॥

শ্যাম বিনে আঁধার আমার হইয়াছে বৃন্দাবন
দূতী গো কোথায় গেল মদন-মোহন। ধু।
মথুরাতে রৈল হরি পাইয়া গোপীগণ।
ছাড়ি গেল প্রাণনাথ,
আর আসে না বৃন্দাবন।

বৃন্দাবনে বাঁশীর রব শুনি না শ্রবণে।
বাঁকারূপ শ্যামের আঁর দেখি না চান্দ-বদনে।
শ্রীকমর আলি কহে, দুঃখ না ভাব এখন
তরুমূলে নদীর কূলে ঐ দেখ বংশীবদন।

॥ ১৬৫ ॥

দশহ শ্রীরাধিকার প্রাণ
অ সই তোমরা-নি দেখ্যাছ নন্দেরচান। ধু
ধড়াচূড়া মোহন মুররী হাতে।
গলে বনমালা চূড়া শোভ্যাছে মাথে।
সোনামুখে বাজায় বাঁশী
সদায় লৈয়া রাধার নাম।
শূন্য হইছে ব্রজপুর, শূন্য সিংহাসন
সবশূন্য লাগে আমার রসের বৃন্দাবন।
সোনার মন্দির শূন্য দেখিংকত সয়,
অবলার প্রাণ।
এই দুঃখের দুঃখিনী
শ্যামে কর্যাছে মোরে।
কাঙ্গালিনীর মত ফিরি নগর বাজারে।
ধড় থুইয়া প্রাণটি লইয়া
কোন্‌খানেতে গেল শ্যাম।
কহে শ্রীকমর আলি শুন শ্রীমতি
বিধি পূরাবে তোমার মনের আরতি
আসিব তোর নন্দের চান্দ
না করিও অভিমান।

॥ ২৬৬ ॥

বিরহের জ্বালায় মরি।
কোথায় গেল প্রাণের হরি। ধু
বাঁকারূপ কালিন্দীর কূলে
দেখি না কদম্বতলে
আর ত বাঁশী বৃন্দাবনে ডাকে না
'রাধা পেয়ারি।'
শয়নে স্বপন দেখি জাগনে কান্দিয়া থাকি
সব শূন্য বৃন্দাবন আসে না বংশীধারী
হীন কমর আলি ভণে ভাবিস না পেয়ারি
আসিব তোর প্রাণের হরি
দেখবি তুই নয়ান ভরি।

॥ ২৬৭ ॥

শ্যাম বিনে বাঁচে না আর অবলার প্রাণ
আর আইসে না কালা চান্দ। ধু
নিত্য নিত্য বাজাই বাঁশী হর্যাছে
অবলার প্রাণ।
পিরীত করি ছাড়্যা গেল
সে বড় নিঠুর শ্যাম।
বংশীবদন মদনমোহন কোথায় রৈল
মোর কালাচান্দ
কুলের বধূ আকুল কৈল
ধৈরজ না মানে প্রাণ।
শ্রীকমর আলি কহে পেয়ারি
না করিও অভিমান
আসিব তোর কালাচান্দ পূরাইব মনস্কাম।

॥ ১৬৮ ॥

কালাচান্দে আকুল কৈল
সে কি জানে মন্ত্রণা
দূতী গো আর তো প্রাণি বাঁচে না। ধু

নিত্য নিত্য হৃদে মোর অই সে ভাবনা
ত্রিভঙ্গে ভুলাইয়া গেল দিয়া প্রেমের যন্ত্রণা
নিশিদিশি আসি ব্রজে সেই রসিক জনা
প্রেম পসরা লুটি চোরা
পুনি ব্রজে আসে না।
আনলে কানন বন যেন করে দহনা।
তেমনি জ্বলে রাধার চিত শ্যাম
কিছু তা' জানে না।
শ্রীকমর আলি কহে, পেয়ারি
না করিও ভাবনা
আসিব তোর কালাচান্দ,
থাকলে তোর বাসনা।

॥ ১৬৯ ॥

দহে শ্রীরাধিকার প্রাণ
ও শ্যাম কানুর লাগিয়া। ধু
এই কুঞ্জ বৃন্দাবনে কদম ডালে বসি
'রাধা রাধা' বুলি সদায় বাজে কানুর বাঁশী।
বাঁশীর স্বরে রাধার প্রাণ নিল হরিয়া।
মথুরায় হইয়াছে রাজা শ্রীনন্দের কানাই।
কালিন্দীতে প্রেম কর‍্যাছে
তাহে মনে নাই।
পাইয়াছে কুবজা রাণী রৈছে ভুলিয়া।
গোকুল নগরে ঘোষে রাধা কলঙ্কিনী
ছাড়্যা গেল প্রাণ নাথে কর‍্যা অনাথিনী।
জাতি-কুল-মান মোর গেল ডুবাইয়া,
প্রেম-হুতাশনে চিত্ত দহে অনুক্ষণ
গরল ভক্ষিয়া নারী তেজিমু জীবন।
জীবনে প্রবেশি প্রাণ দিমু তেয়াগিয়া।
ভানুসুত পানি আদি করিয়া মিলন
কালানিধি সঙ্গে করি ভাবি অনুক্ষণ।
ভাবিতে ভাবিতে তনু যায় দহিয়া।
শ্রীকমর আলি কহে, রাধার দুই চরণে সার
মথুরাতে গেল হরি না আসিব আর
মিছা প্রেমের ভাবে কেনে রইছে ভুলিয়া।

॥ ২৭০ ॥

প্রাণনাথ ব্রজে না আইল
এই রূপ যৌবন বইল। ধু
এই ভরা যৌবন কালে শ্যাম ব্রজে নাই।
বিরহিণী একাকিনী কান্দিয়া গোমাই।
শ্যামের লাগি ভাবি ভাবি
সদাই তনু শেষ হইল
শতদল কমল মোর হইল বিকাশ
হেনহি সময়ে হরি নাই মোর পাশ।
সোনার মন্দির শূন্য আমার বৃথা জনম গেল।
যত ব্রজবাসী নারী পতি করি সঙ্গ
যার যেই মনোবাঞ্ছা পূরে মনোরঙ্গ
মোর পিয়া নাই ঘরে বিচ্ছেদ মনে রইল।
কহে শ্রীকমর আলি, শুন গো পেয়ারি
না আসিব ব্রজে তোমার প্রাণের হরি।
কুবজার ভাবে ভুলি মথুরাতে শ্যাম রইল।

॥ ২৭১ ॥

কেবা রস রঙ্গে রঙ্গে অঙ্গে অঙ্গে ডালে
নিরল নির্মল মাঠা আর বৈসে বিষম কাঁটা।
বিজলি বিমল পাটা
ঝলমল করে গো রাই।

সুবাস চন্দন মাথে তদ ইন্দ্র-ধনু হাতে
রক্ত-মুক্তা শোভে সাথে অভ্যাগতি
কর গো রাই।
হাম অভাগিনী জনম তাপিনী
রসের কালে প্রিয়া নাহি মোর ঘরে।
গোপালের সাত ভাই
দুগ্ধ যে দোহাইলে পাই
ক্ষীরসর বানাইয়া দিমু খাই।
তেলইন ছিলাই রে স্বামীরে ভুঞ্জাইব ঘরে
তুমি বন্ধু বসি রঙ্গ চাইও।
একুলে সোনাকুল ওকুলে বিক্রমপুর
তার মাঝে বিক্রমপুরের পাড়ি।
কাট্টন কাটিয়া স্বামীরে পালিমু গিয়া
ছাড়ি দাও দয়ার বাপ ভাই।

॥ ২৭২ ॥

ওরে সোনা বন্ধু রে কৈও ওই রাঙ্গা চরণে
কোটি পরণাম।
হাকিমে জানিল জগতে শুনিল
লোকমুখে হইল হাসি।
যাচিয়া যৌবন ভজিয়া চরণ
বন্ধুরে দিলাম অনামূলে।
জাতিতে আছিলাম সর্ব তেয়াগিলাম
যৌবন তোমারে দিলাম দান।
যৌবন থাকিতে শ্যাম কেনে মোরে
হৈলা বাম
মুই মরিমু যৌবন লইয়া রে।
নীচেতে চাহালা উপরেতে পানি
তাতে বাঘের বড় ভয়।
আমার বন্ধুর ভালে মন্দ কিছু হইলে
এই জীবন রাখিতুম নহে।
বোলাইলে না বোল ডাকিলে না শুন
তিলেক না বৈস কাছে।
তাহারে পাইয়া আমা পাসরিলা
তাহা পাসরিবা শেষে।

॥ ২৭৩ ॥

আমি প্রাণে যদি না মরি।
মনো-আশা পূরাইমু সে নারী ॥
এখন আমি কামজ্বালায় মরি।
দুঃখেতে এড়িয়া মোরে,
রৈলা পাসরি ॥
কামজ্বালাতে দিয়া মোরে,
কেনে রইলা পাসরি ॥
নূতন ব'সে পিরীতি কৈলাম,
হস্তে যেন অভাগিনী,
চন্দ্র লাগ পাইলাম ॥
বুঝিলাম বুঝিলাম চিত্তে দয়া নাই
তোর মুরারি ॥
আঁচলেতে রেখেছি যৌবন,
কত মধু খাইয়া যাও,
আইস প্রাণধন,
ডুবি রৈলাম প্রেমতরঙ্গে,
উদ্ধার কর শ্রীহরি ॥

॥ ২৭৪ ॥

[রাগ : বসন্ত]

আইল বসন্ত ঋতু হে
আমার প্রিয়া নাহি ঘরে।

দক্ষিণে মলয়ার বাও গঙ্গা উনমতি
নবীন কোকিলা স্বরে বাহির হইল যুবতী।
কাউয়া কালা কুকিল কালা কালা আঁখি-মণি
খঞ্জনের বুক কালা চিত্ত ধরাইতে না পারি।
পক্ষীগণে কেলি করে পাইয়া মাদার ফুল
ছুগ্গের ছাবাল নাচে পাইয়া মায়ের কোল।
বসন্তে উঠিয়া বলে হেমন্তরে ভাই
সকল মারিলা তুমি জিয়াইবারে চাই।
মাঘ বহিয়া গেল ফাল্গুণ পরবেশ
বসন্তে মারি নিল হেমন্তের দেশ।

॥ ঋতুর বারমাস ॥

॥ ২৭৫ ॥

[রাধার সংবাদ]

। রাগ ঃ বসন্ত ।

কৈও কৈও প্রাণ-ঋত রাধার সংবাদ
নিমায়া নিঠুর হইয়া গেল প্রাণনাথ। ধু
বারমাসে ছয় ঋতু জানিও নিশ্চএ।
এক রাগে ঋত ছুইমাস পাইয়াছএ।
কৈও কৈও প্রাণ ঋত রাধার সংবাদ
নিমায়া নিঠুর হইয়া গেল প্রাণ নাথ।
পুস্পল মাসেতে ঋত পড়এ শিশির
কৃষ্ণ বিনে চিত্ত মোর হইল চৌচির।
হেমন্তের ঋত হবে দীগল যামিনী
কৃষ্ণ বিনে কিরূপে বঞ্চিমু অভাগিনী।
মাঘল মাসেতে ঋত ন'গুণ পড়ে জাড়
ছাড়ি গেলে প্রাণ কৃষ্ণ কি গতি আমার।
বহি যায় মালব রাগ শ্যাম ব্রজে নাই
কইও কইও রাগ ঋত মাধবের ঠাঁই।
ফাল্গুণ মাসেতে ঋত বহেরে বসন্ত
হেনই সময়ে মোর ছাড়ি গেল কান্ত।
রসরঙ্গে নরনারী ফাগুয়া খেলাএ
আমার প্রাণের কৃষ্ণ রহিল কোথাএ।
চৈত্রল মাসেতে পতি গেল দিগন্তর
ছাড়ি গেল প্রাণের নাথ না লৈল খবর।
বহি যায় বসন্তকাল কি হবে উপায়
পিয়ার বিচ্ছেদ খেদ সহন না যায়।
বৈশাখ মাসেতে ঋত বহেরে নিদাঘ
গাহিতে সুস্বর অতি মল্লার সুরাগ।
শতদল কমল মোর হইল বিকাশ
মোহর ভোমর কৃষ্ণ নাই মোর পাশ।
জ্যৈষ্ঠল মাসেতে ঋত তাপিত তপন
কস্তুরী কুঙ্কুম অঙ্গে লাগে হুতাশন।
এই আম কাঁঠাল পাকা খায় সর্বজন
বহি যায় নিদাঘ ঋত কি ফল জীবন।
আষাঢ়ে পান্থক ঋত বহে রে মধুর
হেনহি সময়ে কৃষ্ণ রৈল মধুপুর।
ছাড়ি গেল প্রাণ পিয়া দিক দিগন্তর
অনাথিনী হইয়া নারী আছি একসর।
শ্রাবণ মাসেতে ঋত বরিষা নির্ভর
দারুণি কোড়ার ডাকে দগধে অন্তর।
শ্রীরাগ গাহিতে শ্যাম নাহি বৃন্দাবন
কৃষ্ণের বিচ্ছেদ খেদে তেজিমু জীবন।
ভাদ্রেতে ভদ্রিকা তিথি দিবস রজনী
ভাবিত হইয়া আছি রাধা অভাগিনী।
শিশির-ঋত বহে হিল্লোল গাহে গীত
শ্রীনন্দের নন্দন বিনে শান্ত নহে চিত।
আশ্বিন মাসেতে ঋত বরিষা অবশেষ
মুই হতভাগীর কান্ত গেল কোন্ দেশ।

বহি যায় শিশির ঋত কি উপায় করিমু
যথা গেল প্রাণ নাথ তথা চলি যাইমু।
কার্তিকে শিশির বহে প্রচণ্ড উদয় শশী
নয়ালি যৌবনের ভারে পাঞ্জর যায় খসি।
অভাগী নারীর যৌবন কাঁচা রসে ভরা
মজিল কমল পুষ্প না আইল ভ্রমরা।
আগ্রাণ মাসেতে ঋত নবীন তণ্ডুল
নয়া ধান খায় সবে কৌতুকে বহুল।
মধু মিষ্ট লাগে মোর গরল সকল
বহি যায় কর্নাট রাগ জীবন বিফল।
বসুবেদ মাসে রাধা না পূরিল আশ
হীন কমর আলি কহে ঋতের বারমাস।
ক্ষুদ্র বুদ্ধি অল্পজ্ঞান আর হীন জন্ম
বেদ শাস্ত্রে কিছু মাত্র মোর নাই জ্ঞান।
বারমাস পদবন্ধে করিলুঁ রচন
অশুদ্ধ পাইলে দোষ ক্ষেমিবা গুণিগণ।
যেবা গাহে যেবা শুনে ঋতের বারমাস
সর্বত্রে কুশল তার আপদ বিনাশ।

॥ ২৭৬ ॥

ছি ছি চান্দের তুলনা
তুলনা হইল না দিও না দিও না
শ্যামের তুলনা নয় রাইয়ের তুলনা।
তুমি সে তুলনা তুলনা সই।
একটি চান্দ গগন মণ্ডলে
এমন কত চান্দ রাধার চরণ তলে।
দশ চান্দ নাচে গায় বাঁশরীর রন্ধ্রে
আর দশ চান্দ রাধার চরণারবিন্দে।
আর দশ চান্দ রাধার চরণে বিভোর
চান্দের মালা গলে দিছে চান্দ দিছে কোড়।
রাহু কেতু যারে গ্রাস করে
তার তুলনা দিলি তারে রে॥

॥ ২৭৭ ॥

ডুবাইএ দুঃখিনীরে তোর মা এই দুঃখিনীরে
মথুরায় রৈলে ওরে নীলমণি।
আমি ক্ষীর সর হাতে লৈএ
আছি তোর মুখ চাইএ
কে খাবে তুই বিহনে সে ননী॥
এই গোকুলে গোপাল সনে
কে যাবে গোচারণে
কে মোর কোলে বসিবে মা বলে
আয় বাছা কোলে আয় তুই বিনে বাঁচা দায়
নতু তোর শোকে মরিবে তোর জননী।

॥ ২৭৮ ॥

[রাগ কল্যাণ]

সখি হে কি কহব হামো অবোধে
মদন বেদন বৈরী পিয়া আমাকে গেল ছুড়ি
এবেহু দেয়ত দান রাধে। ধু
সর বিনু সরসিজ সরসিজ বিনু সর
কিএ সরসিজ বিনু সরে
যৌবন তনু বিনু তনু বিনু যৌবন
কিএ যৌবন পিয়া দূরে।
সোনেহা আছিল যত হাওস না টুটল
যাথি বোল তথি তিথিরে।
ঐছন কেবল দেহা নিম সীম তেজি কাহা
উছলি পয়োনিধি তীরে।

॥ ২৭৯ ॥

[রাগ দেসকার]

মোর কালিয়া যায় রে নিদারুণ হৈয়া
যায় কালা আনেরে বোলাইয়া।
বহুল যতন করি পিরীতি বাড়াইলুঁ হরি
অঝরনে ঝরে দুই আঁখি।
কালিয়া কালিয়া করি
ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরি
আইলা কালা রৈলা কার বাড়ি।

॥ ২৮০ ॥

[অহির পরছ]

কত না সাধ হি মান
বিরহে যুবতী মাগে দরশন দান। ধু
জলেত কমল রহে দূরে রহে সূর
চান্দ রহে অন্তরে কুমুদ কত দূর।
গগনে গরজে মেহু শিখরে মউর
উত্তম জনের নেহা কভু নহে দূর।
দিনে দিনে মাধব আদর গেল
তুলা খুন অধিক পাতলি ভেল।

॥ ২৮১ ॥

[গান্ধারে]

অ বন্ধুর লাগিয়া একেলা বসিয়া রৈলুঁ
নিকুঞ্জ গহীন বনে।
হার ঝুরু ঝুরু পাঞ্জর ভেদিল রে
কালিয়ার মদন বাণে। ধু।
মন্দ মন্দ করি বাওখানি বহে রে
কুকিলা কুহুরে ডালে।
এ চারি চৌপর রাত্রি জাগিয়া গোঞাইলুম
মাধবী লতার তলে।
ফুলের ইচোঁআন ফুলের বিছোঁআন
ফুলের শীতল পাটি।
ফুলের দেরেকে নিদ না আইসে
পুরুষ ভ্রমরা জাতি।
শিশু না কালে সোয়ামির সেবা রে…

॥ ২৮২ ॥

[গৌরী গান্ধার নট]

বোল সখি আর নি এমন হৈবে।
নন্দের নন্দন শ্রীমধুসূদন
পুনি কি গোকুলে আসিবে। ধু।
কেবল অক্রুর বরহি নিঠুর
কঠিন তাহান হিয়া।
গোপী সবের প্রাণ হরিয়া নিল কান
না জানি কি না মন্ত্র দিয়া।
আজু কালু করি রৈয়াছি প্রাণ ধরি
আসিবা করিয়া কানু।
যদি না আসিবে নিশ্চএ জানিবে
কি কাজে রাখি ও তনু।
ছাড়ি গেল দূর নন্দের সুন্দর
শূন্য করি গেল পুরী
হামো অভাগিনী কুলকলঙ্কিনী
গরল ভক্ষিয়া মরি।

॥ ২৮৩ ॥

বন্ধু মোরে কি করিল রে।
লাজ সরম ভরম তোমার

সংসারেত সর্ব লোকে জানিল রে।
গেল গেল গেল দিন
ভাবে তনু হইল ক্ষীণ
এই পাপ সংসারে মোরে ডুবাইল রে।

আত্মবোধন

॥ ২৮৪ ॥
[রাগ মালব]

নাইহরের বন্দা কি লৈয়া যাইমু
নিজ দেশে
কি লৈয়া আইলুম ভুবনে কি লইয়া
যাইমু শেষে। ধু
চালের নাইক শন গাছ রে খাইল ঘুণে
এবে সে ভাঙ্গিয়া যাইব আল্লার ফরমানে।
কালা-ধলা দুইজনা বসিয়া রইছে বাটে
কিরূপে হইমু পার ত্রিবেণীর ঘাটে।
কেশের ধরনী রে সাঁকো ক্ষুরের যে ধার
যে বান্দা করিছে নেকি তুরিতে হৈব পার।
সৈয়দ মর্তুজা কহে জীবন বিফল।[১]
'আজু কালু করি দিন হারাইলুঁ সকল।

॥ ২৮৫ ॥
॥ রাগ মহারাষ্ট্রী ॥

ওকি নাগর কালা বিনে
না রৈমু ঘরে
চিকন সূতার কাপড়
মাঝে ফাটিয়া গেল
নোয়ালি যৌবনের ভারে
সই রে বাথুয়া গাছেতে বেল
আবাল দেওরিয়া লাগি ফাঁদ পাতিয়াছম
ভাই শ্বশুর বাঝিয়া গেল।
সই রে নূপুর না দিও পায়
ঘরে দুরজন ননদী জাগিব
জাগিব নূপুর রায়।
সই রে মুই নারী কি কাম কৈলুঁ
যাচিয়া যৌবন শ্যাম বন্ধুরে দিয়া
লোকের চর্চায় মরি।
সই রে পিরীতি বহুল জ্বালা
দেশের মর্তুজা গাজী ১ দেশেত যাইব
বুকে দিয়া যাইব হানা।

॥ ২৮৬ ॥
॥ গুজ্জরী ॥

সাঁই, এক বিনে মাওলা এক বিনে
আর নাহি কোই॥ ধু
আপে হরে, আপে রাখে সখি! মাওলা
আপে করে কেলি।
আনন্দমোহন মাওলা খেলএ ধামালী॥
আপে মন আপে তন আপে মন হরি।
আপে কানু আপে রাধা
আপে সে মুরারি॥

---

১ সৈয়দ মর্তুজা কহে রাধা কালা মনোহর
আঁধার ঘর পসর কর শমনের নাহি ডর।

১ কবি নন যোগতাত্ত্বিক শব্দ।

সৈয়দ মর্তুজা কহে সখি, মাওলা
গোপতের চিন ॥
পুরান পিরীতিখানি ভাবিলে নবীন ॥

॥ ২৮৭ ॥

কানড়া

সোনা বন্ধুর এদেশে বসতি
আর হবে না । ধু
বন্ধু যাবে দূর দেশে মান লাগে ধান্ধা
কোমরে কাটারি শ্যাম রাখি যাও বান্ধা ।
বন্ধু যাবে দূর দেশে হৃদেত আগুনি
হাতে দিয়া যাও মালা শ্যামের নিশানি ।
বন্ধু যাবে দূর দেশে সঙ্গে কি না নিবে
দেশের শ্যাম দেশে যাবে ফিরে না আসিবে
সৈয়দ মর্তুজা কহে শুন রে কালিয়া
নিবারিল চিতের আনল কে দিল জ্বালিয়া ।

॥ ২৮৮ ॥

সাধ নাই রে সাধ, এ ঘরের বসতি আল্লা ।
সাধ নাই রে সাধ ॥
এক ঘরের পঞ্চ ভাই জানিয়া যায় নিদ
প্রকাশ পাইয়া চোরা ঘরে দিল সিঁদ ।
ঘরেত সামাই চোরা চারদিকে চায় ।
ডান হাতে লোহার মুদ্গর মানিক্য
লইয়া যায় ॥ ধু
কেহ হাসে কেহ গায় কেহ রঙ্গ চায় ।
কাহার মানিক্যের ভরা সাগরে
ভাসি যায় ।
ভাঙ্গা নায়ের ভাঙ্গা বইঠা দুই পাশে
গড়াই পড়ে ।
কোন্ ঘাটে চাপাইমু নৌকা
কূল বহু দূরে ।
অকাষ্ঠ কাষ্ঠের নৌকা মুঞি পাপী
মেলিলুম খেবা
অকূলি সমুদ্রের মাঝে আকুল কৈল্ দেবা ।
গাভী দিলা বাছুর দিলা দই দুগ্ধ খাইবারে
হুকুমে আইসএ বান্দা তলবে
লই যাইবারে ।
সৈয়দ মর্তুজা কহে কি ধার ধারম তোর ।
ঘরের সম্পদ ঘরেত রাখিয়া
চোরা মানিক্য লই যায় মোর ॥

॥ ২৮৯ ॥

ভরা কূলায় রে পাছুয়া নাও
কত কাল রাখিনু ভাও দিয়া ॥ ধু
নবী বোলে মুমিন ভাই দিন যায়
যায় বইয়া ।
বেহানে মেলিলুম খেবা রবি গেল বইয়া ।
বাহিয়া না পাইলুম কূল মুঞি অভাগিয়া ॥
পাপে পুণ্যে ভরিলুম ভরা,
ভরা হইল ভারী ।
আপনে ডুবিল ভরা কি দোষ কাঁড়ারি ॥
ভরা ভরি নিদ্রা রাজা সাধুয়া বিল মাঝে ।
গহীন গম্ভীর ঢেউ উঠে রাত্র দিনে ।
মুর্শিদ সওয়ারি নায় মর্তুজা[১]
হিঁচে পানি ।
আগা পাছা ঢুঁরি চাইলুম ছুটিছে গাহিনি ।

---

[১] মর্তুজা—কবির নাম নয়, দেহের বিশেষ স্থান নির্দেশক হঠযোগের শব্দ ।

॥ ২৯০ ॥

॥ কাফিয়া রূপ ॥

কাহে কাহে ধনি বাগ বানায়া
ছুনিয়া মিছা ধান্দা মায়া লাগায়া। ধু
তুহ্মি আহ্মার গুরুজি আহ্মি তোর চেলা
তোর দরশন বিনু ফিরিএ একেলা
হুঙ্কারে মারহো তীর দূরে গিয়া লাগে
ফিরি ফিরি লাগে তীর কামানেরি আগে।
সোনা কর চিড়িয়া রূপা কর বাটা
সখী গেঁও সব সরে উরি গেঁও হাটা।
কহে সুলতানে এ ধর খাখারা
যাইব মন্থুরা সব ফানারা।

॥ ২৯১ ॥

॥ রাগ ভৈরব ॥

হাম ভিখারি পঁহু পরম দেব দাতা
পিউ পিয়াসী ধেয়ানে মদমাতা। ধু
ক্ষিতি সিংহাসন বসন মেরি
অষ্ট সমীর মোর চামর ধারী।
শিরে নবদণ্ড ছত্র আকার।
চান্দ সুরুজ দোহো শোভএ তার।
ছুই সুর-শশী পাত্র হামাবি
তাহে কি বোলসি কাজ অনুসারি।
অজপা পঞ্চ শবদ ঘড়ি ভালে।
শ্রীহট্ট নগরে বাজএ এক তালে।
কহে সৈয়দ সুলতানে মনে হাঙ্কারি
পহুঁ দাতা সুলতান পরম ভিখারি।

॥ ২৯২ ॥

[ধানসী কেদার]

রে মন কত না কহিমু   কাত নিবেদিমু
কত না চেতাইমু তোকে।
দিনের ভিতরে   নাম নিরঞ্জন
বারেক না লইলুঁ মুখে॥ ধু।
পুত্র পরিজন   সব অকারণ
ভুলি রৈলুঁ মায়া মোহে।
যেন আঁখি ঠার   লোভ দয়া চুর
ঘোরময় বাঝি রহে।
সম্পদ সহায়   সুখ ব্যবসায়
প্রভু পদে না সেবিলে।
গতি গুরুভার   যেহেন কাণ্ডার
পঙ্কময় আটকিলে।
কহে সুলতান   জীবন স্বপন
মরণ জানিও সার।
সে পন্থ ছাড়িয়া   অসারে মজিয়া
ভুলি রৈলুঁ অনিবার।

॥ ২৯৩ ॥

সাধুর ভরারে ডুবাইলুম মনের বেহার
ভরিয়া সুবর্ণের ভরা তুলি লৈলুম নায়ের পারা
আগা পাছা তুলি দিলুম খাটা,
ছিঁড়িল পানসীর দড়ি অই চিন্তা মনে করি
সাধু ভাই বোলএ হায় রে হায়॥ ধু।
দক্ষিণে চঞ্চল বাও, না বুঝি বণিজের ভাও,
নৌকা মোর পাইল কু-বায়।

নালায় থাকিতে পানি না নামাইলুম
নৌকা খানি
যমুনায় পড়িয়া গেল ভাটা ॥
দক্ষিণে চঞ্চল বাও, না বুঝি বণিজের ভাও
নৌকা মোর পাইল কু-বায় ।
যমুনা ছাড়িয়া যায়, রশি কাছি নাহি মানায়
নাকাল নঙ্গরের ঘায় ॥
ব্যাজ নারিলুম খেবা, আন্ধার করিল দেবা
কূল কতদূর যমুনার
চৌদিকে করিল ঘোর না পাই পন্থের ওর
বিবাদে লাগিল কানু নৌকার ।
কহে সৈয়দ সুলতানে,
নৌকা আনিলাম পাণে
না করিলুম বণিজ বেহার ।
আখেরে কি জানি হয় আলস্যেত দিন যায়
হাত মোড়ামোড়ি সার ॥

॥ ১৯৪ ॥

[রাগ সুহি]

ওরে নিরঞ্জন জাতে দরবেশ
জ্ঞানে পরম যোগী । ধু ।
নামে নহি ব্রাহ্মণ জ্ঞানে নহি পণ্ডিত
ধ্যানে নহি পরম যোগী ।
শুনিয়া গুরুর বাণী স্থির নহে মোর প্রাণি
মনে লয় হই যাম বৈরাগী ॥ ধু
কায়া মোর কামিনী হইয়াছে সিদ্ধার বাণী
মুরসীদ ভজিলুঁ একজনা ।
পাইয়া ব্রহ্মার ভেদ চতুর্দিকে কৈলুঁ ছেদ
রবি শশী আমনা-গমনা ॥

আমি ত ব্রাহ্মণ বড়ু আমি অক্ষর পড়ি সরু
ভাট ভট বসি আমি পড়ি ।
নব দ্বার বান্ধিয়া ভাঁড়ার ঘর ছান্দিয়া
মন মোর সদায় নাগরী ।
আমি বড় চাষা গগনে আমার বাসা
শূন্য 'পরে মছল্লাত বসি ।
মুখ আমার হাল জিহ্বা আমার ফাল
আমূল পরাণ ভূমি চষি ॥
কহে সৈয়দ সুলতান আমি বর অজ্ঞান
জ্ঞান ধ্যান মোর অলঙ্কার ।
সুমেরু শিখর ভেদি গগনে জ্বালাই বাতি
এক চিত্তে ভাবি নৈরাকার ॥

॥ ১৯৫ ॥

[প্রভাত]

কি দোষে ছাড়িয়া যাইবা
মোরে জীবন ধন ।
মানবেত জন্ম হৈলুঁ গুরুপদ না ভজিলুঁ
এহি দোষে না চিনিলুঁ তোরে ॥ ধু
আতসে বোলএ আব হৈল মোর মনস্তাপ
বাতে না ফুকে মোরে নিত ।
ঝাড়ি না পাইলে ঘরে ধূলাএ পড়িয়া গড়ে
তনের দেখল বিপরীত ॥
লাহুতেত ডুব দিলুঁ কদলীর গোড় পাইলুঁ
মাহমুদা নাম জান তার ।
কাপ কুলুপ করি কলিজার বোঁটা ধরি
রহি আছে প্রভু করতার ॥
নাছুত আতস ঘর লাহুতেত ঢেউ বড়
নৌকা খান চলে বারে বার ।

মলকুত বাজারে হাট
জবরুত মোকামে বাট
নীল নদী বহে চারিধারে ॥
হেমন্তের হৈল জোর বসন্ত হইল কোর
আগুন নিবাইল কাল সরে।
চারিজন সঙ্গে ছিল সবে মোরে ছুড়ি গেল
নৌকা ঠেকিল বালুচরে ॥
কহে সৈয়দ সুলতান নৌকা খসি হৈল খান
ফিরিয়া না চাহে সাধু সবে।
মুরসীদ গুরুপীর সেবি না করিনু থির
ভাবি চিন্তি কি করিমু এবে ॥

॥ ২৯৬ ॥

[রাগ বসন্ত]

কত কত মোহন মোহনী জান। ধু
কুটিল কুন্তল ফান্দ বেড়িয়াছে মুখ চান্দ
গোপীগণ বাঝাইতে আশ।
যেহেন নির্মল শশী ঢাকিছে জলদে আসি
দেখা দিলে তিমির বিনাশ।
সুগন্ধি তিমির কেশ রহিছে মোহাবেশ
মুখ চান্দ রহিছে ছাপাএ।
একবারে অনুপাম নিশিদিশি একই ঠাম
লক্ষিবারে লক্ষ্যণ না যাএ।
কিবা রাত্র কিবা দিন নহে রূপ ভিন্নভিন
এ চান্দ সুরুজ নহে তাত
সৈয়দ সুলতানে কহু সেই সে
আক্কার পঁহু
দেখা না দে সভার বিদিত ॥

॥ ২৯৭ ॥

কত পন্থ কূল অন্ত নাই।
চৌদিকে করিল ঘোর, পন্থের না
পাইলাম ওর
ওরে বিবাদে লাগিল কাল দেবা রে।
কহে সৈয়দ সুলতানে, নৌকাখানি
আনিলাম পাণে
না করিলাম কোন ব্যবহার।
আগে পাছে না গুনিলাম, মায়াজালে
বন্দী হৈলাম
ওরে জিজ্ঞাসিলে কি দিব উত্তর।

॥ ২৯৮ ॥

[রাগ সুহি]

যাইবানি রে মন সাঁচানি রে মন,
যাইবানি নিরঞ্জনপুর,
কাঞ্চন মন্দিরে বন্ধুরে রাখিয়া
মুই পাপী আইলুম এতদূর। ধু
হাম পরবাসী দূর হন্তে আসি
রহি গেলুম এহি ঠাঁই।
দিন দুই চারি রহিছি বাসা করি
না জানি কোন্ ঘড়ি যাই ॥
মূড়ার উপর বুড়ার টঙ্গিঘর
হেঠে যমুনারি ধারা।
উত্তর দক্ষিণে দুই গাছি বাহনে
মাঝে নব গিরি পারা ॥
সঙ্গে আছে মোর দুই তিন ঢেঙ্গুর
ঢেঙ্গুরী উদ্দেশে ধায়।

যেহেন বিড়ালে সরা দুগ্ধ পাইলে
খাইতে ধরফরায় ॥
যে বা আছে বুড়ী বাসাটি পসরি
সেহ পরবুদ্ধি ভুলি।
চারি কড়ার তেল সব বিনালে গেল
ভাণ্ড হই গেল খালি।
বাপের দিনের কড়া দুই-তিন
পুরান সঞ্চিত ধন।
পাড়ার লোকেরে সেহ নিবারে
সদায় আনন্দ মন ॥
কহে সুলতান কর অবধান
এহ গৃহে নাহি কাজ।
জাতি কুল ভয়ে-গুনি মর্ম দহে
আর সভা মধ্যে লাজ ॥

॥ ২৯৯ ॥

[রাগ কোরা]

জাগ জাগ অরে মন্নুরা কত নিদ্রা যাও।
অরুণ সে না উলিতে আল্লাকে ধেয়াও ॥
নিদ ভেল নয়ানেত পাসরি নিরঞ্জন।
কাল পাই চোরায় নিব সর্বধন ॥
নিদেতে গোঞাইবা কাল ভাবি চাহ সার।
রজনী না হতে ভোর ভাব করতার ॥
মীর ফয়জুল্লা কহে জনম রহিল।
ভাবিতে ভাবিতে কহি জগ টলমল ॥

॥ ৩০০ ॥

[নাটিকা]

গুণের নিধি তুয়া বিনে আর নাহি জানি
রে গুণের নিধি।
মাঠে থাক ধেনু রাখোয়ালের মতি
তুমি তো চিকণ কালা না জান পিরীতি।
মাঠে শোভে ধেনু রাখোয়াল সনে রে মেলা
তুমি ত সুন্দরী রাধে কানু কেনে কালা।
বাঁশির সনে কি হয় কথা কেহ নাহি শুনি
কানু কালা রাধা গোরা সর্বলোকে জানি।
হাতে শঙ্খ কানে সোনা পিন্দনে পাটের
শাড়ি
বাহু নাড়ি কহে কথা রাধিকা সুন্দরী।

॥ ৩০১ ॥

কে কে যাইবা যমুনার জলে কার সঙ্গে
আমি যাইমু
কানাইয়ার দরশন কোথায় গেলে পাইমু।
বাপে দিল জনম খানি মায়ে দিল ক্ষীর
সৈয়দ মর্তুজা কহে জনমের ফকরি।

॥ ৩০২ ॥

[ললিত রাগ]

ভজহোঁ নজর কর বদর দেওয়ান।
জর জর তরণী জলনিধি পায়ত
তরায়ত তরঙ্গ তুফান ॥ ধু।
গহন গয়রি ঝড়ি পবন বান ভরি
জীউকে লাগাই ধন্দ।
আপে কাণ্ডারী হই পার উতারাই
দেয়ান মরদ মছলন্দ ॥
ঘড়ি ঘড়ি পেয়ালা ভরি ভরি পিউবে
হরি চরি লহরী জোগান।
পিরপদ শিরোহু নয়ানে প্রণামহুঁ
হীন অনন্তহু ভাণ ॥

॥ ৩০৩ ॥

রঙ্গের বারই আর মুরশীদ
কোন্ কলে বানাইলা নৌকাখানি।
রঙ্গের বারই বানাএ নৌকা
প্রথমে নায়ের দাঁড়া।
সাত বিষতের নাও বন্ধে বন্ধে জোড়া
রঙ্গের বারই বানাএ ভরা সারি সারি।
ঘাটে ফেলাইয়া নাও পলাইব বেপারী।
তামা কৈলুম সীসারে সীসারে কৈলুম মাষা
মুর্খে বানাইল নৌকা
পণ্ডিতে না পায় দিশা।

॥ ৩০৪ ॥

[রাগ ভৈরব]

আল্লা ভাব, ভাব করিম, রহিম।
নানা চিন্তা উঠে মনে কি হালে তরিম। ধু
আল্লার নামে তোলাও ঘর
পীরের নামে ছাও
মুরশীদের নামে লেপি ঘর
সুখে নিদ্রা যাও।

॥ ৩০৫ ॥

আয় মুরশীদ দিল নাই তোর
আসন কেনে হেলে।
আসনে নাই তোর থিতি।
পানি কান্দে পানির তরাসে
আগুনি কান্দন করে জাড়ে
সাঁতালি পর্বতে রহিছে মুরশীদ
এক গাছি লোমের আড়ে।
এক গাছি ধুবুলার গাছে মুরশীদ
তাত বগুলার বাসা।
খঞ্জন পক্ষী হইয়া আহার যোগাই।
পিষ্ঠেত বান্ধিয়া নৌকা।
সায়রে ভাসিল নৌকা
কাঁকড়ায় কাটি দিল কাছি।
বালুচরে ঠেকিল নৌকা
পিপঁড়ায় মনে মনে খুশী।

॥ ৩০৬ ॥

বন্ধুয়া মোর কালিয়া সোনা
তোমারে পাইয়াছি বন্ধু করিয়া
কামনা। ধু।
যথা তথা যাও বন্ধু আসিও সকালে
তিলেক বিলম্ব হইলে ঝাঁপ দিমু জলে।
তুমি তরু আমি লতা রহিছি জড়িয়া
বহুদিনে হইছে দেখা না দিব ছাড়িয়া।
আমি ভাবি বন্ধু বন্ধু ভাবে ভিন
বন্ধুরে কি দোষ দিমু আপনার কুদিন।
বন্ধুয়া মোর গোপতের পতি
পাষানে নিশান রাখে ওই বন্ধুর পিরীতি
বন্ধুয়া বন্ধুয়া আকাশের তারা
তিল মাত্র না দেখিলে নয়ানে বহে ধারা
কেহ বোলে কালা কালা আমি বলি শ্যাম
হৃদেত লেখিয়া রাখম কালার নিজ নাম।

॥ ৩০৭ ॥

পিরীতি অমূল্যধন এবে সে জানিলুম সই।
আমি পিরীতে ডুবিলুম সই।
কে কে যাইবা সই দধি বেচিবারে।

আমার দধি বিক্রয় হইবে কানাইয়ার
বাজারে।
দধি নষ্ট দুগ্ধ নষ্ট আর নষ্ট ননী
তা' তুন অধিক নষ্ট কানুর মুখের
বাণী সই রে
কে কে যাইবা সই রে বাড়িতে কৈও খবর
বেলা গেল সাঁজ হইল কানাইয়ার
বাজারে।

॥ ৩০৮ ॥

হাম নারী অভাগিনী নিদের কাতর
নিদের লাগি হারাইলুম সোয়ামী সুন্দর।
শুকাইল সরোবর মৎস্য নিল চিলে
হারাইলুম মুর্শিদের জ্ঞান
কামিনীর কোলে।

আষাঢ়-শ্রাবণ মাস খালে নালে পানি
জোড় না হারাইয়া কান্দে বনের হরিণী
বনের হরিণী বোলে কার ধার ধারী
গায়ের মাংসের লাগি জগতের হইলুঁ বৈরী
ঐ কূলে বন্ধুর বাড়ি মধ্য দিয়া নদী
উড়ি যাইতুম সাধ করি পাখা না দে বিধি
শারী শুয়া দুটি পক্ষী গতরেত চরে
উড়ি গেল পাঞ্জরের শুয়া
ফিরে না আইল ঘরে।

॥ ৩০৯ ॥

কোন্ বোধে উড়িমু নাথ রে
মুই না দেখি উপায়।
স্তর নাহি কূল নাহি রৈবার নাহি ঠাঁই।
বল বুদ্ধি হারাইয়া নাথ ভাসিয়া বেড়াই। ধু
কলি হইল বলীরে রাজা ধর্ম নাহি মানে
আপন পর পরিচয় নাহি নাথ
বিবাদে জনে জনে।
'নাথ নাথ' করি মুই হইলাম ব্যাকুল।
এইবার উদ্ধার কর দয়াল ঠাকুর॥
এই পঞ্চ মিলাইয়া মুই বাণিজে আইলুম
পাইয়া অমূল্যধন মূলে হারাইলুম॥
নাথ, দরিয়া-তরঙ্গ দেখি হইলাম ব্যাকুল॥
এইবার উদ্ধার কর দয়াল ঠাকুর।
ছিঁড়িল পাল সব দড়ি উনমত বায়।
মালুম ধরিয়া সাধু বোলে
হায় রে হায়॥

॥ ৩১০ ॥

[ললিত রাগ]

সামাল কাল সাহা কাতাল ভূপাল
জগত জঞ্জাল আগি গতান্তরে যার লাগি
নিবার দারুণ ভব জাল॥ ধু
খণ্ড খণ্ড কিএ তনু জোর হএ পুনু পুনু
গোর হোন্তে মৃতক জিয়াও।
তুহ্মি সাহা গুণে শক্ত প্রভু পদে
অতি ভক্ত
মনোবাঞ্ছা তুরিতে মিলাও॥
জাতি কুল প্রাণি ভয় গুণি মর্ম বিদরএ
হিয়ে মোর নিত্য অহি জাপ।
সহজে সুজন তোহো তুয়া পদে নিবেদহোঁ
নিদানে মদত হয় আপ॥

জগভরি খ্যাতি সাহা করিম কাতাল নাহা
বিপক্ষ সময়ে পক্ষ সার।
পদযুগে শির রাখি প্রণামি প্রসাদ মাগি
সৈয়দ আফজল তরিবার ॥

॥ ৩১১ ॥

[বেঙউর পুরী ভাটিয়াল]

মন চেতাও আপনা
জীবন কভু নহে সার যেহেন স্বপনা। ধু
তলব হইলে সঙ্গে কি লইয়া যাইবা
চাহিবেক চৌকি ঘাঁটি কি উত্তর দিবা।
উত্তম কি ভেট লৈয়া ঠাকুর ভেটিবা
প্রতি শ্বাসে কোন্ কর্ম করিছ বুলিবা।
শ্রবণে শুনিলা কিবা শব্দ সুললিত
মুখে কোন্ জাপ সার জপিলা স্মরিত।
দুই হস্ত পদযুগে কৈলা কোন্ কাম ৹
অঙ্গুলীতে জপ মালা কি লইলা নাম॥
চিতান্তরে জিউ মূলে কি রূপ দেখিলা।
হিয়ার মাঝে কেবা আছে
তারে নি চিনিলা॥
কহে সৈয়দ আইনুদ্দিনে মন বিভোলিয়া
ভোর ছাড়ি সাধ জ্ঞান পন্থ উদ্দেশিয়া॥

॥ ৩১২ ॥

[তুড়ি কেদার]

সই রে কতদিন জীবনা।
দেখ কতদিন জীবনা।
কোথা রৈবে মায়া মোহ
কোথা রৈবে চারু দেহ
কোথা রৈবে কামের কামনা। ধু
কোথা রৈবে রঙ্গ-হাস কোথা রৈবে
লাস হাস
কোথা রৈবে এহি রূপ-যৌবনা।
কোথা রৈবে ধনজন কোথা রৈবে জ্ঞাতিগণ
কোথা রৈবে এ সাজ মোহনা।
কোথা রৈবে অহঙ্কারী কোথা রৈবে
গৃহবাড়ী
কোথা রৈবে এ সুখ শোহনা।
কহে সৈয়দ আইনুদ্দিন ঠাকুর করহ চিন
যবে আছে ঘটেত চেতনা।

॥ ৩১৩ ॥

[কুহু]

জাগরে অবোধ অবোধ মন জাগরে
প্রভাতে।
ইব্লিস পাতকী সবে ফিরে সাথে সাথে।
জাগিয়া প্রভুর সেবা এক মনে কর।
মরিবার কালে তুমি সব আগে মর।
জীবন থাকিতে যদি পার মরিবার।
তবে কাল যম হস্তে ভয় নাহি আর।
নূরের ফিরিস্তা আসি বাঁটি যায় নূর।
শয্যাসুখে নিদ্রা যাও, একি ব্যবহার।
বনবাসী পাখী সবে বিপিনে থাকিয়া।
জপএ প্রভুর নাম প্রভাতে জাগিয়া।
কহে সৈয়দ আইনুদ্দিনে হামো ভোর মতি
নিশি অবশেষ হৈল না ভজিলাম পতি।

॥ ৩১৪ ॥

[আশোয়ারী]

কি কর কি কর ভাই, অবোধ চরিত
এ সুন্দর কায়াখানি মজিব মাটিত। ধু

ভাল হেন জানিয়া না করহ মান
মৃত্যু হৈলে পরিণামে না রৈব গুমান।
অহঙ্কার সনে মনে কিছু না রহিব
ছোট বড় যত ইত্তি মেদিনী গ্রাসিব।
ঠাকুরে-দাসেরে দেখ গোরে নাহি চিন।
এহা ভাব কহে হীন সৈয়দ আইনুদ্দিন।

॥ ৩১৫ ॥

জ্বালাইয়া রাখ রে বাতি জীবা যতদিন। ধু
তিহরিতে ফুক দিলে ত্রিবেণী সন্ধান।
পবন উদ্দেশে কায়া আয়ু পরিমাণ
ভাটিতে গমন হইলে ধরিও উজান।
অমর কুণ্ডের জল পিবা অনুদিন।
বায়ু ভোগ ভোগিলে সে জীবা কতদিন
ঘট মধ্যে তিনগুণ কায়া-সুধা-মাটি
সাধকে সাধিলে কায়া না পড়িব ভাটি।
কহে সৈয়দ আইনুদ্দিনে না করিও হেলা
গুরু সেবা হন্তে জান না হয় আন্ধলা।

॥ ৩১৬ ॥

সোনা বন্ধুরে আমার প্রাণ বন্ধু
আইস যাও তুমি
নিন্দারে না দিও মন হে। ধু
মন্দ মন্দ করি উত্তরে দক্ষিণে
বহএ শীতল বাও।
বন্ধুয়া বলিয়া হাত বাড়াইলুম
প্রেমরসে বান্ধি গেল গাও।
প্রেমের সাগরে হিল্লোল উঠিল
কম্পএ মুই নারীর হিয়া।
অধরে অধর যুগল দিয়া রে
নিবাও প্রেমরস দিয়া।
হেন সাধ লয় মুই নারীর হৃদেতে
তোমারে রাখিতুম ভরিয়া।
চম্পা গাজী ভণে না ভাবিও মনে
নারিবা রাখিতে ধরিয়া।

॥ ৩১৭ ॥

[রাগ কুমারী]

জাগরে জাগরে প্রিয়া নিদের কাতর। ধু
হস্তী জাগে ঘোড়া জাগে জাগএ দুয়ারী।
রাজঘরে হইল চুরি এ রাজ কুমারী।
প্রিয়, মোর ঘর আঁধিয়ারা বাহিরে পসর।
আজ ভালাই আছে প্রিয়া যাও নিজ ঘর।
কহে হীন চম্পা গাজী করিয়া বিচার।
ওই বন্ধু সদয় হইলে সকলি আমার।

॥ ৩১৮ ॥

[ধানসি দীপিকা]

রে মোর বনবাসে বাস
বসন্তি নদীয়ার তীরে তার কিবা আশ। ধু
আশে আশে বনবাসে দিন গেল বৈয়া
না পূরিল মনের সাধ যাইমু কি না লৈয়া।
নয়া নয়া বনস্পতি তরুয়া গান্তারি
চলিতে না চলে ভুর ভরা হৈল গাড়ি।
ভরিয়া না ভরি ভরা ভাসাইনু" তরঙ্গে
কেহো হাসে কেহো ভাসে
কেহো চাহে রঙ্গে॥

এ রঙ্গ নাসিরুদ্দিনে মন দুঃখে কৈলুম
নদীয়ার কিনারে বাসা বনে এড়ি আইলুম।

॥ ৩১৯ ॥

[শ্রীরাগ]

দিনে দিনে আইসে রে নাথ মোর
বাড়ির খবর।
কি লৈয়া যাইমু দেশে শূন্য দুই কর। ধু
ভরিলুঁ সুবর্ণের ভরা না রাখিলুঁ ধারে।
লহরে মারিল নৌকা পাইয়া বালুচরে॥
ভরিলুঁ সুবর্ণের বণিজ না বুঝিনু ভাও।
শুকাইল যমুনার জল চরে লাগিল নাও॥
যত ছিল পাইক মাঝি সব দিল লুক।
না জানি নসিবে মোর কত আছে দুখ॥
স্তর নাই কুল নাই রইবারে নাই ঠাঁই।
বল বুদ্ধি হারাই আমি ভাসিয়া বেড়াই॥
কোন পন্থে যাইমু আমি না দেখি উপায়।
কি বুদ্ধি করিব নাথ ভাবিয়া না পাই।
কলি হৈল বলীরে ধর্ম নাই তার মনে।
বল বুদ্ধি হারাই আমি ফিরি বনে বনে॥
কহে নসির মহম্মদ তরিতে ভবসিন্ধু।[১]
প্রভু বিনে নাই মোর দীন দয়াল বন্ধু॥

॥ ৩২০ ॥

[প্রভাত]

করিম রহিম তোর নাম রে আল্লা
করিম রহিম তোর নাম।
এ নাম নিছনি লাখ কোটি মণি
ভাবি চিন্তি নাহি পাম। ধু
বেদে শাস্ত্রে লোক সবে ঘটে ঘটে
আল্লা বোলে
ভাবি চিন্তি না পাইএ চিন।
মানবেত জন্ম হইলুঁ বুদ্ধিহীন হই রৈলুঁ
তাত আর হই জ্ঞানহীন।
গুরু মুখে যেই শুনি সবে চাহ মনে গুনি
দশ নাম শরীর মাঝার।
দশ স্থানে দশ নাম দিয়াছন্ত অনুপাম
সেই দশে বোলে নৈরাকার।
এক মোকামেত এক নৈরাকার পরতেক
রহিয়া চালাএ কায়াখান।
কীট আদি পশু নর ত্রিভুবনে জীব ধর
সবের ঘটেত এহি জান।
দশ নাম লক্ষ্য করি গোটা কায়াখানা জুড়ি
প্রতি ঘটে বোলে নিরঞ্জন।
এতিম কাছিমে কহে শুন কহি সভামএ
হয় কিবা না হয় এ বচন।

॥ ৩২১ ॥

[প্রভাত]

চাকরির নাই মোর সাধ
যুবতী বোলে চাকরির নাই মোর সাধ।
ঘরের জঞ্জাল নিতি কোন্দল তাল
সদাএ বাদ বিবাদ। ধু
খাসী জব করম বকরি জব করম
মাঝিরে খিলাইতুম খানা।

১ দরিয়া তরঙ্গ দেখি স্থির নহে মন
নাসিরদ্দিনে কহে ভাব নিরঞ্জন।

হাত জোড় করি তুঝি মাঝির চরণে পড়ি
চাকরি করি দেয় মানা।
শাশুড়ী গঞ্জনা ননদী তাড়না
সতিনী রিখে আড়ে আড়ে।
দেবরিয়া চাতুরি ভাশুরে রহে হেরি
সাক্ষী বোলাইমু কারে।
জায়ের বচনে না সহে পরাণে
গৃহে সাধ মোর নাই।
এ সব শত্রুর জ্বালা শরীর হইল কালা
মনে লএ বন্ধুর সনে যাই।
তুমি বন্ধু ঘরে রৈলে সব দেখ দ্বন্দ্ব হৈলে
দোষগুণ কিবা হয় কার।
রিপু কাছে মোরে এড়ি মাঝির সঙ্গে চাকরি
যাইতে চাহ না করি বিচার।
যদি বন্ধু ঘরে থাকে মন্দ না বোলএ মোকে
রিপু সব আঁখি হয় ঘোর।
শাশুড়ী ননদী সব মনে পাএ পরাভব
সতিনী আদি হএ কোর।
এতিম কাছিম বাণী শুন সই সজনি
মোর দুখ দেখ প্রতি নিত।
পরিণামে সাক্ষি দিবা এক মিছা না কহিবা
যবে হই সোয়ামী বিদিত।১

॥ ৩২২ ॥

কত কাল রাখিমু ভাও দিয়া বাণিজের নাও
কত কাল রাখিমু ভাও দিয়া।
অকুলি সমুদ্রে ভাসি কুল না দেখিয়া॥ ধু
নৌকা সাজাইয়া রে সায়রে দিলুম খেবা।
দিন অবশেষে আন্ধার কৈল দেবা॥
ঘন সর পবনে দরিয়া দিল ডাক।
ছিঁড়িল পানসী দড়ি লৈল নৌকায় পাক॥
পাতোয়ালে না ছাদে পানি
পানসী বিহীন।
কুলাইতে না পারি নৌকা
বাহি নিশি দিন।
লঙ্গরে না করে ধাই লহর তুফান।
স্থির হৈতে নারে নৌকা লাহুত বিমান॥
কাণ্ডারীর খীল নড়ি হৈল লক চক।
বাদোয়ানে কিঞ্চিত চলে পবনে করি লক॥
পাতোয়াল অতি বানে তরণী কি মূল।
খেনে ডানে বামে হানে না দেখিএ কূল॥
দিশার 'না' লো বেদিশ হৈল ঘন
সর বাও।
কাণ্ডারী কাণ্ডার এড়ি বোলে বাও বাও॥
মালুম গাছ ধরিয়া সাধুএ বোলে
হায় রে হায়।
না জানম পাগলা সাত্রিয়া
কোন্ ঘাটে ডুবায়॥
কোতোয়াল চরন্দারে না লৈল খবর।
নৌকা ঠেকিয়া রৈল চরের উপর॥
এতিম কাছিমে কহে বণিজ অবশেষ।
নৌকা ছাড়ি সাধু ভাই যাইব নিজ দেশ॥

১ শাশুড়ী-লোভ, ননদী-ঘুম, সতিনী-কাম, ভাশুর-ক্রোধ, দেবর-সয়তান, জা-মায়া, বন্ধু-পতি, সই-ক্ষমা।

॥ ৩২৩ ॥

মোর পিয়া নিমায়া অতি বেদনি সই রে
মোর পিয়া নিঠুর অতি।
এ সব পড়শী মোরে বলে দোষী
কেমনে রাখিমু জাতি ॥ ধু।
আগ দুয়ারেত পালঙ্কে আছিলুঁ নারী
বন্ধুয়া আসিব রে আশে।
হাম অভাগিনী জনম দুখিনী
রাত্রি পোহাইল মোর বন্ধু-আশে ॥
আজু কালু করি দুয়ারে বসিয়া ঝুরি
তুঞি বন্ধু আসিবি করি।
রাজ পন্থ দিয়া বাঁশী বাজাইয়া যাও
তিলেক না চাহ ফিরি ॥
না জানি করিলুঁ পাপ বন্ধু দিল এত তাপ
অহি ভাবে দহে মোর হিয়া।
সতিনীর রিষ দেখি জল ঝরে দুই আঁখি
তাত নিদারুণ হৈল পিয়া ॥
মুই নারী করিলুঁ দোষ এ কারণে করি রোষ
ফিরিয়া না চাহ একবার।
জ্বালের সহিতে রাখি জনম করিলা দুখী
আর দুঃখ নারি সহিবার ॥
এতিম কাছিমে কহে শুন বন্ধু দয়ামএ
তোমা ভাবে জীবন তেজিমু।
গঞিল জনম মোর পন্থের না পাই ওর
তুমি বিনে কা'ত নিবেদিমু ॥

॥ ৩২৪ ॥

তুই যদি না দিস রে দেখা
মুই ত না ছাড়িমু।
তোর ভাবে উদাসী হৈয়া বিষ খাইয়া
মরিমু ॥ ধু।
তুমি আমার প্রাণের প্রিয়া
আমি তোমার দাস।
তোর ভাবে হৈয়া রে পাগল
হইয়াছি উদাস ॥
প্রেমের ঘটে নানা বাটে পন্থ আছে বেশ।
উঠি গিয়া প্রাণের প্রিয়া
ধরিমু তোমার কেশ ॥
তুমি আমার আমি তোমার
রহিয়াছি জড়িয়া।
প্রেমটি দিয়া প্রাণের প্রিয়া রাখ
ছাপাইয়া ॥
ভণে বহরাম হীনে প্রেম না চিনে
গুরু বিনে কোই
প্রেম বাজারে বসি মধু পিয়
গুরু সঙ্গে লই।

॥ ৩২৫ ॥

আরে ভরিয়া সুবর্ণের ভরা
না রাখিলাম ধারে।
লহরে মারিয়া রে নৌকা ঠেকাইল
বালুচরে রে নাইহরের বন্ধু
আরে কালা ধলা দুইটারে পাখী
এই সংসারে চরে।
আপনার মন পরিচয় নাই
বিবাদ ঘরে ঘরে ॥
আহাদ আছিল রে প্রভু মিম জন্মাইয়া।
ত্রিভুবন সৃজিল রে প্রভু কুদরুতে কল্পিয়া ॥

সবে বোলে কালারে কালা আমি বলি শ্যাম
কালার ভিতরে লুকাই রে
রৈছে মওলার নিজ নাম ॥
আসমান কালা জমিন রে কালা
কালা পবন পানি ॥
চাঁদ কালা সূর্য রে কালা
কালা মওলাজি রব্বানী ॥
কহে রে বদিয়ুজ্জমা একি ধন্ধকার।
আয় মিম একাযুক্তে কর রে নিস্তার ॥

॥ ৩২৬ ॥

[গৌড়ী রাগ]

মন মোর ছোড়ল এই না গৃহ আশ।
দেখ পুত্র পরিজন কেহ নহে কারণ
অসার জীবন পরবাস ॥ ধু।
এ রূপ যৌবনখানি এ ধন সম্পদ কানি
কভু সার হেন নহি জান।
নিজ পিতৃ ভূমি জাত অবশ্য মিলিব তাত
না রহিবে কায় সম্মান ॥
তেজি জগ কূল ভোর এ মায়া কামিনী কোড়
সৎ পন্থে চল আপনার।
পরমার্থ করি ভাব কুল নীতি কর জাপ
পরলোকে হইতে উদ্ধার ॥
সাহা আইনুদ্দিন গুরু সদাএ কল্পতরু
মোহাম্মদে পূরাইবে আশ।
তছু পদ মনোহর সেব রহি নিরন্তর
হইবেক পতিত বিনাশ ॥

॥ ৩২৭ ॥

সঙ্গে নিতে নারিমু তোরে
দুর্লভ রতন। ধু
তুমি ত খাকের তন হৈবা অদর্শন
আর তিন তোমার সঙ্গতি।
পবন-অনল-নীর মহাবলবন্তবীর
কার সঙ্গে বাড়াইলা পিরীতি।
নর জাতি হীন মতি
করএ গুমান অতি।
এ গুমান ভাঙ্গিতে পারে বিধি।
যে দিনে হিসাব হবে
ভাল মন্দ দেখা যাবে
তরাজু সাক্ষাতে নেকি বদি।
হেলাএ না দিল ছানি
নিবিল আনল খানি।
আজু তোমা নিকট মরণ।
আছএ সঙ্কট তোর
আগে ডাকু পাছে চোর
চৌদিকে বেড়িব আসি তোরে।
যমে হরি নিতে প্রাণ
দেখি হারাইবা জ্ঞান।
যাইবার কালে সঙ্গে নিরাকার
দুই গাছি এক গোটা
মাঝে তিলকের ফোঁটা
গুরু উদ্দেশিলে পায় সেই ফল।
কহে রজব আলি হীনে
পন্থ নাই গুরু বিনে
নিত্য জান তিহরীতে আসন।

॥ ৩২৮ ॥

[দুঃখী-ভাটিয়াল]

আবের পত্তন ঘর খাকের বন্ধন
তার মাঝে করে খেলা শ্যাম নিরঞ্জন।
পবনে চালাইয়া দাগ আতসের পানি
রসের ঠিকুনি ঘর মোমের গাঁথনি।
তার মধ্যে জুড়িয়াছে সুবর্ণের ফুল
পাতালে সে উৎপত্তি স্বরগে তার মূল।
তার অঙ্গে সুগন্ধি সুরভি খেলায়
সেহ ফুল নিরখিলে বন্ধুর দেখা পায়।
দুই মুখে ফুটে ফুল ঘরে দীপ জ্বলে
প্রেম নিরখিয়া দেখ গোলাম হোসেন বলে।

॥ ৩২৯ ॥

নবীর কলেমা পড় মুখে, মোমিন ভাই রে
নবীর কলেমা পড় মুখে। ধু
রাত্রি অবশেষ কালে
ফিরিস্তা ডাকিয়া বোলে
আমি সব যাই নিজ স্থানে।
ভূত প্রেত দৈত্যবর ফিরে প্রতি ঘরে ঘর
তুমি সব রহ সাবধানে।
রাত্রি হৈল অবশেষ রবি হৈল পরকাশ
শয্যা হইতে উঠি বৈস ঘরে।
যেই অঙ্গে বহে স্বর সেই অঙ্গে ধরি ভর
গৃহ হন্তে নিকল বাহিরে।
ভূমিতে যে দিয়া পাও স্মরি নিজ বাপ মাও
নিজ নাম লইবে যতনে।
অন্তর দখলে যাইবা নুরের পেয়ালা পাইবা
তবে পাইবা রসুলের দিদার।
যাহার জরুর যাইবা সাফ অজু করিবা
কলেমা পড়িবা মোমিন ভাই।
যে পড়ে কলেমা সার সিন্ধু নদী হইব পার
আখেরে ভিহিস্তে হইব ঠাঁই।
ভিহিস্তের হুর সঙ্গে থাকিব কৌতুক রঙ্গে
আনন্দে রহিব সুখে আর।
ক্ষুরের সাঁকোয়া পার চুলের ধরণী আর
দুই হস্ত নাড়ি হইবা পার
অধীন হাসমতে ভণে এই কথা লয় মনে
আখেরে কলেমা হৈব সার।
নবী সবাকার সার জগতে না দেখি আর
তিনি হন্তে লোকের উদ্ধার।

॥ ৩৩০ ॥

কোন্ ঘড়ি চাপিয়া মারে
ঐ সে মরম ভরে।
রত নহে পাগলা মনাই রহিতে
না দে ঘরে ॥
আঁত গেল দাঁত গেল ঘরের গেল ছানি।
দুই আঁখি বাহিয়া পরে ভাঙ্গা ঘরের পানি।
হাট রাঙ্গা ঘাট রাঙ্গা লাল পাঞ্চনি।
লুপালুপ করিয়া খোল আখের পানাপানি।
সব সখী যায় তারা হাট করিবারে।
তৈল সিন্দুর লইয়া তারা গাঁথিলা মালা রে।
ভাঙ্গা ঘর ভাঙ্গা বাড়ি এই ভাঙ্গা দুয়ার।
ভাঙ্গিয়া পড়িল ঘর কে তুলিব আর ॥
এ দেশের মালিয়া দেবায় ভাঙ্গা ঘর ঘিরে।
দেবার গর্জন শুনি পরাণি কাম্পে ডরে ॥

হীন আসকে ভণে গুরুর পদে ছায়া।
তন্তু মনে কর সেবা পাইবা সে দয়া ॥

॥ ৩৩১ ॥

রহিয়াছে প্রভু করতার।
অমাবৈস্যা প্রতি পদ তুতিয়াএ লৈল হট
জোয়ার না ফিরে একবার।
কী করিমু কোথাএ যাইমু কাতে যুকতি বিমর্ষিমু
এবে সে মরণ হৈল সার।
আব অতস বাত খাকের ধড় বাঁশী ফুকে নিরন্তর
না বুঝি রাধিকা অভাগিনী।
তুই বাঁশী এক স্বর নৌকা ঠেলে বারে বার
নৌকা ঠেকিল বালুচরে।
মুই অভাগিনী নারী নিশিদিশি বসি ঝুরি
বন্ধুরে দেখিতে একবার।

বন্ধু মোর নিঠুর হৈল আন্ধা প্রতি ছাড়ি গেল
এ ঘর করিয়া অন্ধকার।
কাজলা কোঠার ঘর আন্ধার হৈল মোর
সব মোর হৈল অথান্তর।
দিব্য আঁখি ধন্দ ধরি অনেক যতন করি
মানে বৈসাইলা বাম পাশ।
বাম পাশে থাকি চোরে মানিক্য হরি নিল মোরে
একা আন্ধি কি বুলিমু কারে।
ফকীর সাহার বাণী পির পদে তত্ত্ব জানি
রৈলুম চরণে তোহ্মার।

॥ ৩৩২ ॥

[লাচারী]

পড়েছি বিষম পাকে, তুই আঁখি ঘোর দেখে'
ছাড়িতে না পারি মায়াজালা।
তুই আঁখি ঘোর করি, থাকি সেই রূপ হেরি
মনে জপি সেই জপমালা ॥
মনে ভাবি অবিরত, দিবানিশি পোড়ে চিত
দুর্গম দেখিয়া প্রাণ উড়ে।
ভাবিতে তাহার লেহা, সঘনে হারালেম দেহা,
অবিরত অগ্নি হৃদি পোড়ে ॥
মীন কুম্ভীর হৈয়া, সমুদ্রেত প্রবেশিয়া,
কিবা হৈব পাখীর আকৃতি।
ভ্রমিব সকল গিরি, পিউ পিউ শব্দ করি,
তল্লাসিব পিয়ার মূরতি ॥
অনলে পশিয়া চাব, তবু যদি নাহি পাব,
তার ভাবে পরাণ ত্যজিব।
নুর মহম্মদ ভণে, ব্যস্ত কেন হে ললনে
বিধি তব মানস পূরিব ॥

॥ ৩৩৩ ॥

[রাগ ভাঙ্কা]

পরান বেদনি সই
জনম বিফলে গেল বৈয়া। ধু।
রস নিলা ব'স[১] নিলা রূপ নিলা হরি।
মিছা মিছি মায়া জালে বন্দী হৈয়া মরি ॥
না চিনিলাম ঘাটের ঘাটিয়াল কেমন জনা।
এ তন ভেদিয়া দেখ কেহ নহে আপনা ॥

১ ব'স—বয়স।

দুঃখ নিবারণ বাণী কহে আবদুল মালী।
বিচারিলে কি ধন পাইবা ভাণ্ড হৈল খালি ॥

॥ ৩৩৪ ॥

[রাগ আসন ভাটিয়াল]

চেতাও আপনারে মনাই, চেতাও
আপনারে মনাই।
কে তোর আপনা ॥ ধু।
উত্তম কি বেশ লইয়া ঠাকুর ভজিমু।
ঠাঁই ঠাঁই চৌকি ঘাঁটি কি উত্তর দিমু ॥
মনমত হইয়া রে হইলুম বিভোর।
প্রেম ফান্দে বাঝি পন্থের না লইলুঁ ওর ॥
হীন আব্বাছে কহে মনে বিমর্ষিয়া।
ঘর ছাড়ি সাধ জ্ঞান পন্থ উদ্দেশিয়া ॥

॥ ৩৩৫ ॥

[রাগ মালসি]

চল রে মুমিন ভাই রূপ দেখি গিয়া। ধু
এক হাতে বাজুবন্দ আর হাতে বাঁশি
সোন্দর ফকীরে কহে হামো পরবাসী।

॥ ৩৩৬ ॥

কৈ যাম কৈ যাম মুঞিরে ননদীর আগুনে।
রাত্রি দিবা কানাকানি না সহে পরাণে।
শাশুড়ী ননদী জাল সতিনী মোহিনী
এক ঘরে চারি জন মুঞি সে অভাগিনী ॥
সোয়ামী রসিয়া নাগর মুঞি
সে অভাগিনী।
ননদীর বাক্য ধরে তত্ত্ব নহি জানি ॥
সোয়ামী পদে সেবা দিতে রহে না চিত।
এত দুঃখ দেখি আঁখি ভাঙ্গি পরে নিত ॥

মোহম্মদ হাসিমে কহে শুন রে বউয়ারি।
কালকেতু হইল বৈরী ননদী তোমারি ॥

॥ ৩৩৭ ॥

[তুড়ি রাগ]

তোমা নাম ঠামে ঠামে রে নাম।
অনন্তে না পায় অন্ত নাম কোটি কাম ॥ ধু
এথা ওথা যথা তথা ভরি ত্রিভুবন।
নানা রঙ্গে খেলা-মেলা নাহি দরশন ॥
হেন জানে কোন জনে কেমন কারণ।
যে জনে কহিতে পারে গোপ্ত নিরঞ্জন ॥
মোহাম্মদ হাসিমে কহে আজু বিবরণ।
কিছু কিছু বুঝে যদি ললাট লিখন ॥

॥ ৩৩৮ ॥

হৃদয়ের মাঝে মন-ভোমরা
চিনিতে না পারি মন শতদলে। ধু।
মন মত্ত হাতী মন কর স্থিতি
মনেতে যন্ত্র না বাজে।
খেলে দূরে যায়, যেন মধু খায়,
বসিয়া কমল মাঝে ॥
মন আলাভোলা, মন সে পাগলা,
মন ভুলে রৈলাম পড়ি।
সতত নিকটে মন চিনিতে না পারি
রে মন শতদলে।
মনে খানা খায় মনে নিদ্রা যায়
সদায় দেখে নিরঞ্জন।
আয়ু ফুরাইলে পবন ঘটিলে
হয় অবশ্য মরণ ॥

কহন্ত হাসিমে যেবা রহে ঝিমে
বুঝিয়া মনের রীত।
গুরু পদ শিরে বন্দি বারে বারে
রচিলাম এই গীত ॥

॥ ৩৩৯ ॥

কিরূপে যমুনা হৈমু পার রে প্রভু
দীননাথ। ধু।
করিম রহিম সার, গফুর সাত্তার গাফ্‌ফার
তুমি বিনে গতি নাহি আর।
আহা প্রভু নিরঞ্জন তুমি নিধনীর ধন
বাঞ্ছা সিদ্ধি করহ আমার।
মাতাপিতা ছাড়ি আইলাম
নৌকাখানি নহি পাইলাম
এবে বুঝি মরণ হৈল সার।
পার কর ঘাটোয়াল সাঁই
তুমি বিনে লক্ষ্য নাই
অপরাধ ক্ষেমিয়া আমার।
তরঙ্গ তুফান দেখি ধারা বহে দুই আঁখি
এই ছিল ললাট মাঝার ॥
ভয়ে ক্রমে হিয়া ফাটে
আরো একাকিনী ঘাটে
ইষ্ট মিত্র সঙ্গে নাহি আর।
আল্‌হামদুর অতি মূল 'কুলিয়া' করিব কূল
বিসমিল্লা সদাএ জান সার ॥
সংসারে কুকর্ম ছাড় নবীর কলিমা পড়
বিধাতাএ করিব উদ্ধার।
অসমে তরিবা মন ভজ নবীর দুই চরণ
মোহাম্মদ রসুল আল্লার ॥

কহে হীন দুলা মিয়া
কেবল ভবে মিছা মায়া
ভাবি চাহ অসার সংসার।

॥ ৩৪০ ॥

দুনিয়ায় আখের কানা।
আখের কানা নাই ঠিকানা
বান্দা অসার সংসারে—
অই ভাবনা সদাই উঠে মনে ॥
মিছা কাজে ভবের মাঝে
সদা রহিলা মজিয়া।
কি লই যাইবা বান্দা দুনিয়া ছাড়িয়া রে ॥
করতারে পাঠাইছে রে বান্দা
করিতে বাজার।
কি ধন কামাই লইছ সঙ্গে আপনার রে ॥
আইয়া ভবেরে বান্দা তেজারত করিতে
কি ধন কামাই লইছ বান্দা
আপনার সঙ্গে রে।
আইলা ভবের মাঝে বান্দা ছাড়ি গৃহবাস।
লাভে হানি মূলে পুনি পুঁজি
হইল নাশ রে ॥

॥ ৩৪১ ॥

পার তরিতে উপায় নাই নবীজির
পদ বিনে। ধু
কৃপা করি করতারে জন্মাইল এ সংসারে
আয়ু জ্ঞান ধন দিয়া।
কল্যাণ সেবিবারে ভবেত আসিছ মন
বিকি কিনি কর ধন।

আয়ু-ধন দিয়া কিন ইমান-রত্ন ভবে
জ্ঞান দিছে করত্তারে।
এক প্রভু চিনিবারে অসার সংসার তেজি
ঐ স্বামী ভজ সবে।
যেখনে ত শিশু ছিলুম ভাল মন্দ না বুঝিলুম
হেলায় জীবন গেল।
না পূজিলু ঁ নবীর পদ নবীন যৌবন
হৈল যবে
ভুলি রৈলুম মিছা ভবে।
কাল দুনিয়ার ফান্দে পড়ি
জীবন ধন হারাইলুম
এবে যৌবনে পড়িল ভাটি
বল বুদ্ধি গেল টুটি।
নয়ানে না দেখি আর শ্রবণে শুনিএ ভার
এবে কর হায় হায় ধন হারাই
কি উপায়
যবে প্রভু জিজ্ঞাসিব কি বুলি উত্তর দিব
কহে এর্শাদুল্লা এই আশা পীর পদে
গুরু লক্ষ্য হই আসবে তরান করতে
সঙ্কট কালে।

॥ ৩৪২ ॥

ভাবে ভুলি রৈবা কতকাল অবোধ মন। ধু
আসার সংসার লোভে
ভুলি রৈলা মিছা ভবে
মিছা কাজে গোমাইল কাল।
খাথার লইয়া নাও কতকাল উজানি বাও
সুজনে ফিরাই ধর পাল।
পুত্রদারা রাজ্যেশ্বর নবীন হিঙ্গুলের ঘর
এই সব রহি যাইব পন্থে।
পাপ পুণ্য সঙ্গে করি মনুরারে নিব ধরি
কেহ না যাইব তোর সাথে॥
না বুঝি মনুরা ভাই তাতে বহু লোভ পাই
ভুলিয়া রৈলা মিছা হাটে।
এ হাটের বিকি কিনি কেহ লাভ কেহ হানি
কেহ লাভ হারায় পড়ি বাটে।
না বুঝিব কাজের ধারা
পাছে ফিরে বাটোয়ারা
লাভ দেখাই লোভে ফেলি
এই হাটের বাটোয়ারী ইমান-ধনে করে চুরি
মনুরার ঘর করি খালি॥
দেব বংশ করি সঙ্গে বান্ধিছে ঘর নব রঙ্গে
সে ঘরের গৃহী কোন্ হয়।
কেবা দেখে কেবা শুনে
ঘরে থাকি বুঝে কোনে
না পাই তার পরিচয়।
হস্তে ত থাকিতে কড়ি না করিলাম সদাগরি
এখন ধন হরিয়া নিল চোরে।
অন্তকালে না চিন্তিলুম লোভে পড়ি
ধন হারাইলুম
কি লইয়া যামু নিজ ঘরে॥
এই হাটের ধন নর যদি নিতে চাহ ঘর
মুর্শীদ ভজহ কায়মন।
আপনা বিনাশ কর এক পীর লক্ষ্য ধর
তবে সঙ্গে নিতে পার ধন।
শাহা আলি রজা পীর জ্ঞানে অতুলিত ধীর
সে চরণে ভজি কায়প্রাণ।
গুরুপদ লক্ষ্য চিত্তে ত্রাণ বাটোয়ার হস্তে
গরীব এর্শাদুল্লাহ মাগিএ ত্রাণ।

॥ ৩৪৩ ॥

[প্রভাত]

কি রূপে যমুনা হইমু পার প্রভু
দীন নাথ রে।
লাহুত মলকুত জবরুত নাসুত
এই চারি মোকামের সার।
তরঙ্গ তুফান অতি নাহি দেখি কোন গতি
তরিবারে না দেখি উপায়।
লাহুতে তরঙ্গ অতি টলমল করে ক্ষিতি
জবরুতে করএ গল গল।
মলকুত আওয়াজ নাই শুখাইল সর্ব ঠাঁই
চারিঘর বন্দী তুরমান।
সব ধনী চলি যাবে খালি তনু পড়ি রবে
ভাঙা না'য় নাহিক ভরসা।

॥ ৩৪৪ ॥

অ সই কি লইয়া যাইমু নিজ ঘর রে।
নাইয়রের বন্ধু অ মুই কি লইয়া যাইব
নিজ ঘর : ধু
আরে দিনে দিনে আইসে রে যাএ
মওতের খবর।
কি লইয়া যাইব রে ঘরে শূন্য দুই কর॥

॥ ৩৪৫ ॥

মজিলে তিলেক না দেয় ঠাঁই।
সুন্দর তনু মজিলে তিলেক না দে ঠাঁই। ধু
মইল মইল করি হইল হুড়াহুড়ি।
খাটুনী বান্ধেরে ঠাঁই ঠাঁই।
মরিয়া না গেলা আল্লার বান্দা রে
কিছু নি রহিল কার ঠাঁই।
এ চারি ভাই মিলি এ সম্পদ জোড়াইলুম
এ সম্পদ বসিয়া কেবা খায়।
উরুয়া শেল দা কে তোরে মারিল রে
জোড় ভাঙ্গি কেবা লইয়া যায়।
মায় না কান্দন করে হা-পুতির পুত রে
ভৈইনে রে কান্দেরে সোদর ভাই।
আবাল সন্ততি কান্দে দুই চরণ ধরিয়া রে
একবার দেখ গোসাঞি।
আগে চলে ভাই এ খাট খাটোলা রে
কান্দিয়া চলে রে বাপ ভাই।
মরিয়া না গেল আল্লার বান্দা রে
চারিজন লই চল যাই॥

॥ ৩৪৬ ॥

[রাগ—বিহাগড়া]

অরে সুজন নাইয়া!
আমি কি বাণিজ্যে আইলাম ভাই রে
পরের পানুয়া নাও লইয়া॥ ধু।
সুজন নাইয়ার ধন বিচার করিব।
তিনে পলে হিসাব দিতে পরমাদ ঠেকিব॥
কি বণিজে তে আইলাম ভাইরে
লৈয়া পরের ধন।
চিনিয়া করিও খরিদ অমূল্য রতন॥
আকাষ্ঠা কাষ্ঠের নায় লাগিয়াছে
কতেক গুড়া।
সুজন কাণ্ডারীর 'না' শূন্যে করিব উড়া॥
'না' এর ভরসা নাই পলকে ডুবি যাইব।
সুজন কাণ্ডারীর নাএ উড়াল বৈঠা বাইব॥
উড়াল বৈঠা বাও 'না' এর পির মুর্সিদ
সওরিয়া।

অবশ্য দীনের নাথে লইবা উদ্ধরিয়া ॥
ভাঙ্গা 'না' এর ভাঙ্গা বৈঠা
তরাসে ঢাল পানি।
দমের উপর ভর করি 'না' এর দেও গাহিনি
যে ধন বণিজে আনলাম সব নিল চোরে।
কহে ফকির ভেলা শাএ
পরাণি কাম্পে ডরে।

॥ ৩৪৭ ॥

[রাগ ভাটিয়াল]

পন্থ চিনি না রে আরে মনা।
জনম বৃথা গেল আর ত আসিব না॥
সাধুর সাথে পন্থ লইয়া পন্থের কর দিশা।
ছাড়িলে পুণ্যের পন্থ পাইবার নাই আশা।
পন্থীর সনে পন্থ লইয়া পন্থে কর মেলা।
ডাকাতের সাথে পন্থ লৈলে ডুবাইব
দুপুরিয়া বেলা ॥
কালা নীলা দুই পন্থ এক পন্থে
লাগিয়াছে ঘটা।
বুঝিয়া চলিও পন্থে উপরে বিজলির ছটা ॥
সুজন সুজন ভাইরে পাগলা নদীর খেওয়া।
দড় মুইঠে ধরিও কাণ্ডার দক্ষিণে
চালাইছে হাওয়া॥
না হইল দরিয়া-খেওয়া না পাইলাম কূল।
কহে ফকির ভেলা শাএ ডুবিব লাভ মূল ॥

॥ ৩৪৮ ॥

খেবা বাঁকা ধরে নৌকা
খেবা বাঁকা ধরে।
বিষম কাঁড়ারি ভাই খেবা বাঁকা ধরে।
পরাণ মাঝিরে ভাই তোমারে দিমু রে কূল
আন্ধার মানিক বাহিয়া যাও
চন্দানির ঘাটে তোল ॥
সব সাধু সদাগর হাঁটিয়া গেল ঘরে।
মুঞি পাপীর ভাঙ্গা নৌকা
ঠেকিল বালুচরে ॥
শুখনাত লাগাইয়া নৌকা সিঁচিয়া
ফেলুম পানি ॥
নিশ্চয় ডুবিল নৌকা ছুটিছে গাহিনি ॥
বুকে হানে পিষ্টে মারে হজরত হীনে।
পঞ্চ বীরে খিছে নৌকা না নামে গহীনে ॥
কালা হেন মাঝি রে ভাই
'না'এর মাঝে থাকে।
হাতে ধরে পায়রে পাতোয়াল
সবের আগে সাজে ॥

॥ ৩৪৯ ॥

আল্লা অন্তকালে কি বোল বুলিম
নিজ ঘরে গিয়া।
কি হইল কি হইল মোরে দিয়া।
পরেয়ার ধন লইয়া বণিজ করিবারে।
আল্লা লাভে মূলে ভাঙ্গি খাইয়া
ঠেকিলুম জঞ্জালে।
একেথু চতুর হইলে একেরে করে দোনা।
লাভে মূলে ভাঙ্গি খাইলাম
নব রতন সোনা রে ॥
কহে মানিক দাসে আল্লা
কি ধার ধারি তোর।
মিছা ছালাএ গিরা দিয়া মানিক লই
গেল মোর

॥ ৩৫০ ॥

[কাফি]

পিরীতি অমূল্য ধন।
কে জানে পিরীতির মরম। ধু
পিরীতি অমূল্য ধন।
না ধরে ফলফুল অন্তরে ভাবে ব্যাকুল
ভাব বুঝি বাড়াইলে পিরীতি
যত বাড়ে তত রঙ্গ
প্রেমের ফল রসা তারে খাইতে বড় খাসা
সে ফল ভাঙিলে হয় কষা।
না ভাঙলে পিরীতির ফল
যত খায় তত ভাল।
পিরীতি ভাঙলে কেমন?
যেমন জ্বলে হুতাশন
সেই আনল নিবে না কখন,
প্রেমের ভাব হৃদে লাগে,
কাঁচা বাঁশে ঘুণ যেমন।
মূঢ়মতি জন কি জানে মরম
পিরীতি কেমন ধন
শ্রীকমর আলী কহে, জানে,
যে হয় রসিক জন।

॥ ৩৫১ ॥

এ পন্থ দি' গেলে বুঝি এয়ার
পাওঙ্গা রে। ধু
গর পাওঙ্গা গলে লেপট লে লেওঙ্গারে॥
জান মেরে কর্কে চুরি,
ধাই কোথা গেল প্যারি,
চাতরে চাতরে ঢোরারে।
এ প্রেম বাজারে, না পাইয়া তাহারে,
বুঝি কোন ভাবুকের পুন প্রাণি হরে রে॥
হাম্‌সে যেয়সা দাগাবাজী,
কিয়া বোরহাঁ সো পরিজি
নিকুঞ্জ গহনে পাইলে রে!
কামশেল হানি, মধুপানে জনি,
হৃদয়ে রাখিব পুনি তোরে লুকাইয়া রে॥
লালে চিকুচি তেরা সেত মেরা নয় পাসরা,
হৃদয়ে লাগিল কভি মোর রে।
জ্বলন্ত অনলে, নীর ঢালি দিলে,
তৃপ্তি যেন হয়, তেন অষ্টাঙ্গে আমার রে॥
কহে শ্রীহাসমতালী, ত্রিভঙ্গিনী সে কমলী,
ভাবুকের প্রাণি চোরা রে!
যার তার হৃদে, লাগাই বিচ্ছেদে,
ভাবানলে দহি অঙ্গ করে ছারখার রে॥

॥ ৩৫২ ॥

গর বাঁচুঙ্গা রে মন-চোর প্রাণ প্রেয়সি। ধু
আছ নাই পাছ নাই, হাম ভবে একলা।
আসবে ব'লে ফাঁকি দিয়ে,
না আসিলে বালা॥
মাতা ত্যাগি পিতা ত্যাগি,
পাট সিংহাসন।
তুমি কি না জান যত হৈল বিবরণ?
অহকাল একতিল নহি বিস্মরণ।
জল বিনে চাতকী যেন, আমার জীবন॥
অহে প্রিয়া যদি হিয়া জীব থাকে মোর।
তবে রাখ মোরে নিয়া নিকুঞ্জেতে তোর॥

॥ ৩৫৩ ॥

[কুহু]

জাগ মন, আলস ছাড়িয়া।
সতত গুরুর নাম জপ রে বসিয়া। ধু।
সকল ছাড়িয়া সার পন্থে বান্ধি মন।
সত্ত্ব-রজ-তম হের মুদিয়া নয়ন ॥
উকার মকার আর আকার সহিত।
রেচক পূরক বান্ধি শুদ্ধ কর চিত ॥
অনাহত চক্রে ধ্যান করহ সতত।
রেচক পূরক সঙ্গে তথা বাজে তত ॥
চন্দ্র সূর সঙ্গে তথা একত্র করিয়া।
পঞ্চ শব্দে পঞ্চ রত্ন তাতে মিলাইয়া ॥
নানা বাদ্য রঙ্গ তথা হের রে সদায়।
কিঞ্চিত কহিল বুঝ তরিতে উপায়।
সার গুরু ভজি লও সার এই ধন।
আর যত ধন আছে ইহার নিছন ॥
সাহা আলি রজা গুরু হৃদের মুকুর।
শুদ্ধ এক ভাব কর দুই ভাব দূর ॥
দীনহীন পাপকারী সর্ফতুল্লাহ গায়।
কান্দি কান্দি তুয়া পদে কুহু রাগ রায় ॥

॥ ৩৫৪ ॥

পাষাণ মন রে তুমি আমার কথা ধর।
পরকালে সুখ চাইলে
ভবে বাসনা ছাড় ॥ ধু
এ ভব সাগরে আসিলি পাষাণ মন
পরের পাসুয়া নৌকা লৈয়া।
থাকুক লাভের ফল মূলে হৈল তল
নৌকা ডুবিল বালুচরে।

এ মিছা বাজারে আসিলি পাষাণ মন
বিকি কিনি ক'দিন খাইবার তরে।
ভাল দ্রব্য জাত না কিনিলি তাত
কিনিলি রে মন্দ তিক্ত খর।
মাটির পাঞ্জরে যে সঁপিছে তোরে
কেনে মন গো তুমি পাসর তারে।
তাহারে প্রণতি কর প্রতিনিতি
না বুঝি না শুঝি আলস্য কর।
সদা সর্বক্ষণ আরে পাষাণ মন
পাপ ভিতে মোরে ডুবাইতে চাহ।
পাগলেরি মত তোমার চরিত
বালকেরি মত তোমার চরিত
রিপু ছয় জনের কথা ধর।
কিসের ইষ্টমিত্র কিসের স্ত্রীপুত্র
কিসের বন্ধুবর্গের আশা কর।
মোহাম্মদ আলী কহে কেহ সার নহে
ভাবি দেখ এ সকলি পর ॥

॥ ৩৫৫ ॥

ভবে আসি হৈলাম অপরাধী প্রভু
দীননাথ। ধু।
না সৃজিতা নিরঞ্জন না আসিতাম এ ভুবন
না হৈতাম পাপপুণ্যের ভাগী।
পাপিষ্ঠ নারদে মোকে
না ভোলাইত কোন পাকে।
নরকে না নিত মোকে ধরি।
জন্মিয়া ভবের মাঝে
গোঁয়াইলাম মিছা কাজে
না করিলাম পরলোকের কাম।

আপনে আপনা প্রতি
যাকে সেবে প্রতিনিতি
না চাইলাম দুই আঁখি মুদিয়া।
কহে মোহাম্মদ আলী হীনে
শমন আসি যেই দিনে
মন-মাঝি লই যাইব ধরিয়া।
এ সুন্দর তন-তরী মৃত্তিকাতে রৈব পড়ি
ইষ্ট মিত্র লই যাইব বান্ধিয়া রে॥

॥ ৩৫৬ ॥

মুরসিদ মনেতে বড় ভয় লাগে রে।
এ কূলে মাতারা ঐ কূলে চাতারা
তার মাঝে ত্রিবেণীর খেবা।
আন্ধার ঘরের মাঝে
কালিকা সোনাই
মোরে কৈল পাবার মানিয়া দেবা।

॥ ৩৫৭ ॥

বিপথ লোক রে ধর্মপন্থ করিলা লোপ। ধু
আছিল ঝরণা ধার লোক সব হএ সার
তথা সাঁকো দিলুম ধর্ম বাণী
দারুণ মনুষ্যগণ।
খসাইয়া নিল কাল
তা দেখিয়া হইলুম উদাসী
কিরূপ করিমু এবে গালি দিব লোক সবে
বুলিবেক বিধর্মের কাম।
যদি ধর্ম ভাবে মনে হেন করিত কেনে
লোক মুখে রহিল দুরনাম।
কি লাগি পাপিষ্ঠগণে সদায় বিবাদ মনে
লোক প্রতি নাহি উপকার।
সে সবে জানএ ভাল না হইব পরকাল
সার হেন জানএ সংসার।
হীন নওয়াজিসে কহে ধর্মী যদি লোক হএ
সকল যাইত স্বর্গমাঝ।
ধর্মনাশ করে কেহ নরকে পড়িব সেহ
প্রভু সাক্ষাৎ পাইব লাজ।

॥ ৩৫৮ ॥

নবীজি প্রভুরে কহিবা মোর লাগি।
মুনাফের সন্ততি হাসিম মহামতি
তান সুত মোতালিব নাম।
তান সুত গুণনিধি আবদুল্লাকে সৃজে বিধি
পুষ্পবৃষ্টি কৈলা অনুপাম।
তাঞ্রি সে আমিনা সঙ্গে নুর মুহম্মদ
জন্ম হৈল।
তান প্রতি সংসারের ভার।
তান যুগ পদে পড়ি
হবি নিষ্পাপ কলিমা পড়ি
পঞ্চ কর্ম মনে করি সার।
কাফির হৈল কেহ কলেমা না পড়ে সেহ
পড়িলেক মো'মীনগণ।
তাহান আদেশ মানি সংসার অসার ফানি
মায়া তেজিও, মৃত্যু শেষে পরকালে
পন্থে পাইব বাটোয়ালে
পাপপুণ্য করিব বিচার।
তখনে কি করিব কর্ম সঙ্গে নাহিক ধর্ম
পাতকীর পুণ্য শেষ।
কহে নওয়াজিস হীনে, রসুল সারথি বিনে
ত্রিজগত অন্ধকার।

পাপীগণ পাপ হরিতে নরকেথু নিস্তারিতে
শরণ করহ নবী একবার।

॥ ৩৫৯ ॥

কহিতে দুঃখে ফাটে বুক
শ্যাম পীরিতের লাঞ্ছনা
সই গো পীরিতে আমায় চাইল না।
সখি গো জলের সনে কাষ্ঠের পীরিত
জলে ভাসে দুইজনা
জলের সনে মীনের পীরিত
জল ছাড়া মীন বাঁচে না।
সখী গো অগ্নির সনে করতাম পীরিত
মনে ছিল বাসনা
হায় রে অকূল নদীর ভেদ না জেনে
কাল-সাপিনী ছুঁইও না।
সখি গো অধম খলিলে বলে
পীরিত করি ঠেকিও না
মন-পবন পিঞ্জিরার পাখী
ছুটলে ধরা দিবে না।

॥ ৩৬০ ॥

আগে করহ মন দেহের নিরূপণ
দেহের উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম
কোন্ খানে শ্রীবৃন্দাবন।
কোন্ ঘাটে বিরজা বৈসে
কোন্ নদীর জল আগে আসে
কোন্ নদীর জল মাসে মাসে হয় পতন।
মেরুদণ্ডের দক্ষিণ পাশে
অচল শীতল সব আছে
তাহাতে অরুণ কোণে আছে বহু রত্ন ধন।

॥ ৩৬১ ॥

ও মন পাগলা রে
সাবধানে চালাও তরী ভবসাগরে।
এক পাগলে কৈরছে মেলা
ছয় পাগল তার দাড়ি মালা
সালাএ মানে না।
ও ভবসাগরে দিলাম পাড়ি
ডুবলে আর কি বাঁচব রে।
ও মন পাগলা রে
সাবধানে চালাও তরী ভব-সাগরে।

॥ আত্মনিবেদন ॥

॥ ৩৬২ ॥

[সুহি]

ওহে পরাণ বন্ধু তুমি
কি আর বলিব আমি।
তুমি সে আমার আমি সে তোমার
তোমার তোমাকে দিতে, কি যাবে আমার।
কে জানে মনের কথা কাহারে কহিব
তোমার তোমারে দিয়া তোমার হইয়া রব।
সৈয়দ মর্তুজা কহে আমি ত না জানি
ভবসিন্ধু হইতে পার যে কর আপনি।

॥ ৩৬৩ ॥

[রাগ মাধবী]

বিনোদ আমার বাড়ি ত আয়
আমার বাড়ি ত আইলে বিনোদ
জাতি নাহি যায়। ধু
হাড়ি দিমু বাসন দিমু বিনোদ বাড়ীর বেগুন

সরু ধানের চাউল দিমু বিনোদ করিও
রাঁধন ॥
শালিয়া ধানের চাউল দিমু
বিসমালি ধানের খই
আমার বাড়ি ত আঁইলে দিমু
মিষ্ট ভাণ্ড দই ॥
সৈয়দ মর্তুজা কহে মনেতে ভাবিয়া
মন ঝুরে তন পোড়ে ঐ কালার লাগিয়া ॥

॥ ৩৬৪ ॥

[রাগ ধানশী]

আমি সে তোমারু নাথ আমি সে তোমার
সবে মাত্র বুলিএ আমার। ধু
মনে জানে তনের কথা কারে বুঝাইমু।
আমার ধন তোমারে দিয়া
তোমার হৈয়া রৈমু।
বার মাসের তের ফুল ফুটিয়া রইল ডালে
আমার প্রভু ঘরে নাই, ফুল গাঁথিয়া
দিমু কার গলে।
বার মাসের তের ফুল ফুটিছে স্থাবরে
মুই নারীর করম দোষে
ফুল ঝরিয়া ঝরিয়া পড়ে।
ও কূলে বন্ধুর বাড়ি মধ্যে ক্ষীর নদী
উঠি যাইতুম সাধ করে পঙ্ক না দেয় বিধি।
সৈয়দ মর্তুজা কহে এহি বার বার
ঝরিলে বৃক্ষের পত্র না লাগিব আর।

॥ ৩৬৫ ॥

তোমার মনের কালি দূর করি
কমলপদে রাখ শ্রীহরি। ধু
নতুন ব'সে পীরিতি করি ছাড়লে কেনে
ও কালাচান্দ, প্রেম আগরি।
দয়া মনে নাই কেনে কোথায় রইলা পাসরি
সাধনাতে হইয়াছে মিলন
দয়া কর ও কালাচাঁদ
না হইও বিমন।
আইস সঙ্গে মনোরঙ্গে
একবার মধু পান করি।
তুমি কালা প্রেম-সখা আমার
এ ধন যৌবন কালাচান্দ সকলি তোমার।
সম্পূর্ণ মধুর ভাণ্ড ইচ্ছা মত পান করি
হীন কমর আলীর বচন
যেই যুবতী পায় পতি করিয়া সাধন,
রাখিতে উচিত হয়, অনেক আদর করি।

॥ প্রার্থনা ॥

॥ ৩৬৬ ॥

শ্যাম মোরে করিও দয়া
একেবারে না ছাড়ো মায়া
ও কালাচান্দ পরদেশী।
প্রেম-সাগরে ডুবি
হর-ঘড়ি তোমারে সেবি।
মন বান্ধ্যাছ শিলার ডোরে
পাসরি রহিলা মোরে।
পিরীতি তোমার সনে,
আড়া পাড়া সবে জানে,
দৈবে কলঙ্কিনী হৈলাম
নয়ান ভরি না চাহিলাম
সুজনে পিরীতি করি
একেবারে না যায় ছাড়ি।

জনমে জনমে পালে
সঙ্গে থাকে নিদান কালে।
কহে সৈয়দ সুলতানে
রাখ প্রাণ দেখা দানে।

॥ ৩৬৭ ॥

[রাগ দুঃখিনী ভাটিয়াল]

প্রভু দয়াল হের লো মোরে
অনাথেরে দেও রে চরণ। ধু
তোমার কৃপার বলে আপনা পাপের ফলে
তেকারণে তাহে না শুনিলুম।
অখনে সঙ্কট ভেল শমন নিকটে আইল
উদ্ধার কর মোরে কাতর হইলুম।
ভুলিলুম সংসার লোভে
বন্দী হইলুম মায়া জালে
তেকারণে তোহে নহি জানি।
তুমি ত্রিজগত সাক্ষি তুমি বিনে গতি নাই
উদ্ধার মোরে পাপ নাথ গণি।
তোমারে ভরম হইলুম
আপনে আপনা খাইলুম।
তেকারণে লাগিল বিদশা।
হীন আলাওলে ভণে যদি ভাবে দিলে-মনে
অবশ্য পূরিব তার আশা।

॥ ৩৬৮ ॥

[ভুজঙ্গ প্রয়াত]

আয় দীনবন্ধু এ দুঃখসিন্ধু
আপনারে না পারেঁা বিন্থ স্নেহ বিন্দু। ধু
তোহ সব উক্তি করেঁা তোহে ভক্তি
নাহি আন শক্তি না হয় কোন মুক্তি
নাহিক রাজে তুয়া এক সাজে
এ ভব হাটে ভয়ঙ্কর রাটে।
মায়া পাপ কারী সব দুঃখ ভারী
দুর্গম নিবারি বিপত্থে উদ্ধারি।
হও মোত দয়া কর রঞ্জ মায়া
তুহো যাহে ভায়া ভীত হো যে পায়া
অতি দুখ জ্বালা ভরা চিত্ত কালা
তুহো জগ পালা উদ্ধারিহ দয়ালা
চতুর সুজানা মোহাম্মদ খানা
আরতি মানা আলাওলে ভাণা।

॥ ৩৬৯ ॥

[ভাটিয়ালী]

দীন বন্ধু, কর পরিত্রাণ
তুমি বিনে দুর্গতের গতি নাহি আন। ধু
ভুলিয়া সংসার রঙ্গে তোমা পাসরিলুম
অনুরূপ প্রতিফল হাতে হাতে পাইলুম।
না চাহি পরম পদ চাহিলুম সম্পদ
নিজ দোষে সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমএ আপদ।
চন্দন তেজিয়া যেন মক্ষিকা পুরীষে
উড়িয়া পড়এ আসি চিত্তের হরিষে।
অখনে শরণ লৈলুম ক্ষম অপরাধ
তুমি বিনে মনে ত নাহিক আন সাধ।
হীন আলাওলে কহে মুক্তি পাইবা যবে
সমূলে কপট নাশি ভজ দড় ভাবে।

॥ ৩৭০ ॥

[মালশী]

করুণা সাগর পীর বদর আলাম
তরাও সঙ্কট হন্তে চরণ ভজিলাম।

ব্যাঘ্র চর্ম আরোহি সমুদ্র হৈলে পার
কে বুঝিতে পারে প্রভু মহিমা তোমার।
চাটিগাঁতে আসিয়া হইলা উপস্থিত।
সেবক জনের ডাকে পূরাও বাঞ্ছিত।
এতিম নাসিরে কহে ভজেঁা রাঙ্গা পায়
শাহা আফজল পীর রহিতে সহায়।

॥ ৩৭১ ॥

[রাগ—গান্ধার]

আয় মাধব নিবেদহোঁ তোহে।
তুমি সদাশয় দীন দয়াময়
তোহো বিনে গতি নাহি মোহে। ধু
হামো আলস গুরু তুঞি কল্পতরু
তছু পরে সাঞি সুখ চাহি।
আদি অন্ত মোহে কর ফলোদয়
মুঝে না কর নৈরাশি।
হামো অপরাধী পরাদি বিরোধী
পাপ গুণে সব হীনা
সাঞি পরিহরি মায়া মোহে জড়ি
মুঞি ভোলল রাত্র দিনা।
খাক পাক করি তাহে জিউ ধরি
তম-রজ-সত্ব সাঞি পূরা।
সোহি দয়াময় · আফজলে ভাবয়
মুঝে গৌরব কর থোড়া।

॥ ৩৭২ ॥

[শলখা]

মা আমারে অভয় দিঁলি না
জগদম্বা নাম ধর হর অঙ্গনা
শিব শূলী ব্রহ্মমায়া জগত তারিণী তুমি
হর বক্ষে পদ দিয়ে লাজ বাস না।
জন্মাএ ভবের মাঝে দুঃখ দিলা কোন্ লাজে
একি অবিচার তোর দুঃখ ঘুচাও না।
আকবর আলী শিশুমতি
না জানএ স্তুতিভক্তি
শিশুজ্ঞানে পদতলে ছায়া দিলা না।

॥ ৩৭৩ ॥

[সালন্মী]

করুণা 'দধি কালার বরণি শ্যামকালি। ধু
তুমি নারায়ণ হরি।
তুমি হর ব্রহ্মা গৌরী
দেবের দেবতা তুয়া মূল।
অষ্টলোকে পরিহার রাতুল চরণে যার
শরণ মাগে নর-দেব কুল।
তুমি গুরু মাতাপিতা ত্রিলোক পরম দাতা
তারিণী করুণা সিন্ধু সার।
জগতরু প্রাণি তার শিব লীলা রাধা কানু
সত্ব-রজ-তম শক্তি যার।
হীন আলি রজা বোলে শ্যাম কালি পদতলে
মুক্তি মৈমু শঙ্কর ঘরণী।
সূর বংশী হর গৌরী চন্দ্রবংশী রাধা হরি
তত্ত্ব রূপী নবীন যৌবনী।

॥ ৩৭৪ ॥

[ললিতা রাগিনী গীত]

ক্ষেম অপরাধীর সর্ব দোষ, করিম দাতা। ধু
তুয়া দাতা দয়াল স্বামী
ভক্তি দোষী দাস আমি ভজিলুঁ চরণে
ক্ষেম দোষ।

হাম অপরাধী দাস
তুয়া বিনু নাহি আশ।
কৃপাদৃষ্টি কর ক্ষেমি রোষ।
দাস নিত্য আছি দোষী স্বামী দাতা দয়ালসি
কৃপা সিন্ধু হইতে বিন্দু দানে।
নিজ দাস কৈলে এবে দাতার কি হৈব ঊন
দাসের স্বামী নাহি তুয়া বিনে।
সর্বভূতে অধিকার তুমি এক করতার
যুগ নাহি তরিতে বুঝিতে
সেবা যোগ্য উক্তি ভক্তি
দাসে কি করিতে শক্তি
সবাঞ্ছিত তোমা ইচ্ছামতে।
আলি রজা গুরু পন্থের তরু
সে চরণে হীন এর্সাদুল্লা ভণে
যেবা গুরু ভক্ত লীন সে পায় আত্মা চিন
তত্ত্ব মূলে স্বামী দরশয়।

নাহিক সমুদ্র ওর সঙ্কট তারণ বর
সে সঙ্কট তরিমু কেমন ॥
আর ভয় মন মাঝে যবে হরে যম রাজে
ভাই সবে নিয়া দিব গোরে।
মনকীর নকীর আসি জিজ্ঞাসিব কাছে বসি
ত্রাণ পামু কোন্ পত্যুত্তরে ॥
মাত্র এই আশা মোর যদি কর করতার
কৃপাদৃষ্টি পাপীর উপর।
যতেক সঙ্কট মূলে তরিম নামের বলে
ত্রাণ আশা সমুদ্র অপোর ॥
আলীরজা পায়ে তাহান নন্দন ভণএ
ত্রাণ মাগি সর্বথায়।
সঙ্কট থু হইতে উদ্ধার গুরু
এর্সাদুল্লার ভণে গুরু চরণ চিনে
গুরু লক্ষ্য ত্রাণ নাই আর ॥

॥ ৩৭৫ ॥

ভকতি কবিএ তুয়া পায় করিম রহিম
কৃপা করি করতারে নরকুলে কৈলা মোরে।
বেদ অংশ করিএ কাতরে।
তাতে সংসারের রস দিয়া মন কৈলা বশ
মায়া ডোরে বান্ধি মোরে ॥
স্ত্রীপুত্র ধন লোভে ভুলি রৈলা মিছা ভবে
ভজিতে না পারি তুয়া পায়।
নমাজ পড়িতে নারি প্রাণমন যায় হরি
মন পক্ষী খন্নাসে উড়ায় ॥
পাপ কৈলুম ঘোরতর সাক্ষাতে সাগর বড়
দেখিতে লাগএ ভয় মন।

॥ ৩৭৬ ॥

দয়া কর দয়াময় আমি পাপী অধীনেরে
তোমা বিনে এ জগতে
কে আর নিস্তার করে।
আমি অতি পাপমতি শুনহ জগৎ পতি
তোমা বিনে নাহি গতি
এ জগৎ সংসারে।
শুন ওহে জগৎ কর্তা অকূলের কূলদাতা
ঘুচাও মনের ব্যথা পড়িছি বিষম ঘোরে
অধম মমতাজ বলে মজিয়া এ ভব কূলে
গেল এ জনম বিফলে
হল না সাধন তোমার ॥

॥ ৩৭৭ ॥

[রাগ ভঙ্গ ভাটিয়াল]

পার কর মোরে কল্পতরু
পার কর মোরে। ধু
অধম দেখিয়া ঘাটের নাও কেন বাহিয়া
যাও দূরে।
ঘাটেতে বৈয়া কাতর হইয়া
তোর নাও তরে
তুমি কল্পতরু দয়াল
কৃপা না হইলা মোরে।
বেয়ানে মেলিল রবি গেল বৈয়া
হে মোর সেবক সকল মুই রৈলুম বৈয়া।
ঐ কূলে থাকিয়া ডাকিয়া বোলে
মুই সে অধম দাস।

॥ ৩৭৮ ॥

জগপতি সেবকেরে দেখ একবার। ধু
তোমার সৃজনে আসিয়া সংসার মাঝ
না বুঝি কি চরিত্র তোমার।
ধ্যান করি মনে হেরি ভকতি মিনতি করি
আইস বন্ধু নিকটে আমার।
সবে কহে মথুরার হাটে বন্ধু যায় রাজ বাটে
তথা গিয়া বসি নিরীক্ষিয়া।
যে কেহ পন্থেত হেরি তাহারে জিজ্ঞাসা করি
কোথা বন্ধু দেও দেখাইয়া।
অবিরত ভাবি মনে বন্ধুরে দেখিছ কোনে
উদ্দেশিতে আছ অনিবার।
এমন ব্যথিত কেবা জানাইতে বন্ধুর সেবা
দেখাইতে শ্যামেরে আমার।
সেবিতে নারিলুম পিয়া
সেই লাগি দহে মোর হিয়া
সেই ভাবি প্রাণি হইল শেষ।
বিরহ আনল তাপে বিবেচনা করি আপে
আনলে গিয়া করিমু প্রবেশ।
কহে নওয়াজিস হীনে
বার্তা আইসে রাত্র দিনে
না পূরিল মনের বাঞ্ছিত।
দারুন কর্মের লেখা না ঘটে পুণ্যের পেখা
না দেখিলুম নয়ান বিদিত।

॥ ৩৭৯ ॥

অনাথের নাথ রে পরকালে করিবা পার। ধু
মুই হীন পাপকারী নাহি মাত্র জগ ভরি
সেই ভয়ে আছি রে ব্যাকুল।
জিজ্ঞাসিলে পত্নুত্তর মুখে দিতে
ভ্রমে চিত্তে না পাইয়ে মূল।
কাজেত নাহিক ধর্ম অবিরত পাপকর্ম
তরিবারে নাহিক উপায়।
কুকর্মে আমি রে ঘোর ভাবিয়া না পাই ওর
যদি তুমি না হও সহায়।
লোভ মোহ ক্রোধ কাম
নিত্য চিতে অনুপাম
খণ্ডিত কায় মনোহারী
তুমি বিনে আর কেবা কাহারে করিমু সেবা
সেবকেরে লইবা নিস্তারি।
করি উর্ধ্বে যুগ পাণি জীবন অসার জানি
নিবেদহোঁ অহি রাঙ্গা পায়
প্রভু না করিলে দয়া না দিলে পদের ছায়া

পরকালে কি হউক আমায়।
কহে নওয়াজিস হীনে অই চিন্তা রাত্র দিনে
আখের কল্লিয়া হৈলুম শেষ।
বান্দার বসতি ঘোর ভেদিয়া না পাইলুঁ ওর
না পাই পন্থের উদ্দেশ।

॥ বাৎসল্য ॥

॥ ৩৮০ ॥

দুখিনীর যাদু আয়
মুঞি দুখিনীর যাদুর মন কি দিলে জুড়ায়।
দুখের শ্রীধন দুখে কর মেলা
গো-ধন চালাইয়া চল অবশেষ বেলা।
তোমরা দেখছনি যাদু আমার যাইতে
আগে ধেনু পাছে কানু মুরলী বাজাইতে।
ভাত হইল কড়কড় নবনী হৈল বাসি
তবে ত না আইল কানু দিনান্তের উপাসী।
নন্দে বোলে আর নয়, বেচিঁয়া ফেলুঁ ধেনু
বাজারে মাগিয়া খামু কোলে লইয়া কানু।
আমার দুখের যাদু শুন যত কথা,
গোধন পলাই রইছে গহীন কানন যথা।

॥ ৩৮১ ॥

[রাগ ভাটিয়াল]

যাদবে দেখিলানি যাইতে রাখোয়াল সব
যাদুমনি দেখিলা মোর যাইতে।
ঘুমের আলস পায়, কানু কিছু নাহি খায়
অন্নমাত্র না দিলুম রান্ধিয়া।
সে ধরিয়া পোড়ে বুক না দেখিয়া চান্দ মুখ
আজু নিশি গোঞাইলুম কান্দিয়া।
অরুণ উদয় বোলে গোধেনু চালাইয়া চলে
অন্ন খুঁজিল মায়ের আগে।
মুই সে অভাগিনী উত্তর না দিলুম পুনি
ধেনু লইয়া গেল যাদুমণি।

॥ ৩৮২ ॥

[রাগ—সুহি]

হামো নিলক্ষিণীর প্রাণ যাদুয়া চান্দ রে। ধু
আজু তুহ্মি মাঠে না যাইও
ঘৃত মধু সাগর লবণি দুধের সর
প্রাণ রে মন-সুখে খাইও।
শুন অভাগিনীর যাদু দূরে না যাও রে
রাখোয়ালে রাখিব তোহ্মার ধেনু।
অভাগী মায়ের মনে কত কথা উঠে পড়ে
নবীন লবণি ভুলিত রেনু।
যাদুর পিছে নাই, একেলা
যাদুয়া মোর সবে ধন
এহি ভাবনা তিলেক পাসরি না
সাধিমু মুঞি যাদুরে মন।

॥ ৩৮৩ ॥

নন্দ তুমি আগ বড় রাগিয়া
ধেনুর সঙ্গে গেছে যাদু কান্দিয়া
কান্দিয়া। ধু
ভাত হইল কড় কড় নবনী হইল বাসি
এবে ত না আইল যাদু আমার
দিনান্তের উপাসী।
নন্দ রাণী রান্ধে ভাত আঁখিতে ঝরে পানি
দিন গেল সন্ধ্যা হল না আইল যাদুমণি।
বার বার কৈলুম নন্দরে বেচিয়া ফেল ধেনু
নগরে মাগিয়া খাইমু রে
কোলেতে লৈয়া কানু।

॥ বিবিধ ॥

॥ ৩৮৪ ॥

[রাগ ভঙ্গ ভাটিয়াল]

কৈল অন্ধকার মেঘে কৈল অন্ধকার
চিনিতে না পারি পীন তনু আপনার।
যে ক্ষণে ইতুর পূজা ভাঙ্গিল কানাই
তখনে জানিলুম গোকুলে ভালাই নাই।
গোকুলের ব্রজাণী শুয়ার ঘরের ধেনু
এহার বধের ভাগী হইব দুধের রামকানু।
সৈয়দ মর্তুজা কহে শুন মন দিয়া
সে-কথা ভাবিতে মোর আর না লয় হিয়া।

॥ ৩৮৫ ॥

নিদ্রা তেজি উঠ প্রভাতে মুমীন ভাইরে। ধু
উঠিয়া প্রভাতকালে অজু আগে কর ভালে
সাহাদত পড়িও সততে
সুন্নত করিয়া তাতে।
আদায় হয় যেই মতে
অজু কর নমাজ নিতে।
অজু শেষে তিনবার সুরত 'কদর' পড়
পঞ্চ কলেমা পড়হ তুরিত।
ফজর সময় জানি নতুবা আজান শুনি,
নামাজ পড় হই এক মন।
তসবী দরুদ পড়ি পাছে মুনাজাত করি
স্তুতি ভক্তি করহ অপার।
তুমি এক প্রভু বিনে লক্ষ্য নাই ত্রিভুবনে
পাপিগণ হইতে উদ্ধার ॥
মুনাজাত করি ভালে বসিয়া নির্জন থলে
মোকাম মঞ্জিলে কর গতি।
আপনা বিনাশ করি গুরু উপলক্ষ ধরি
এ সপ্ত মোকামে হের জুতি।
চক্রমূলে যুতি মনে শব্দ উঠে সে মোকামে
হের শুন তাতে বান্ধি মন।
চিনিয়া আপনা তন ধ্যান কর সর্বক্ষণ
তবে সে চিনিবা নিরঞ্জন।
শাহা আলি রজা পীর
জ্ঞানে সিন্ধু সিদ্ধ ধীর গুরু
এর্শাদুল্লাহ ভণে পীরপদ লক্ষ্য বিনে
সার না দেখি ত্রিভুবনে
দুইকূলে তরিতে উপায়।
সে চরণে অপরাধে মাগিএ ত্রাণ।

॥ ৩৮৬ ॥

[মালব]

হরি মাধব হে সদায় মিনতি তুয়া পায়। ধু
কি মোর গৃহের কাজ বসতি সমুদ্র মাজ।
তরঙ্গ গণিতে দিন যায়।
জানিয়া না কর দয়া যে বল কপট মায়া
দীন বন্ধু বুলিয়ে তোমায়।

॥ ৩৮৭ ॥

[নাত]

আহা রে মোহাম্মদ
ভবসিন্ধু কর মোরে পার। ধু
আছিলা কান্দিলের মাজ
উম্মতের করিতে কাজ
পুস্প রূপে বৃক্ষেত আছিলা।
সে পুস্প ফিরিস্তা নিয়া
আবদুল্লার অঙ্গে দিয়া

আমিনার গর্ভেত জন্মিয়া।
দিয়া অঙ্গুলির সান শশী কৈলা দুইখান
ইঙ্গিতে প্রভুর মহামতি।
দাগা দিয়া মৃগী গেল ছা'য়ে দুগ্ধ না খাইল
পুনি আইলা বাছুর সংহতি।
চারি ফিরিস্তা সঙ্গে মেহেরাজ গেলা রঙ্গে
আজ্ঞা পাই পড়িলা নমাজ।
'সবে মেহেরাজে' গিয়া
প্রভু সনে দেখা পাইয়া
তবে নবী গুজারিলা হজ।

॥ ৩৮৮ ॥

[গৌরাঙ্গ বিষয়ক]

[সুরাট]

জীউ জীউ মেরে মনচোর গোরা
আপহি নাচত আপন রসে ভোরা। ধু
খোল করতাল বাজে ঝিকি মিকিয়া
আনন্দে ভকত নাচে লিকি লিকিয়া।
পদ দুই চারি চলু নট নটিয়া
থির নাহি হোয়ত আনন্দে মাতোলিয়া।
ঐছন পঁহুকে যাহু বলি হারি।
শাহ আকবর তেরে প্রেম ভিখারী।

॥ ৩৮৯ ॥

পীরিতি অমূল্য ধন এবে সে জানিলুম সই।
পীরিতি ডুবাইলুম।
ভাটিয়া একেলা রহিয়াছে বৃন্দাবনে।
কালী ধবলী বুলি পালে পরধান গাই
আচম্বিত দুখের মালা⋯।
ধবলী বুলি হুঙ্কারে গোয়াল
গোয়ালার ডাক শুনি কান্দে রাখোয়াল।
বৃন্দাবনে কানু কৈলুম পাতি পাতি
যদি মোরে কর দয়া আইস সংগতি।
আমার দুখের কথা কহিও মার ঠাঁই
হারাইলুম চরণ-নেপুর
চোরা লই গেল গাই।
তাহে আপনার কথা কহিলুম আপনে
বাঘে-গাইয়ে লড়াই যাদুয়ার বাথানে।

॥ ৩৯০ ॥

মুমিন ভাইরে না কর বড়াই।
আল্লার আদেশ মান আপনে সেবক জান
সভানে করিবা যত কাম
কুপন্থে না বান্ধ হিয়া অবিরত সেব পিয়া
নিত্য চিতে রাখ সেই নাম।
বড়াই করএ যেবা শুদ্ধ নহে তার সেবা
বাঝিল কেমত পাকে।
ক্রোধ হৈল জগপতি লাহানত কৈলা অতি
না খণ্ডিল পাপ পুনর্বার
সুদ্ধি মাগ অনুক্ষণ কপট না রাখ মন
কপটির দুইকূল নাশ।
অপরাধ করে যেহ নরকে পড়িব সেহ
শিকার প্রথমে বিনাশ।
প্রীতি রাখ লোক সনে বিবাদ না রাখ মনে
নষ্ট না করিও দুই কূল।
অন্ত না ভাবএ জন অসার্থক সে জীবন
বাট-কমলে লাগে তার মূল।
কহে নওয়াজিস হীন জিজ্ঞাসিব একদিন
ভালমন্দ হিতাহিত ভাব।
পুণ্যবন্ত স্বর্গে যাইব পাতকী দোজখে যাইব
সে ক্ষণে প্রভুর নাম সার।

॥ ৩৯১ ॥

দয়াল বিধি রে পরকালে দেখাইবা দায়
প্রভুর আদেশ হৈল যেহ
• খণ্ডাইতে নারে সেহ
সেহ ভাব মনেত আসিল।
আরতি হইল বড় বান্ধিতে নবীন ঘর
হুঙ্কারেত কর্মিক আইল
সেই গৃহ নির্মাইল কর্মিক যতেক পাইল
নয় মাসে হইল পূরণ।
গৃহ সে বৎসর শেষ আশা রূপের বেশ
সেদিন না ছিল আসি ঘরে।
অস্ত চতুর্থী শশি দ্বিযাম হইল নিশি
অগ্নি ছিল কোন পাপ ঘরে।
আনল প্রচণ্ড ভেল সর্বগৃহ দহি গেল
মেদিনী হইল শূন্যকার।
কত ধন দ্রব্য ছিল সমস্ত আনল নিল
কার প্রতি কি বুলিমু আর।
হীন নওয়াজিসে কহে এত কার প্রাণ সহে
গৃহহীন মহা দুঃখ তার।
ক্ষীণচিত্ত হরি নে বিধি পুনর্বার সর্বসিদ্ধি
প্রভু বিনে গতি নাই আর।

॥ ৩৯২ ॥

মুমীনগণ রে প্রভুর পদে ভকতি করিবা। ধু
চলহ মুমীন ভাই আল্লাকে সেবিতে যাই
আজু হৈল জুমার দিন।
যত কর্ম বিকি কিনি আজুকা করিতে মানা
সেবা-হস্তে হইবা পূরিন।
সেবিবারে যদি যাও পন্থে কিবা ব্যাঘ্র পাও
তার প্রতি না করিও ভয়।
প্রভুএ সদয় হৈব সে আপদ খণ্ডাইব
ভীত শান্ত পুণ্য হৈব জয়।
সেবাপুর দূর জানি হেলা না করিও পুনি
অবশ্য হৈব সেই স্থান।
যতেক পন্থ পাইবা ততেক ধর্মিক হৈবা
মহাশাস্ত্রে আছে পরমাণ।
কহে নওয়াজিস হীনে যে সভানে পন্থ চিনে
কদাচিত নাহি তার ভীত।
যথা যায় তথা ভাল কী করিব বাটোয়াল
শুদ্ধ পন্থে যাইমু তুরিত।

॥ ৩৯৩ ॥

[কালী বিষয়ক]

[মালসী]

তোমার পদে লইলুঁ শরণ।
জননি মাই কালি। ধু
ষড়ানন সুজননী হর-পত্নী কাত্যায়নী
সর্ব পূজা করিলুঁ তর্পণ।
জপিতে তোমার নাম পূরাইবা মনস্কাম
পদ ছায়া কর আচ্ছাদন।
শঙ্কর বনিতা মাই তুমি বিনে গতি নাই
ভুবন মোহন রূপবতী।[১]

---
১ এটি নওয়াজিসের রচনা বলে মনে হয়।

॥ ৩৯৪ ॥

দে দে নবনী দে খাই যশোয়া মা রে। ধু
ভোর প্রভাতে ক্ষুধা সহন না যায় রে।
মিনতি করিএ তোর পায় রে।
দেবের কারণে ননী রাখ তুমি
সে দেবের দেবতা আমি।
স্তন্য দিয়া যাদবেরে এড় ত জননী।
ক্ষুধা তোর হইছে যাদু না খাইছ ননী
তোমারে না দিয়া ননী রাখিয়াছি, যাদুমণি
দেবের কারণে ননী
ক্ষেণেক বিলম্ব কর তুমি।
শিকা ছিঁড়ি ভাণ্ড ভাঙ্গিল দধির গড়াগড়ি
আমারে না দিয়া ননী রাখিলা আপনে রে।
নন্দ গেল বাথানে যশোদা রইল ঘরে
কড়াকড়ি তেল সব বিনালে গেল
খালি ভাণ্ড রইল পড়ি।

॥ ৩৯৫ ॥

[রাষ—কোরা]

গা তোল পরাণের বন্ধু গা তোল জাগিয়া।
তুমি নাগর মুছলমান মুই নারী বানিয়া। ধু
কাঞ্চনের ঝারি দিমু বন্ধুয়ার হাতে।
গা তোল মোহন শ্যাম মুখ পাখালিতে॥
যামিনী হইল শেষ পূর্বে উলে শুক।
গা তোল মোহন শ্যাম দেখি চান্দ মুখ॥
ভাঙ্গের লাডু বানাইয়াছি বন্ধু খাইবার।
বিষ লাড়ু বানাইয়াছি স্বামী বধিবার॥
সুবুদ্ধিয়া বন্ধুরে কুবুদ্ধিএ পাইল।
ভাঙ্গের লাডু এড়ি বন্ধু বিষের লাডু খাইল॥
ইনা সাপের কিনা বিষ
ওরা বাঁশের গোড়া॥
পরশিল কিনা সাপে নালটীয়া বোরা।
একেলা বোরার বিষ উজানে সে ধাএ।
শিরের লেজ দিয়া মুই ধরণী ধরম পায়॥
যেই জনে মোর বন্ধু ভাল করিতে জানে।
যেই ধন মাগে সেই দিমু নতুবা যৌবনে॥

॥ ৩৯৬ ॥

জানিলাম জানিলাম বন্ধু
না থাকিবা চিরদিন
তবে সে হইয়াছে বন্ধু
তোমার মুখ মলিন।
না থাকিবা প্রিয়ে তুমি
কেনে কৈলা আগমন।
চারি দিন থাকি দেশে যাও
আমারে করি দফন।

॥ ৩৯৭ ॥

[অনুরাগ]

[বেলোয়ার]

কি কহিব অয়ি সখি কালা গুণনিধি
অনেক পুণ্যের ফলে মিলাইয়াছে বিধি।
সাত পাঁচ সখী মিলি যমুনাতে আসি
কালা নিল জাতিকুল প্রাণি নিল বাঁশী।
চূড়ায় কদম্ব পুষ্প পত্র সারি সারি
দেখিছি অবধি রূপ পাসরিতে নারি।
চৌদিকে নিকুঞ্জ লতা মধ্যেরে যমুনা
তার মাঝে বসিয়াছে নন্দের নন্দনা।

সৈয়দ মর্তুজা কহে শুন প্রাণ সখী।
এমন বিনোদ রূপ কভু নাহি দেখি।

॥ ৩৯৮ ॥

[বংশী]

কেনে আ ল জলে রে
মুই কেনে আইলাম জলে
জলের ছলে বন্ধুরে দেখিলাম
কদম্ব তলে। ধু
সখী সঙ্গে জলে আইলুঁ
জল ভরি গেল তারা
আমি ত অবলা রাধে কলসী না গেল ভরা।
মুরলী বাজায় বন্ধু কদম তলে রৈয়া
কদম্বের পত্র সারি বন্ধুর পদের ছায়া।
হাতে শঙ্খ কানে সোনা পিন্ধনে
পাটের শাড়ি
হাত নাড়ি কহে কথা রাধিকা সুন্দরী।
মুরলী বাজায় শ্যামে কদম্বের স্থানে
চলিছে সুন্দরী রাধে কানু দরশনে।
মীর ফয়জুল্লাহ কহে কদম্বের তলা
বংশীর ধ্বনিতে যায় করিবারে মেলা।

॥ ৩৯৯ ॥

[আক্ষেপ]

[তুড়ি পটমঞ্জরী]

যৌবন গেল মোর রে। ধু
হেদে রে সজনি সই দুঃখ হৈল সার
হারাইলুম লাখের যৌবন না পাইমু আর।
আবাল কালে আছিলুঁ ভালো
কি হৈল বাড়িয়া
দিনে দিনে বাড়ে যৌবন পাঞ্জর ভেদিয়া।
হাটে যাম মুই ঘাটে যাম মুই
মুণ্ডে আঞ্চল দিয়া।
কতকাল রাখিমু এ যৌবন
লোকের বৈরী হইয়া।
অভাগী খোঁয়ারি[১] লাগি না আইল যমরা
শুকনা পুষ্পের মাঝে না পড়ে ভ্রমরা।
সৈয়দ মর্তুজা কহে শুন বনমালী
পালিয়া পুষিয়া যৌবন কারে দিমু ডালি।

॥ ৪০০ ॥

[অভিসার]

বিনোদ রায়,
আর দিন আসিতে বিনোদ নেপুর
না দিও পায়।
যখনে বিনোদ রায় মুরলী বাজায়
তখনে হাম নারী বন্দী।
কাঁচা কাষ্ঠ গাছি আনল জ্বালি আছি
ধূঁয়ার ছলে বসি কান্দি।
যখনে বিনোদ রায় আমার মন্দিরে যায়
তখনে ননদী জাগে।
খোঁটা দিয়ে রাত্রদিনে অবলার প্রাণ হানে
কতেক সহিব মুই অভাগে।

---

১ খাওরি।

॥ ৪০১ ॥

[আত্মবোধন]

[নাটিকারাগিনী গীত]

তুয়া বিনে আর নাহি জানি রে
গুণের নিধি।
মাঠে থাক, ধেনু রাখ রাখোয়ালের মতি
তুমি ত চিকণ কালা না জান পীরিতি।
তুমি ত সুন্দরী রাধে কানু কেনে কালা
কালা সে যে কানু রাধার গলের মালা।
কানু কালা রাধা গোরা সর্বলোকে জানে
দোহে যেন এক মন খেলে বৃন্দাবনে।
হাতে শঙ্খ কানে সোনা পিন্ধনে
পাটের সাড়ি।

বাহু নাড়ি কহে কথা রাধিকা সুন্দরী।
কেনে যাইব যমুনার জলে কার সঙ্গে যাইব
রাধিকার দরশন কোথায় গেলে পাইব।
বাপে দিল জনম খানি মায়ে দিল ক্ষীর
সৈয়দ মর্তুজা কহে জনম ফিকির।

॥ ৪০২ ॥

[প্রেম-তত্ত্ব]

কোথায় রাখিমু লুকাইয়া রে
পিরীতি তোরে কোথায় রাখিমু
লুকাইয়া। ধু
দারুণ অনল প্রেমে ঠাকুরের তনু ঘামে
ত্রিভুবন পুড়ি করে ছার।
মহারত্ন প্রেম তোর রাখিতে কি শক্তি মোর
সর্বজগত যাহে অধিকার।
যে রাখে পিরীতি সার ত্রিলোক
নিছনি তার
কান্ত-সোহাগী সে সফল।
যে-জন পিরীতি ছাড়া সে জন জীয়ন্তে মরা
আদি অন্ত নাই তার ফল।
প্রেমে-রত্ন-নিধি তার গুরুপদে সিদ্ধি সার
হীন আলী রজা মাগে দান।
জানাও প্রেমের পাঠ করাও পিরীতি নাট
সর্ব অঙ্গ গাহে প্রেম গান।

পরিশিষ্ট—ক

পদাবলীর 'আত্মবোধন' অংশে দেবর, ভাশুর, ননদী, সতীন, জা, শাশুড়ী প্রভৃতি ব্যঙ্গ্যার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আঠার শতকের কবি আফজল আলী রচিত 'নসিয়ত নামা' থেকে এর ভাষ্য উদ্ধৃত হল।

এক দিন হীন আফজল গুণাগারে।
অষ্টকথা জিজ্ঞাসিলা মোহাম্মদ রুস্তমেরে॥
শাশুড়ী ননদী আর সতিনী কে হয়।
কেবা হয় 'জা', 'সই' কাহারে বোলায়॥
'খসম' বোলয় কারে 'দেওর' সে কোন্।
ভাশুর বোলয় কারে—এহি অষ্টজন॥
এতেক শুনিয়া কহে শাহা রুস্তমএ।
একে একে এ সকল কহিমু নিশ্চয়॥
'ভোগেরে' শ্বাশুড়ী বলে, ননদী 'কাল'।
মনেরে 'সতীন' কহে 'মায়া' জান জা'ল॥
ক্ষমারে বোলয়ে 'সই' শরীর মাঝারে।
'খসম' বোলয়ে জান রুহু আমিনরে॥
'দেওর' বলে রুহু যার জান হয়।
ভাশুর বোলয়ে রুহু মুকীম নিশ্চএ॥
এহি অষ্টজন জান শরীরেত হয়।
এক জনে এক কর্ম করিতে আছয়॥

সাধারণ ভাবে উক্ত সব রূপ-প্রতীকের ব্যঙ্গ্যার্থ নিম্নরূপ:

শাশুড়ী—লোভ। ননদী—ঘুম। সতীন—কাম।
ভাশুর—ক্রোধ। দেবর—শয়তান। জা—মায়া।
সই—ক্ষমা। বন্ধু—পতি। খসম—ভোগেচ্ছা।

পরিশিষ্ট—খ

।। পদ-সংকলন গ্রন্থপঞ্জী ।।

গ্রন্থপঞ্জী (Bibliography) গবেষণা কার্যের তথা তথ্যালোচনার কুঞ্জিকা। অথচ আমাদের দেশে গ্রন্থপঞ্জী নেই বল্‌লেই চলে। য়ুরোপীয় পণ্ডিতদের প্রেরণায় দেশী বিদ্বানেরা গবেষণায় হাত দিয়েছেন বটে, কিন্তু তার ভিত্তি স্বরূপ গ্রন্থপঞ্জীর গুরুত্ব সম্বন্ধে মোটেই সচেতনতার পরিচয় দেন নি। যতদিন বিভিন্ন বিষয়ের Bibliography তৈরী না হচ্ছে, ততদিন গবেষকদের পক্ষে তথ্য সন্ধানের দুস্তর বাধা অতিক্রম করা সম্ভব হবে না। আমরা এ বিবেচনায় এখানে আমাদের জ্ঞাত পদ-সংকলন গ্রন্থের একটি পঞ্জিকা দিলাম ঃ

সংকলনের নাম	সংকলক	পদসংখ্যা	কাল
ক্ষণদাগীত চিন্তামণি	বল্লভদাস [বিশ্বনাথ চক্রবর্তী]	৩১৫	আঠার শতকের প্রথম পাদ
গীতচন্দ্রোদয়	ঘনশ্যাম [নরহরি চক্রবর্তী]	অজ্ঞাত	আঠার শতকের দ্বিতীয় পাদ
পদামৃত সমুদ্র	রাধা মোহন ঠাকুর	৭৪৬	আঠার শতকের মাঝামাঝি
পদকল্পতরু	বৈষ্ণব দাস [গোকুলানন্দ সেন : সতীশ চন্দ্র রায় সম্পাদিত]	৩০০০	আঠার শতকের তৃতীয় পাদ
কীর্তনানন্দ	গৌরসুন্দর দাস	৬৫০	— —
সংকীর্তনামৃত	দীনবন্ধু দাস	৫০০	— —
পদ-রসসার	নিমানন্দ দাস	২৭০০	আঠার শতকের তৃতীয় দশক
পদরত্নাকর	কমলা কান্ত দাস	১৩৫৮	১৮০৬
পদ কল্পলতিকা	— —	৩০০	— —
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ২০১ সংখ্যক পুথি		৭০০	— —
প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ (১-৩ খণ্ড)			১৮৭৪-৭৬
প্রাচীন কবিতা সংগ্রহ [বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস]	অক্ষয়চন্দ্র সরকার	— —	১৮৭৮
গৌর-পদ-তরঙ্গিণী	জগদ্বন্ধু ভদ্র	১৫০০	১৯০৩
মহাজন পদাবলী [১ম ভাগ, ১ম সংখ্যা বিদ্যাপতি পদাবলী]	ঐ		১৮৭৪

সংকলনের নাম	সংকলক	পদসংখ্যা	কাল
পদ রত্নাবলী	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীশচন্দ্র মজুমদার	১২৫	১৮৮৫
অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী	সতীশ চন্দ্র রায়	৬০০	১৯২০
বিদ্যাপতির পদাবলী	নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	বসুমতী সংস্করণ ১	১৯৩৫
ঐ	ঐ		
ঐ	সারদা চরণ মিত্র		১৮৭৮
ঐ	অমূল্য চরণ বিদ্যাভূষণ ও খগেন্দ্র নাথ মিত্র		১৯৪১
বিদ্যাপতি শতক	ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্		১৯৫৪
চণ্ডীদাস	নীলরতন মুখোপাধ্যায়		
ঐ	হরে কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়		
ঐ	রমণী মোহন মল্লিক		১৮৯৬
জ্ঞান দাস	ঐ		
মুসলমান বৈষ্ণব কবি (৯ জন কবির ২৫টি পদ)	ঐ		
দীন চণ্ডীদাস	মণীন্দ্র মোহন বসু		
পদকল্পতরু	রাধানাথ কাবাসী		
গীতরত্নাবলী	বঙ্কু বিহারী সাহা		
পদামৃত তরঙ্গিণী	ঐ		
পদামৃত মাধুরী	নবদ্বীপ চন্দ্র ব্রজবাসী ও খগেন্দ্র নাথ মিত্র		
বাসুদেব ঘোষের পদাবলী	মৃণাল কান্তি ঘোষ		
গোবিন্দদাসের পদাবলী	কালিদাস নাথ		
জগদানন্দের পদাবলী	ঐ		
গোপাল ঠাকুরের পদাবলী	যতীন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য		
বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবি	ঐ	১০২	১৯৪৯
প্রাচীন পদাবলী সংগ্রহের পুথি	সজনী কান্ত দাস সংগৃহীত		
কীর্তন পদাবলী	সুধীর চন্দ্র রায় ও অর্পণা দেবী		
বৈষ্ণব পদাবলী [কলিঃ বিশ্ববিদ্যালয়]	দীনেশ চন্দ্র সেন, খগেন্দ্র নাথ মিত্র প্রমুখ সম্পাদিত		
বৈষ্ণব গীতাঞ্জলি	দক্ষিণা রঞ্জন ঘোষ		১৯২৪
মুসলমান বৈষ্ণব কবি (১—৪ খণ্ড)	ব্রজসুন্দর সান্যাল	১৫৬	১৯০৪-০৬

সংকলনের নাম	সংকলক	পদসংখ্যা	কাল
বাংলা সাহিত্যে মুসলমানের দান পাঠমালা (১ম খণ্ড)	মুহম্মদ মনসুরউদ্দিন	১৩	
কাব্যমালঞ্চ	আবদুল কাদির ও রেজাউল করিম	২৮	১৯৪৫
বিদ্যাপতির পদ সংগ্রহ	খগেন্দ্র নাথ মিত্র ও বিমান বিহারী মজুমদার		১৯৫২
মহাজন পদাবলী	ত্রৈলোক্য নাথ ভট্টাচার্য		১৮৯৫
বিদ্যাপতির বঙ্গীয় পদাবলী	কালী প্রসন্ন কাব্যবিশারদ		১৮৯৪
বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও অন্যান্য মহাজন গীতিকা	চারু চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়		
মহাজন পদাবলী (চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি)	অক্ষয় কুমার দে		১৯০১
বৈষ্ণব পদাবলী	দুর্গাদাস লাহিড়ী		১৯০৫
বিদ্যাপতি পদাবলী	পঞ্চানন তর্করত্ন		১৮৯৫
নবাবিষ্কৃত বিদ্যাপতি পদাবলী	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী		১৯০০-০৬
॥ মৈথিলী ও ইংরেজী ॥			
মৈথিল কবিল বিদ্যাপতি	ব্রজানন্দ সহায়		১৯১০
বিদ্যাপতি ঠাকুর	নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত		১৯১০
বিদ্যাপতিকি পদাবলী	রামকৃষ্ণ শর্মা		১৯২৬
ঐ	কুমার গঙ্গানন্দ সিংহ		১৯৩১
ঐ	বসন্ত কুমার মাথুর		১৯৫২
মৈথিল কবিল বিদ্যাপতির সংক্ষিপ্ত পদাবলী	শম্ভুপ্রসাদ		১৯৪৭
বিদ্যাপতি	লালদেবেন্দ্র সিংহ ও সূর্যাবলী সিংহ		১৯৫০
বিদ্যাপতি গীতি সংগ্রহ	সুভদ্রা ঝা	২৬২	১৯৫৪
Maithili Chrestomathy-	George Grierson	৮২	১৮৮০-৮২
Vaisnava lyrics	সুরেন্দ্রনাথ কুমার	৪৮	১৯২৩
	নন্দলাল দত্ত ও আলেকজান্দার চ্যাপম্যান		
Songs of the Love of Radha and Krishna	Ananda Coomarswamy & Arun sen		
Songs of Vidyapati	Arobindo Ghose	৪১	১৯৫৬

পরিশিষ্ট—গ

॥ পদকার পরিচিতি ॥

অনন্ত—এঁর জাতি নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। রচনার প্রমাণে মনে হয় মুসলমান, কিন্তু নামে হিন্দু। এমন অনেক নাম আজো আছে যেগুলো হিন্দু-মুসলমানের সাধারণ ঐতিহ্য। কাজেই 'অনন্ত' মুসলমানের নাম হওয়া বিচিত্র নয়। পদকল্পতরু প্রভৃতির পদকার অনন্ত ভিন্ন ব্যক্তি।

আইনুদ্দিন (সৈয়দ)—আইনুদ্দিন ও মনোহর এক শাহ আইনুদ্দিনকে তাঁদের পীর বলে উল্লেখ করেছেন। অবশ্য পদকার সৈয়দ আইনুদ্দিনই যে তাঁদের পীর তা জোর করে বলা যায় না। এক শাহ আকবর আইনুদ্দিনের পীর ছিলেন। এঁকে কেউ কেউ পদকার আকবর অনুমান করেন। আকবর শাহর পদটি গৌরপদ তরঙ্গিণীতে প্রথম সংকলিত হয়। এতে মনে হয় তিনি হয়তো পশ্চিম বাঙলার লোক ছিলেন। আইনুদ্দিন সম্ভবত চট্টগ্রামবাসী ছিলেন। তাই পদকার শাহ আকবর আইনুদ্দিনের পীর ছিলেন বলে মনে হয় না। ভণিতাহীন 'গেরুয়া খেলা' নিবন্ধটিও আইনুদ্দিনের রচনা নয় (পুথি পরিচিতি পৃঃ ৩১)। আইনুদ্দিন সম্ভবত সতের শতকের কবি।

আকবর আলি—হাদিসের কথা, চোরার হেকায়েত, সখিনার বারমাস, হানিফার বারমাস প্রভৃতি রচয়িতা আকবর আলীই সম্ভবত আমাদের আলোচ্য পদকার। জনাব যতীন্দ্র মোহন ভট্টাচার্যের 'বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবি' গ্রন্থের পদকার শ্রীহট্টবাসী সৈয়দ আকবর আলি শাহ্ ভিন্ন ব্যক্তি। আলোচ্য আকবর আলী সম্ভবত আঠার শতকের শেষ পাদে বর্তমান ছিলেন।

আকবর শাহ্—সম্ভবত পশ্চিম বাংলার লোক এবং ব্রজবুলির প্রধান কবিদের মত তিনিও ষোল শতকের কবি বলে আমাদের ধারণা। সম্রাট আকবর ও পদকার আকবর শাহ অভিন্ন ব্যক্তি বলে কল্পনা করা বাতুলতা মাত্র। এক আকবর শাহ পণ্ডিতের রাগ-মালাও আছে (পুঃ পরিচিতি পৃঃ ৪৫২)।

আফজল আলি—ইনি একটি পদে সম্ভবত গৌড়-সুলতান সৈয়দ আলাউদ্দিন হোসেন শাহর পৌত্র ও নুসরত শাহর পুত্র সৈয়দ ফিরোজ শাহর (১৫৩২—৩৩) নামোল্লেখ করেছেন। আমাদের অনুমান সত্য হলে ইনি ষোল শতকের তৃতীয়-চতুর্থ দশকে বর্তমান ছিলেন। চট্টগ্রামের সাতকানিয়া থানার বিখ্যাত দরবেশ শাহ রুস্তমের এক শিষ্য আফজল আলি পীরের আদেশে 'নসিয়ত নামা' রচনা করেন। আলোচ্য আফজল আলি ভিন্ন ব্যক্তি। তবে অনুমান করি পদকার সৈয়দ আফজল ও পদকার আফজল আলি অভিন্ন ব্যক্তি হবেন। এবং নসিয়ত নামা রচয়িতা আফজল আলি আঠার শতকের লোক এবং ভিন্ন ব্যক্তি।

নসিয়ত নামায় আফজল আলির কিছু আত্ম পরিচয় আছে, তা থেকে জানা যায় তিনি চট্টগ্রামের আধুনিক সাতকানিয়া থানার 'মিলুয়া' গ্রামবাসী ছিলেন। তাঁর পিতার নাম ছিল ভংগু ফকির। 'পিতা মোর ভঙ্গু বৈর্যবর'। পীর শাহ রুস্তমের আগ্রহেই তিনি নসিয়ত নামা রচনা করেন। পীর প্রসঙ্গে কবি বলেন :

চাটিগ্রাম মধ্যে ছিল ক্ষুদ্র এক গ্রাম
মিলুয়া করিয়া আছে সে গ্রামের নাম।
সেই গ্রামে ছিল এক ফকির আল্লার
এ চারি মঞ্জিল-ভেদ দিল করতার।
শাহা সে রুস্তম করি ছিল তার নাম
আল্লার হৈল কৃপা গুণে অনুপাম।
গায়েবী মর্তবা প্রভু তাহানে যে দিলা
গায়েবীর ভেদ যত কহিতে লাগিলা।
গায়েবী ফকির বলি দেশ দেশান্তর
তান খ্যাতি একে একে হইল প্রচার।

এই রুস্তম শাহর নামে রুস্তমের হাট এবং হাটের কাছেই দরগাহ আছে। লোকশ্রুতি মতে রুস্তম তিন-চারশ বছর আগেকার লোক। রুস্তমের গায়েবী-শ্রুত বাণীই আফজল তাঁর মুখে শুনে লিপিবদ্ধ করেছেন বলে গ্রন্থে উল্লেখ আছে। ভাষা ও বর্ণন ভঙ্গি বিচারে আফজল আলিকে আঠার শতকের শেষার্ধের কবি বলে মনে করি। অতএব শাহ রুস্তমও এ সময়েরই লোক হবেন।

নসিয়ৎ নামার লিপিকরের পুষ্পিকা এরূপ :

"এই পুস্তক লিখিলাম মোসন আলী হীনী। সাঙ্গ হৈল ২৪ চব্বিষ মঘির ১২ বার আশ্বিন দিনে।" হরফ দেখে, ১২২৪ মঘী বলেই অনুমান করতে হয়।

আফজল (সৈয়দ)—ইনি সম্ভবত কবি এতিম নাসিরের পীর শাহ আফজল। আফজলও তাঁর পীর শাহ কাতালের প্রশস্তি গেয়েছেন। এই 'কাতাল' এর নামেই সম্ভবত চট্টগ্রাম শহরের একটি অঞ্চল কাতালগঞ্জ হয়েছে।

আবাল ফকির—এক বালক ফকির ফায়তুস মুকতদী ও নুরহাসুল আরেফিন নামে ধর্মবিষয়ক গ্রন্থ ও চৌতিশা রচনা করেছেন। বালক ফকির শাহ আলী রজার মুরিদ ছিলেন :

শাহ আলী রজা গুরু পদে নমস্কারী
বালক ফকিরে ভণে কিতাব বিচারি।

অতএব বালক ফকির আঠার শতকের শেষার্ধের কবি। এই বালক ফকিরই যে আবাল ফকির তা জোর করে বলবার উপায় নেই। তবে বালক আর আবাল একার্থবোধক।

আব্বাস—পরিচয় অজ্ঞাত।

আব্দান ও আমান—আব্দান ও আমানকে আমরা অভিন্ন ব্যক্তি বলে মনে করি। এক আমানকে আমরা 'সখীর বারমাস' রচয়িতা বলে জানি (পুথি পরিচিতি পৃঃ ৩৭৪)। আমাদের অনুমানে তিন লেখকই অভিন্ন ব্যক্তি।

আলাউল—ফরিদপুরের ফাতেহাবাদ পরগণার অধিপতি মজলিস কুতুবের অমাত্য পুত্র। মজলিস কুতুবের রাজধানী জালালপুরেই আলাউল পিতার সঙ্গে আযৌবন বাস করেন। পিতার সঙ্গে জলপথে কোথাও যাবার সময় হার্মাদদের হাতে পিতার মৃত্যু হয়। আর আলাউল আরাকান রাজ্যের রাজধানী ম্রোহঙএ তথা রোসাঙ্গে উপস্থিত হন। এ সময় সম্ভবত তিনি যৌবন সীমা উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। তাঁর বাকী জীবন রোসাঙ্গেই কাটে। এখানে তিনি মন্ত্রী মাগন ঠাকুরের আগ্রহে পদ্মাবতী (১৬৫০ খ্রীঃ) সোলায়মানের নির্দেশে রতনকলিকা-আনন্দবর্মা উপাখ্যান (সতীময়নার শেষাংশ ১৬৬৯ খৃঃ), মাগনঠাকুর ও সৈয়দ মুসার অনুরোধে যথাক্রমে সয়ফুলমুলক-বদিউজ্জামালের প্রথমাংশ (১৬৫৮ খ্রীঃ) ও শেষাংশ (১৬৬৯ খ্রীঃ), সৈয়দ মুহম্মদ খানের আদেশে সপ্তপয়কর (১৬৬৩ খ্রীঃ), সোলায়-মানের নির্দেশে তোহ্‌ফা (১৬৬৪ খৃঃ) এবং নবরাজ মজলিসের আগ্রহে সেকান্দর নামা (১৬৭৩ খৃঃ) রচনা করেন। আজকাল বিধ্বস্ত রোসাঙ্গকে লোকে 'পাথুরে কেল্লা' বলে নির্দেশ করে। এখানে আলাউলের কবর ও মসজিদ আছে।

১৬৬৬ খ্রীস্টাব্দ অবধি গোটা চট্টগ্রাম এবং ১৭৫৬ সন অবধি দক্ষিণ চট্টগ্রাম আরাকান রাজ্যভুক্ত ছিল। সে জন্য আলাউলের গ্রন্থগুলোর পড়ুয়া ছিল রোসাঙ্গ রাজ্যভুক্ত চট্টগ্রাম-বাসীরাই। আলাউলকে চট্টগ্রামবাসী বলে মনে করবার কারণও এই। আলাউল বহু ভাষাবিদ ও সঙ্গীতশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। আরাকানে ইনি সঙ্গীত-শিক্ষক রূপেই প্রথম প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। আমাদের ধারণা শিক্ষকতা সূত্রেই তিনি রাগানামা ও পদাবলী রচনা করেছেন। বিস্তৃত বিবরণের জন্যে 'তোহ্‌ফার ভূমিকা (সাহিত্য পত্রিকা : ১মবর্ষ, ২য় সংখ্যা, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) দ্রষ্টব্য।

আলাউল খান—ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সম্পাদিত পদ্মাবতীর (১মখণ্ড) ভূমিকায় উদ্ধৃত এক পদে এক সাধক আলাউল খানের উল্লেখ আছে। কিন্তু "সই বড় অপরূপ সাজে" পদের ভণিতায় বিকল্পে যে আলাউল খান আছে, তা আমাদের ধারণায় 'ভাণ' স্থলে খান হয়েছে। বরিশালের আলাউল খান ভিন্ন ব্যক্তি।

আলিমুদ্দিন—এক আলিমুদ্দিন যোগকলন্দর পুথির লিপিকর ছিলেন। লেখা শেষ করে তিনি বলেছেন,

এক পুস্তক যে মুই সমাপ্ত করিলুম
আসলেত এহার অধিক না পাইলুম।
আসলেত যেন মত বচন পাইলুম।
কবি স্মরি মান্য করি যতনে রাখিলুম।

আর এক নিবেদন শুন গুণিগণ
লিপি করিলুম নাম থাকিতে কারণ।
মনবাঞ্ছা অধীনের এইমত ছিল
দিন 'মারফত' এই প্রচার করিল।
নতু কেহ নাম মোর করিলে বিচার
উপরের পঞ্চপদে পাইবেক সার।
পদের আন্তাক্ষর একত্র করিয়া
অধীনের নাম সবে চাহিবে পড়িয়া।
শাকে মঘী সহস্র যে কুরুপুত্র জান
নেত্র শেষে দ্রুপ-সুতা-পতি হয় মান।
ফাল্গুনের রোজ দিন তারিখ যে গণি
এই মতে হিসাব যে নও পরিমাণি।

[পুথি পরিচিতি পৃঃ ৪৪৩—৪৫]

সহস্র— ১০০০
কুরুপুত্র— ১০০
নেত্র— ৩
দ্রুপসুতাপতি—৫

১১০৫ মঘী পাওয়া যায়।

অতএব, আলিমুদ্দিন ১১০৫ মঘী বা ১৭৭৩ খ্রীস্টাব্দে যোগকলন্দর নকল করেন। এঁর অমরত্বের বাঞ্ছা ও কবিতা রচনার প্রবণতা দেখে আমাদের মনে হয় ইনিই পদকার আলিমুদ্দিন। আমাদের ধারণা সত্য হলে ইনি আঠার শতকের মাঝামাঝি সময়ে বর্তমান ছিলেন।

আলি মিয়া—গুলে বকাউলির (১৭৬০ খ্রীঃ) কবি মুহম্মদ মুকিম তাঁর সমকালীন চট্টগ্রামবাসী কবি হিসেবে সম্ভবত এই আলি মিয়ার নামই উল্লেখ করেছেন। 'হারি নাম, আলি মিয়া পদেত সালাম' (পুঃ পরিচিতি পৃঃ ১০১)। তা' হলে আলি মিয়া আঠার শতকের মাঝামাঝি সময়ের লোক। লোকশ্রুতি অনুসারে তাঁর নিবাস ছিল চট্টগ্রামের রাউজান থানার সুলতানপুর গ্রামে। সুলতানপুর মুকিমের কর্মস্থল ছিল। আলিমিয়া সাধারণ্যে 'পণ্ডিত' বলে খ্যাত ছিলেন। পদকার মুহম্মদ হাসিমের পুত্র কবি আলি মিয়া ভিন্ন ব্যক্তি।

আলী রজা—আলী রজা ওরফে কানু ফকির চট্টগ্রামের আনোয়ারা থানার ওশখাইন গ্রামে সতের শতকের শেষ দশকে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি একজন সাধক, পীর ও কবি ছিলেন। সাধারণ্যে তিনি 'কানু ফকির' নামে খ্যাত ছিলেন। ওশখাইনে তাঁর দরগাহ ও

বংশধর আছে। তিনি আগম ('জ্ঞান সাগর' এর উত্তর খণ্ড) ও ষটচক্রভেদ নামে দুখানা সুফীযোগ-তাত্ত্বিক গ্রন্থ রচনা করেন। এঁর অপর গ্রন্থ 'সিরাজ কুলুব'। তাঁর সঙ্গীতশাস্ত্র গ্রন্থের নাম ধ্যানমালা। কবির পীরের নাম শাহ কেয়ামউদ্দিন। বয়োজ্যেষ্ঠ হিসেবে গুলে-বকাউলির কবি মুকিমও আলী রজাকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন :

শাহ আলি রজা পদ করিয়া প্রণাম।
হারি নাম আলি মিয়া পদেত সালাম॥

ফায়তুল মুকতদী রচয়িতা বালক ফকির তাঁর মুরিদ ছিলেন। আলি রজা ১১৪২ মঘী তথা ১৭৮০ খ্রীস্টাব্দে পরলোক গমন করেন। তাঁর দুই পুত্র সর্ফতুল্লাহ এবং এর্শাদুল্লাহও কবি ছিলেন। এঁরা পিতাকেই পীর করেছিলেন।

আসক—পরিচয় অজ্ঞাত।

আসাউদ্দীন—কবি মনোহরের পীর-ভাই ছিলেন। অতএব উভয় কবি সমসাময়িক ছিলেন। তাঁদের পীর আইনুদ্দিন যদি পদকার সৈয়দ আইনুদ্দিনই হন, তা হলে তিন কবি একই সময়ে বর্তমান ছিলেন। এঁরা সবাই আঠার শতকের কবি বলে অনুমান করা যায়।

এতিম কাসেম—ইনি চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি থানার ঈসাপুরবাসী ছিলেন। তাঁর 'আওরা দে বারোজ প্রশস্তি' নামের রচনায় তাঁর কিছু আত্মপরিচয় আছে। নিঃস্ব কবি স্থানীয় পর্তুগীজ জমিদারের বিধবা আওরা দে বারোজের কাছে জমি যাজ্ঞা প্রসঙ্গে এ প্রশস্তি রচনা করেছেন। পরোক্ষ প্রমাণে জানা যায় তিনি লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস এর আমলে (১৭৭২-৮৫ খ্রীঃ) উক্ত প্রশস্তি রচনা করেন। কাজেই এতিম কাসেম আঠার শতকের শেষার্ধের কবি। [বাঙলা একাডেমী পত্রিকা—২য় বর্ষ : ভাদ্র-চৈত্র সংখ্যা ১৩৬৪ সন দ্রষ্টব্য]

এবাদত ও এবাদুল্লাহ—সম্ভবত অভিন্ন ব্যক্তি। পুথি পরিচিতির ক্রমিক ৩৯৬ এবং ৪০৮ সংখ্যক রাগমালায় এবাদতের পদ আছে। এবাদুল্লাহর নাম রাগমালাগুলোর কোথাও নেই। কাজেই ব্রজসুন্দর সান্যালের 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি' তৃতীয় খণ্ডে বিধৃত একটি পদের ভণিতায় যে এবাদুল্লাহ আছেন তিনি সম্ভবত এবাদত। আমাদের ধারণা লিপিকর প্রমাদে—হয় এবাদত এবাদুল্লাহ হয়েছে, নয় তো এবাদুল্লাহ এবাদত হয়েছে।

এর্শাদুল্লাহ—কবি আলী রজার পুত্র। নিবাসও ওশখাইন। পিতাকেই পীর করেছিলেন। আঠার শতকের শেষ পাদে বর্তমান ছিলেন।

কবীর (শেখ)—শেখ কবীর ও কবীরকে আমরা অভিন্ন ব্যক্তি বলে অনুমান করি। সুলতান নাসির শাহর (১৫১৯-৩২ খৃঃ) প্রশস্তির প্রমাণে তাঁকে চৈতন্য সমসাময়িক ও ষোল শতকের প্রথমার্ধের লোক বলে মেনে নিতে হয়।

কমর আলী (পণ্ডিত)—চট্টগ্রামের খিতাবচর ও সতরপটুয়ার পাশের গ্রাম 'করুলডেঙ্গা'তেই কমর আলী পণ্ডিতের জন্ম। ইনি শরীয়ৎ বিষয়ক সরসালের নীতি, রাধার

-সংবাদ বা ঋতুর বারমাস নামের পদবন্ধ ও পদাবলী রচয়িতা। করুলডেঙ্গায় তাঁর বংশধরেরা আজো সাধারণ্যে কমর আলীর পরিচয়ে চলেন।

সরসালের নীতির রচনাকাল—চন্দ্রশত বসু ঋতু সন যদি হৈল
ছরসালের নীতি হীনে পঞ্চালী রচিল।
নবী কহিয়াছে এই হিজরীর সন
বৈশাখেতে মধীসন চৈত্রতে পুরণ।

এতে ১০৮৬ হিজরী বা ১৬৭৬-৭৭ খ্রীঃ হয়। অতএব, কবি সতের শতকের শেষার্ধে বর্তমান ছিলেন।

খলিল—'চন্দ্রমুখী' উপাখ্যান রচয়িতা খলিল সিলেটের অধিবাসী ছিলেন। মিশর রাজকুমার গুলসনওয়ার ও গন্ধর্ব রাজকন্যা চন্দ্রমুখীর প্রণয় কাহিনী নিয়ে এ কাব্য রচিত। কবি মুহম্মদ আকবরও এ কাহিনী নিয়ে 'গুলসনওয়ার' নামে উপাখ্যান রচনা করেছেন। ইনি সম্ভবত উনিশ শতকের প্রথমপাদে বর্তমান ছিলেন।

গেয়াস খান—গাএস, গয়াস, গেয়াস খান বা গএয়াস যে 'গিয়াস' এর বিকৃতি তা বুঝতে কষ্ট হয় না। মুকিম গুলে বকাউলির উপক্রমে তাঁর পূর্বসূরী হিসেবে অন্যান্য কবির সঙ্গে গেয়াসেরও নাম করেছেন :

গেয়াস খাঁ (গেআছক) মুজাম্মিল সুধার উপাম। (পুঃ পঃ পৃঃ ১০১)

অতএব গেয়াস খানও সতের শতকে কিংবা আঠার শতকের গোড়ার দিকে বর্তমান ছিলেন।

গোলাম হোসেন—সম্ভবত শ্রীহট্টবাসী ছিলেন। শ্রীহট্ট সাহিত্য সংসদের এক পুথিতে এঁর কিছু গান সংকলিত আছে বলে জানা গেছে। ইনি আঠার শতকের শেষপাদ কিংবা উনিশ শতকের প্রথম পাদে বর্তমান ছিলেন বলে অনুমান করি।

গরীব খান—পদের ভাব, ভাষা ও ভঙ্গি দেখে মনে হয় ইনি বাউল কবি। অতএব উনিশ শতকের কবি হওয়াই সম্ভব।

চম্পাগাজী—পদাবলী ও রাগতালনামা রচয়িতা চম্পাগাজীর নিবাস ছিল চট্টগ্রামের 'সতর পটুয়া' গাঁয়ে। এখানে তাঁর বংশধরেরা আছেন এবং এ পরিবার আজো 'চম্পাগাজীর বাড়ি' নামে পরিচিত। চম্পাগাজী পণ্ডিত ও হাড়িদের সংগীত শিক্ষক ছিলেন। তাঁর রাগনামার এক ভণিতা থেকে তাঁর পিতার নাম জানা যায় :

'আবদুল কাদির সুত চম্পাগাজী নাম' (পুথি পরিচিতি পৃঃ ৪৫২)

ইনিই সম্ভবত কাজী বদিউদ্দিনের বাংলাশিক্ষক ছিলেন। কেন না সতর পটুয়া ও খিতাবচর পাশাপাশি গ্রাম, তখন হয়ত এক নামেই উভয় গ্রাম পরিচিত ছিল। এবং কবি চম্পাগাজী ও কাজী বদিউদ্দিন যে সমসাময়িক ছিলেন তা তাঁদের উত্তর পুরুষ পরম্পরার

হিসাবেও প্রমাণিত হয়। একটি ভণিতা :

এক গৃহের দশ দুয়ার ধরিয়াছে মুখে
শ্রীমুখের ধ্যান কহিলাম সুখে।
শাহ সুলতান-পদে মানি চম্পাগাজী কহে
লাহুতের ঢেউ পড়ে মাণিক্য গলায়।

চম্পাগাজী আঠার শতকের শেষার্ধে বর্তমান ছিলেন।

চাঁদকাজী—এঁর 'বাঁশী বাজান জান না' পদটি খুব জনপ্রিয়। এঁর প্রকৃত পরিচয় অজ্ঞাত। তবে কেউ কেউ অনুমান করেন যে চৈতন্য-দেবের সময়ে ইনি নদীয়ার কাজী ছিলেন। ইনি প্রথমে জনসাধারণের অভিযোগক্রমে চৈতন্যের নবধর্মের প্রতি বিরূপ ছিলেন, পরে চৈতন্যের মত প্রচারে বিশেষ আনুকূল্য দেখান। ডক্টর দীনেশ চন্দ্র সেনের মতে নদীয়ার উক্ত কাজীর নাম ছিল গৌরাই কাজী—চাঁদ কাজী নয়। কিন্তু এখন আবার কেউ কেউ বলছেন, চাঁদ কাজীই নদীয়ার শাসন কর্তা এবং হোসেন শাহর পীর ছিলেন।

চামারু—চামারু পণ্ডিত নামা পুথির লিপিকর ছিলেন। এঁর লিপীকৃত সৈয়দ সুলতানের নবীবংশের একখানি পাণ্ডুলিপির নানাস্থানে চামারু নিজের নাম-ঠিকানা এবং ৩১ক পৃষ্ঠায় আদেষ্টার পরিচয় দিয়েছেন। ৭খ পৃষ্ঠায় লেখা রয়েছে 'লিখিত শ্রীচামারু পণ্ডিত সাং ছুলতানপুর।' লিপিকাল নেই, কিন্তু দেখে মনে হয় পুথিখানি দুশ বছরের পুরোনো। কাজেই চামারু (পণ্ডিত) যে আঠার শতকের শেষার্ধে বর্তমান ছিলেন, সে সম্বন্ধে আমরা নিঃসংশয়। মুকিম উল্লেখিত 'চান্দু'ই চামারু কিনা বলা যায় না।

জীবন—পরিচয় অজ্ঞাত। ইনি ও 'বানু হোসেন বাহরাম গোর' রচয়িতা মুহম্মদ জীবন অভিন্ন কিনা বলা যায় না।

তাহির মাহমুদ—এঁর নামও মুকিম পূর্ববর্তী কবি হিসেবে উল্লেখ করেছেন—"ফাজিল নাসির, তাহির সকল।" অতএব, তাহির মাহমুদ সতের শতকে বা আঠার শতেকের গোড়ার দিকে বর্তমান ছিলেন। তাহির মাহমুদও রাগতালনামা রচনা করেছেন।

তুফানুদ্দিন—পরিচয় অজ্ঞাত।

দানিশ (কাজী) : ইনি রাগমালা ও পদাবলী রচয়িতা। গুলে বকাউলির কবি মুহম্মদ মুকিম এঁকে জ্যেষ্ঠ সমসাময়িক কবি হিসেবে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন : 'শ্রীযুত দানিশ কাজী পদ প্রণমিয়া।'

পদকার বক্সা আলী এঁর শিষ্য ছিলেন। অতএব, ইনি আঠার শতকের কবি এবং চট্টগ্রামবাসী ছিলেন।

দুলামিয়া—পরিচয় অজ্ঞাত। সম্ভবত আঠার শতকের কবি।

নওয়াজিস খান—ইনি গুলে বকাউলি উপাখ্যান, জরওয়ার সিংহ, পাঠান প্রশংসা, হোসেন নৃপতির কীর্তি, বার উপেক্ষিবা (?) প্রভৃতি প্রশস্তি মূলক রচনার এবং বয়েত ও গানের লেখক। গুলে বকাউলিতে ইনি বিস্তৃত আত্মপরিচয় দিয়েছেন। কবির বংশ লতিকা এরূপ:

সিলিম খাঁ, শরীফ বিরহিম শুন আর
মোহাম্মদ এয়ার নওয়াজিস খোন্দকার।

সিলিম খাঁ, এঁর নামে চট্টগ্রাম শহরের উপকণ্ঠে ছিলমপুর গ্রাম হয়েছে।
|
শরীফ মোড়ল
|
বিরহিম — হিরাগাজী — গজমত — গাভুরঠাকুর — মহব্বত
|
মোহাম্মদ এয়ার
|
দৌলত — নওয়াজিস খান — আবদুল মজিদ

নওয়াজিস খোন্দকারের নিবাস ছিল চট্টগ্রামের সাতকানিয়া থানার সুখছড়ি গ্রামে। এখানে তাঁর চতুর্থ-অধস্তন বংশধরগণ বর্তমান আছেন। তাঁর প্রপৌত্র আতাউল্লাহ পণ্ডিতের মতে নওয়াজিস খানের ১০০০ মঘী সনে বা ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম এবং ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দে ১২৭ বছর বয়সে মৃত্যু হয়। কবি বন্দিত জরওয়ার সিংহ (জরওয়ারগঞ্জ ও ফেনীর জরওয়ার সিংহের দীঘি যাঁর কীর্তি) "হাজারী" মনসবদার লছমন সিংহের পুত্র। আধু খাঁ ও লছমন সিংহ—১৬৬৬ খ্রীস্টাব্দে শায়েস্তা খানের চট্টগ্রাম বিজয়ের পরে—সীমান্ত সেনানীরূপে দোহাজারীতে প্রতিষ্ঠিত হন। নওয়াজিস আলাউল ও তাঁর সপ্তপয়কর এর উল্লেখ করেছেন পাঠান প্রশংসায় (সম্ভবত এটি আধুখাঁর পুত্র শের জামালের স্তুতি)

কে জানিত বহরমগোর কোথা রহে
সপ্ত নারী সপ্ত কার সুপ্রসঙ্গ কহে।
কে জানিত এ সকল ভাবি চাহ মনে
জ্ঞানবন্ত আলাওল রচন, কারণে।

এ সকল তথ্যের আলোকে নওয়াজিস খানকে সতের শতকের শেষার্ধ ও আঠার শতকের প্রথমার্ধের কবি বলে অনুমান করা যায়। [পুথি পরিচিত ১০৪-১৭, ১৭২, ৩০৭-৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য]

নব বালক——পরিচয় অজ্ঞাত।

নজর মুহম্মদ—পরিচয় অজ্ঞাত।

নাসির মাহমুদ—নাসির মাহমুদ সম্ভবত ভিন্ন ব্যক্তি। তার পদ দুটোর একটি পদকল্পতরুতে এবং অপরটি রমণী মোহন মল্লিকের 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি'তে প্রথম সংকলিত হয়। বৈষ্ণব দাসের পদকল্পতরু আঠার শতকের গোড়ার দিকে সংকলিত হয়। কাজেই নাসির মাহমুদ ষোল কিংবা সতের শতকের লোক হবেন।

নাসির মুহম্মদ (ফাজিল)—নাসির মুহম্মদ ও ফাজিল নাসির একই ব্যক্তি। কবির পুরো নাম ফাজিল নাসির মুহম্মদ। নামটি দীর্ঘ হওয়ায় ইনি কখন ফাজিল নাসির আবার কখনো নাসির মুহম্মদ বলে ভণিতা করেছেন। ইনি চট্টগ্রামের সুলতানপুর গ্রামের জমিদার ওয়াহিদ মুহম্মদ চৌধুরীর আদেশে ১৭২৭ খ্রীস্টাব্দে রাগমালা রচনা করেন। তাঁর গ্রন্থের নাম 'ধ্যানমালা' এবং রাগ তালের বইয়ের মধ্যে তাঁর ধ্যানমালা সর্বশ্রেষ্ঠ। কবির পীরের নাম জান মুহম্মদ :

সর্বশাস্ত্রে অবধান রূপে নব পঞ্চবাণ
শ্রীযুত জান মোহম্মদ।
মান্যগুরু শিরোমণি জ্ঞানের সমুদ্র জানি
পুনিপুনি প্রণামি সে পদ।

আদেষ্টা পরিচিতি :

অধিক উত্তম স্থান সুলতানপুর
সেই রাজ্যের অধিপতি শ্রীমন্ত শ্রীযুত
ওয়াহেদ মোহাম্মদ সর্বগুণযুত।
শ্রীল শ্রীযুত ওয়াহিদ মোহাম্মদ
মুখশশী শারদ নির্মল
আয়ু দীর্ঘ রোগ নাশ পুর নর হাভিলাষ
শত্রু তান হোক পদতল।
তাহান আদেশ পালি নিজ মনে আবকলি
ফাজিল নাসির মোহাম্মদ।
বেয়াল্লিশ রাগের বাণী রঙ্গের প্রসঙ্গ জানি
'ধ্যানমালা' বিরচিত পদ।

রচনাকাল :

ষষ্ঠ ঋত রাগ আদি সমাপ্ত হইল যদি
এবে কহি শাকের নির্ণয়,
মঘী কত অব্দ হএ শকাব্দ কতেক কহে
দিবা দণ্ড কহিমু নিশ্চয়।
মঘীসন পরিমাণ হাজার ন আশি জানি
শকাব্দ ষোলশ ন চল্লিশে।
পৌষ মাস বহি গেল সংক্রান্তি দিবস ভেল
বিংশদণ্ড শনিবার দিবসে।
অক্ত যোহর সমে লেখা ভেল অনুক্রমে
সমাপ্ত হইল রাগ মালা
পুর্ব সরা ধনু শশী তিথি কৃষ্ণ চতুর্দশী
সপ্তবিংশজমাদিল আউয়ালা।

এতএব ১০৮৯ মঘী বা ১৬৪৯ শকে তথা ১৭২৭ খ্রীস্টাব্দে ইনি গ্রন্থ রচনা করেন। কাজেই ফাজিল নাসির মুহম্মদ আঠার শতকের প্রথমার্ধে বর্তমান ছিলেন।

নাসিরউদ্দিন (সৈয়দ)—'সিরাজ সবিল' রচয়িতা সৈয়দ মুহম্মদ নাসির এবং বিসমিল্লার বয়ান রচয়িতা নাসিরুদ্দিন আর সৈয়দ নাসিরউদ্দিন অভিন্ন ব্যক্তি বলেই আমাদের ধারণা। সৈয়দ নাসিরউদ্দিন ওহাবের শিষ্য হলে আঠার শতকের শেষার্ধে বর্তমান ছিলেন।

নাসির (এতিম)—আমরা নাসির মুহম্মদ ও ফাজিল নাসির মুহম্মদকে এক ব্যক্তি এবং সৈয়দ নাসিরুদ্দিনকে অপর কবি এবং নাসির মাহমুদকে ভিন্ন কবি বলে মনে করি আর এতিম নাসির চতুর্থ কবি। কাজেই আমাদের ধারণায় নাসির চার জন। এঁর পীর ছিলেন শাহ আফজল। এই শাহ আফজল সম্ভত পদকার সৈয়দ আফজল।

পীর মুহম্মদ—পরিচয় অজ্ঞাত। সম্ভবত আঠার শতকের কবি।

পোতন—পরিচয় অজ্ঞাত। পোতন ও পদকার ফতন আর ফতে খান অভিন্ন ব্যক্তি হওয়া অসম্ভব নয়।

ফকির ওহাব—'বেনজির বদর-ই মুনির' ও 'সিরাজ সবিল' (পুঃ পরিচিত পৃঃ ৩৭৬ ও ৫৯৬) রচয়িতা সৈয়দ মুহম্মদ নাসির তাঁর সিরাজ সবিলে বলেছেন :

আবদুল ওহাব পীর জ্ঞানের সাগর
যুগপদে তাহান প্রণামি বহুতর।

ওহাব ফকির ও সৈয়দ মুহম্মদ নাসিরের পীর আবদুল ওহাব সম্ভবত অভিন্ন ব্যক্তি। সৈয়দ মুহম্মদ নাসির এবং পদকার সৈয়দ নাসিরউদ্দীনও হয় তো অভিন্ন ব্যক্তি। অবশ্য নাসিরউদ্দিনের পীরের নাম 'শাহ আবদুল্লাহ'। 'আবদুল ওহাব' লিপিকর প্রমাদে আবদুল্লাহ হওয়া অসম্ভব নয়। যা হোক, সিরাজ সবিলের কবি সৈয়দ মুহম্মদ নাসির আলী রজার সিরাজ কুলুব গ্রন্থের নাম করেছেন :

সিরাজ কুলুব নামে কিতাব আছএ
খন্নাসের বিবরণ লেখিয়া আছএ।

এতে মনে হয় ইনি আলী রজার কনিষ্ঠ সমসাময়িক বা পরবর্তী কালের কবি ছিলেন। আলী রজা আঠার শতকের মধ্যভাগ অবধি জীবিত ছিলেন। অতএব ফকির ওহাব ও তাঁর শিষ্য সৈয়দ মুহম্মদ নাসিরউদ্দিন আঠার শতকের শেষার্ধের লোক ছিলেন বলে অনুমান করা যায়। ব্রজ সুন্দর সান্যাল ওহাব ফকিরকে চট্টগ্রামের বোয়ালখালি থানার হাওলা (খরন্দীপ) বাসী বলে অনুমান করেছেন।

ফকির তেলা শাহ—সিলেটের 'বালাগঞ্জ' থানার এক গাঁয়ে এঁর জন্ম। ইনি বাউল কবি। এঁর 'খবর নিশান' নামে গীত গ্রন্থ আছে। ইনি সম্ভবত উনিশ শতকের কবি।

ফকির শাহ—পরিচয় অজ্ঞাত।

ফকির হাবিব—পরিচয় অজ্ঞাত।

ফতন—পরিচয় অজ্ঞাত। পদকার পোতন ও ফতে খান আর ফতন অভিন্ন ব্যক্তিও হতে পারেন।

ফতেখান—ইনি যে নবীবংশ রচয়িতা 'পীর মীর সৈয়দ সুলতান (শাহর) এর মুরিদ ছিলেন, তা তাঁর ভণিতাতেই প্রকাশ। অতএব ইনি ষোল শতকে কিংবা সতের শতকের প্রথমার্ধে বর্তমান ছিলেন। পোতন, ফতন ও ফতে খান অভিন্ন ব্যক্তি কিনা বলা যায় না।

ফয়জুল্লাহ(মীর, মীর্জা, শেখ)—এখন নিঃসংশয়ে জানা গেছে মীর ফয়জুল্লাহ গোরক্ষ বিজয়, গাজী বিজয়, সত্যপীর বিজয় এবং জয়নবের চৌতিশা নামের বিলাপ রচয়িতা। সত্যপীর পাঁচালীর রচনার তারিখও পাওয়া গেছে:

গোর্খ বিজয় আগ্নে মুনি সিদ্ধা কত
কহিলাম সবকথা শুনিলাম যত।
কাঁটা দুয়ারের পীর ইসমাইল গাজী
গাজীর বিজয়ে সেহ মোক হইল রাজী।
এবে কহি সত্য পীর অপুর্ব কথন
ধন বাড়ে শুনিলে পাতক খণ্ডন।
মুনি রস বেদ শশী শাকে রহে সন।
শেখ ফয়জুল্লা ভণে ভাবি দেখ মন।

এর থেকে ১৪৬৭ বা ১৪৯৭ শক তথা ১৫৪৫ বা ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দ পাওয়া যায়। অতএব শেখ ফয়জুল্লাহ ষোল শতকের মাঝামাঝি সময়ে বর্তমান ছিলেন। এখন প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে: মীর, মির্জা ফয়জুল্লাহ ও শেখ ফয়জুল্লাহ অভিন্ন ব্যক্তি কি-না। কাব্যগুলোতে সাধারণত মীর পাচ্ছি। অধ্যাপক আলি আহমদের কলমী পুথির তালিকায় দেখা যায় গোরক্ষ বিজয়ের ভণিতায় 'মীর' 'ফয়জুল্লাহ'ই বেশী। আবার পুথি পরিচিতির ৩০১ সংখ্যক বিবরণে রাগনামা লেখক শেখ ফয়জুল্লাহ এবং ১১৪ সংখ্যক গোরক্ষ বিজয়ে মীর ফয়জুল্লাহ পাই। দু'একটি পদেও 'শেখ' ফয়জুল্লাহ দেখা যায়। অতএব শেখ ও মীর বা মীর্জা ভিন্ন ধরণের কুলোপাধি হলেও এ ক্ষেত্রে শেখ ও মীর ফয়জুল্লাহকে অভিন্ন ব্যক্তি বলে ধারণা করা যেমন সম্ভব, তেমনি লিপিকর প্রমাদে শেখ ফয়জুল্লাহ ও মীর ফয়জুল্লাহ নামের দুই ভিন্ন ব্যক্তির নাম বিভ্রান্তি ঘটাও অসম্ভব নয়। তাই আপাতত আমরা মীর (মীর্জা)ভণিতার আধিক্যের প্রমাণে গোরক্ষ বিজয়াদি এবং রাগনামা ও পদাবলী রচয়িতাকে মীর ফয়জুল্লাহ বলে মেনে নিচ্ছি এবং 'শেখ ফয়জুল্লাহ' লিপিকর প্রমাদের ফল বলে ধরে নিচ্ছি। কেননা, লিপিকর প্রমাদের স্বাভাবিক ভাবেই পুনরাবৃত্তি ঘটে এবং তা সংশোধনের কোন উপায় সে যুগে ছিল না। তাই আজকের দিনে আমাদের বিভ্রান্তির কারণ হয়েছে।

বকসা আলী—বকসা আলী রাগতালের পুথিও রচনা করেছেন। একটি রাগমালায় তাঁর ভণিতার মধ্যে কিছু আত্মপরিচয় আছে:

১ দানেশ কাজীর পদ শিরেত বন্দিয়া
কহে হীন বকসা আলী পয়ার রচিয়া।

২ কহে হীন বকসা আলী চট্টগ্রামে স্থিতি
আরব আলী চৌধুরী-বেটা সায়ের মুহম্মদের নাতি।

৩ কহে হীন বকসা আলী বেলমোড়িতে বাড়ী
পিতার নাম মোহাম্মদ আরব চৌধুরী।

এ থেকে জানা যায় কবির নিবাস বেলমোড়ি গাঁয়ে। পিতার নাম মোহাম্মদ আরব আলী চৌধুরী, পিতামহের নাম শায়ের মুহম্মদ চৌধুরী এবং কবির পীর হচ্ছেন দানিশ কাজী। মুকিম তাঁর গুলেবকাউলিতে দানিশ কাজীকে জ্যেষ্ঠ সমসাময়িক কবি বলে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন : 'শ্রীযুক্ত দানিশ কাজী পদ প্রণমিয়া'

দানিশ কাজী রাগমালা ও পদাবলী রচনা রছেন।

অতএব, বকসা আলী আঠার শতকের শেষার্ধের কবি। কবি মুহম্মদ হারি জগৎ ও জীব সৃষ্টি বিষয়ক 'সৃষ্টি পত্তন' ও জৈগুণের বারমাসী রচনা করেছিলেন। তাঁরও বকসা আলী নামে এক পুত্র ছিল। কিন্তু আলোচ্য বকসা আলী ভিন্ন ব্যক্তি।

বদিউদ্দিন (কাজী)—পদাবলী ছাড়াও ইনি কায়দানী কেতাব, ফাতেমার সুরতনামা ও সিফৎ-ই-ইমান নামে তিনখানা পুস্তিকা রচনা করেছিলেন। 'ফেৎবি-জাহিজ' নামক শাস্ত্রগ্রন্থের একটি পর্ব 'সওয়াল আজিম' এর অনুবাদ 'সিফৎ-ই-ইমান-এ কবি আত্মপরিচয় দিয়েছেন :

চক্রশালা পুরান বস্তি জানে সব গ্রাম
তাতে এক মৌজা 'বহিলী' আছে নাম।
সেই স্থানে চিকণ কাজী করিছে বসতি
উত্তম পুরুষ ছিল ভাগ্যবন্ত অতি।
তান পুত্র 'আয়ুব শরীফ' ছিল নাম
তপমন্ত ছিল সেই দরবেশ উপাম।
তান ঘরে এক পুত্র স্বজন হইল
তাযায়ুদ্দিন খোন্দকার নাম যে আছিল।
তাহান ঔরসে জন্মি দেখিএ সংসার।

চট্টগ্রামের পটিয়া থানা-সংলগ্ন গ্রাম 'বাহুলী'তে কবির নিবাস ছিল। কবির পূর্ব পুরুষ 'চিকণ কাজীর' নামে এ গাঁয়ের এক অংশ 'চিকণ কাজী পাড়া' নামে খ্যাত। এ গাঁয়ে আজো কবির বংশধরেরা বাস করেন। চট্টগ্রামের বোয়ালখালী থানার খিতাবচর বাসী পদাবলী ও রাগনামা রচয়িতা চম্পাগাজী কবির বাংলা শিক্ষক ছিলেন।

আর গুরু চম্পাগাজী নয়ানের জুতি
খেতাবচর শুভগ্রাম তাহান বসতি।
বাঙ্গালা অভ্যাস মোর সেই গুরু হতে
মুখে পাঠ লিখি চিনাইছে নিজ হাতে।

পরোক্ষ প্রমাণে তাঁকে আঠার শতকের শেষার্ধের লোক মনে করি।

বদিউজ্জমা—পরিচয় অজ্ঞাত।

বহরাম—পদকার বহরামের কোন পরিচয় পাওয়া যায়নি। আলি রজার জ্ঞান সাগরের ১৪৪ সংখ্যক পাণ্ডুলিপিতে তাঁর তিনটি পদ পাওয়া গেছে (পুথি পরিচিতি পৃঃ ১৬৭—৬৮)। এর সঙ্গে লায়লী-মজনু ও কারবালা কাহিনী রচয়িতা দৌলত উজির বাহরাম খানের কোন সম্পর্ক নেই বলেই আমাদের বিশ্বাস।

বোলন—পরিচয় অজ্ঞাত।

মছন তাজ—পরিচয় অজ্ঞাত।

মনোহর, মনওয়ার, মনুয়র, মনুঅর—একই ব্যক্তি। উচ্চারণ বিকৃতির ফলেই নাম বিভিন্ন রূপ পেয়েছে। মনোহরের আর কোন পরিচয় জানা যায় না। এক শেখ মনোহর আঠার শতকের শেষার্ধে শমশের গাজীনামা ও গীতরচনা করেছেন। তাঁর বাড়ী ছিল ফেণী অঞ্চলে। তিনিই আলোচ্য পদকার মনোহর কি-না বলবার উপায় নেই। পদকার মনোহর শাহ আইনুদ্দিনের শিষ্য ও পদকার আসাউদ্দিনের পীর-ভাই ছিলেন।

মর্তুজা (সৈয়দ, গাজী, আলি)—পিতৃভূমি বেরিলী। পিতা সৈয়দ হাসানই সম্ভবত মুর্শিদাবাদের জঙ্গীপুর এলাকার বলিয়াঘাটাতে বসবাস করতে থাকেন। এখানেই তাঁর জন্ম হয় বলে লোক-শ্রুতি আছে। আনন্দময়ী নামে এক ভৈরবী সাধিকা তাঁর সঙ্গিনী ছিলেন বলে তাঁদের উভয়কে নাকি 'মর্তুজানন্দ' বলা হত। মর্তুজার পীরের নাম সৈয়দ আবদুর রজ্জাক শাহ। মর্তুজা সাধক হিসেবে খ্যাত ছিলেন।

জঙ্গীপুরের কাছে সুতীগাঁয়ে তাঁর দরগাহ আছে। এখানে আজো উরস হয়। গৌড়ের ফিরোজপুরের শাহ নিয়ামতুল্লাহ নাকি সৈয়দ মর্তুজার সমসাময়িক ও বন্ধু ছিলেন। ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে নিয়ামতুল্লাহর মৃত্যু হয়। কাজেই সৈয়দ মর্তুজা সতের শতকের লোক ছিলেন বলে নিসংশয়ে অনুমান করা যায়। এদিকে সৈয়দ কাসিম শাহ ১১৫৫ হিজরী বা ১৭৪২-৪৩ খ্রীষ্টাব্দে বলিয়াঘাটে এক মসজিদ তৈরী করেন। ইনি নাকি মর্তুজার পৌত্রী (কেউ কেউ বলেন কন্যা) আসিয়াকে বিয়ে করেন। এতেও সৈয়দ মর্তুজাকে সতের শতকে পাচ্ছি। মুফতী গোলাম হোসেন সরওয়ার লাহোরীর 'খজীনতুল আফসিয়া' গ্রন্থে সৈয়দ মর্তুজার পরিচিতি আছে। তাতে মর্তুজাকে গজল গায়ক দরবেশ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ কারণেই সৈয়দ মর্তুজার নামের সঙ্গে 'আনন্দ' যুক্ত হয়েছে বলে কারুর কারুর ধারণা। তিনি বাংলা পদ রচনায় যুগের রেওয়াজ মত রাধাকৃষ্ণ রূপক গ্রহণ করেছেন, কিন্তু তাঁর

ফারসী গজলে তা নেই। আলোচ্য বালিয়াঘাটা বাসী সৈয়দ মর্ত্তুজা ও চট্টগ্রামের পুথিতে পাওয়া পদাবলীর রচয়িতা মর্ত্তুজা অভিন্ন ব্যক্তি কি না বলা যায় না। চট্টগ্রামে পাওয়া পদের একটিতে মর্ত্তুজা আলি, অপর একটিতে মর্ত্তুজা গাজী ভণিতা পাওয়া গেছে। সৈয়দ মর্ত্তুজা 'যোগ কলন্দর' রচনা করেন নি, একখানি যোগ কলন্দরের শেষ পত্রে পাওয়া—

বাপে দিল জনম খানি মায় দিল ক্ষীর
সৈয়দ মর্ত্তুজা কহে জনমের ফকির।

ভণিতাটি আসলে একটি পদের ভণিতা—যোগকলন্দরের নয়।

(পুথি পরিচিতি পৃঃ ৪৩৭, ৪৬৪)

সৈয়দ মর্ত্তুজা সম্বন্ধে বিভিন্ন মতের আলোচনা পাওয়া যাবে। নিম্নোক্ত রচনাগুলোতে :

ক. সুধা—১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা (মাঘ) নিখিল নাথ রায়ের প্রবন্ধ।

খ. Journal of Asiatic Society of Bengal—1924

গ. মুসলমান বৈষ্ণব কবি—১ম খণ্ড, ব্রজসুন্দর সান্যাল।

ঘ. পদকল্পতরু—৫ম খণ্ড, সতীশ চন্দ্র রায়।

ঙ. বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবি—যতীন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য।

চ. মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য—ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক।

ছ. খজীনাতুল আস্ফিয়া—মুফতী গোলাম হোসেন সরওয়ার লাহোরী।

মানিক দাস—পরিচয় অজ্ঞাত। নাম দেখে মনে হয় তিনি হিন্দু, কিন্তু পদ দেখে মনে হয় মুসলমান। মুসলমানের আজও 'মানিক মিয়া' নাম রাখা হয়।

মীর্জা কাঙ্গালী—পদকার মীর্জা কাঙ্গালীর কোন পরিচয় জানা যায় নি। কুলবাচী সাদৃশ্যে ব্রজসুন্দর সান্যাল কাঙ্গালী ও কয়জুল্লার অভিন্ন ব্যক্তিত্ব কল্পনার প্রবণতা দেখিয়েছেন। কিন্তু এঁরা যে দুই ভিন্ন কবি সে সম্বন্ধে আমাদের অনুমাত্র সন্দেহও নেই।

মোছন আলি বা মোহসেন আলি—আফজল আলীর নসিয়ত নামার লিপিকরের নামও মোছন আলি। মোকাম মঞ্জিলের কথা রচয়িতা এক কবি মোছন আলিও আছেন। মোকাম মঞ্জিলের কথা রচয়িতা মোহসেন আলীর গুরু ছিলেন শাহ মইনুদ্দীন—

শাহ মইনুদ্দীন গুরু জ্ঞানের লহরী
কহে হীন মোহসেন আলী গুরু পদ স্মরি। (পুঃ পঃ ৪৩৭-৮)

নসিয়তনামায় লিপিকরের পুষ্পিকা এরূপ :

এই পুস্তক লিখিলাম মোসন আলী হীন।

সাঙ্গ হৈল ২৪ চব্বিষ মঘির ১ আশ্বিন দিনে। হরফ দেখে ১২২৪ মঘী বলেই অনুমান করতে হয়। এই মোহসেন আলিই যদি পদকার হন, তা'হলে তিনি উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বর্তমান ছিলেন। আমাদের ধারণা লিপিকর, পদকার ও মোকাম মঞ্জিলের কথা রচয়িতা অভিন্ন ব্যক্তি।

মুহম্মদ—পরিচয় অজ্ঞাত।

মোমতাজ—পরিচয় অজ্ঞাত। 'মোমতাজ' কবি 'মছনতাজ' নামের বিকৃতি কি না বলবার উপায় নেই।

মুহম্মদ আলি—ইনি হায়রাতুল ফিকাহ এবং শাহপীর-মল্লিকাজাদা ও হাসনবানু নামে দু'খানা উপাখ্যান রচনা করেন। 'হায়রাতুল ফিকাহ' এ কবির আত্মপরিচয় আছে। চট্টগ্রামের আজিম নগর চাকলার ইদলপুর গ্রামে (সম্ভবত রাউজান থানায়) কবির জন্ম হয়। এই ইদলপুরে কবি মুন্সী মুহম্মদ মুকিমের বাস। এই মুন্সী মুকিমের নাম মুহম্মদ মুকিমের গুলে বকাউলিতেও আছে।

ইসলামাবাদ বুলি কহে,
তাহান উত্তর দেশ কি কহিব সবিশেষ
আজিম নগর নাম হএ।
আর এক আছে নাম ইদলপুর অনুপাম
শুদ্ধ সুপবিত্র সেই স্থান।
সেই শুচি রুচি দেশে বহুল আলিম বৈসে
বহুল ওলি আউলিয়ার স্থান।
বহুলোক জ্ঞানবন্ত পণ্ডিতের নাহি অন্ত
মুকিম পণ্ডিত সব শ্রেষ্ঠ।
মোহাম্মদ আলি হএ কেহ মিয়াজিউ কহে
যেন নাম তেন গুণ নাই।
তথাপি লোক সব পণ্ডিত গণের রব
কৃপাদৃষ্টি করে সার ধর।
লেলাঙ্গ (রোসাঙ্গ) রাজ্যত ঠাম ইউসুফ হাফেজ
শুদ্ধ পবিত্র কলেবর।
তাহান বাড়িত যদি আমাকে নিলেক বিধি
কৃপা করি কহিল বচন।
তুমিও পণ্ডিত হও কি তার বাঙ্গালা কহ
পদ বন্ধ করিয়া রচন।
তাহান বচন ধরি প্রভুকে মনেত স্মরি
ইচ্ছিলুম করিতে রচন।
গুরুপদ শিরে ধরি জ্ঞান হীনে শাস্ত্র ধরি
অসাধ্য সাধিতে নিরঞ্জন॥

অতএব, মুহম্মদ আলী সাধারণ্যে মুহম্মদ আলী মিয়াজী নামে পরিচিত ছিলেন এবং তাঁর পণ্ডিত খ্যাতি ছিল। রোসাঙ্গ রাজ্যের [অর্থাৎ দক্ষিণ চট্টগ্রামে; দক্ষিণ চট্টগ্রাম ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দ অবধি আরাকান রাজ্যভুক্ত ছিল।] ইউসুফ হাফেজের আগ্রহে কবি হায়রাতুল ফেকাহ রচনা করেন। মুহম্মদ আলি ও তাঁর প্রতিবেশী কবি মুন্সি মুহম্মদ মুকিম যে আঠার শতকের মাঝামাঝি সময়ে বর্তমান ছিলেন গুলে বকাউলির কবি মুহম্মদ মুকিমের উল্লেখ থেকেই তা প্রমাণিত হয়। যথা

আলী মোহাম্মদ আর চামু বুধজন,
মুনসী নাম মোহাম্মদ মুকিমে বন্দিয়া।

মুহম্মদ আলী এয়ার আলির আদেশে হাসনবানু এবং আমীর হোসেনের আগ্রহে শাহ পরী-মল্লিকাজাদা রচনা করেছিলেন: শ্রীমন্ত এয়ার আলীর গুণবান।
রচে মোহম্মদ আলী আরতি তান।

খ) আমীর হোসেন আরতি কারণ
হীন মোহাম্মদ আলী ভণ।

মুহম্মদ আলি রজা (অধীন রজা, পদের ক্রমিক সংখ্যা : ৯৫) এর পুরো নাম মুহম্মদ আলী রজা। ইনি তমিম গোলাল চৈতন্ন ছিলাল, ও মিশরীজামাল' নামে দুখানি উপাখ্যান রচনা করেন। ডক্টর এনামুল হকের মতে তিনি চট্টগ্রাম জিলার বক্তপুর গ্রামের অধিবাসী। গ্রামে এখনো তাঁর বংশধরেরা প্রতিষ্ঠাশালী। তিনি ১৬৯৯ খ্রীষ্টাব্দে (১০৬৩ মঘী) জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে (১১২৯) পরলোক গমন করেন। (মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য, পৃ ২৭৯-৮০ ও পুথি পরিচিতি ১৮১-৮২, ৪২৮-৩০)।

মোহাম্মদ পরাণ—এই পরাণ কায়দানী কেতাব, নুরনামা রচয়িতা ও শেখ মুতালিবের পিতা সীতাকুণ্ডবাসী শেখ পরাণ নন। মোহাম্মদ পরাণ রাগনামা রচয়িতা। এ ছাড়া তাঁর আর কোন পরিচয় পাওয়া যায় না :

ছান্দন করিয়া তারে দিয়া মৃত চর্ম।
মাটির দবর বানাই করিলেক মর্ম।
আনলে পুড়িয়া তারে করিল নির্মাণ।
গুঁরু গুরু বলিয়া দরবে দিল সান
ছান্দন করিল তারে দিয়া মৃত চর্ম
আনন্দে তুলিয়া লৈলুম বাহিতে যে মর্ম।
মোহাম্মদ পরাণে কহে মনেতে ভাবিয়া
হয় কি না হয় চাহ শাস্ত্র বিচারিয়া। (পুথি পরিচিতি পৃ: ৪৫০-১৬)

মুহম্মদ হাসেম বা হাসিম—চট্টগ্রামের পটিয়া থানার শ্রীমতি বা শ্রীবাই গ্রামে এঁর জন্ম। সাধারণ্যে ইনি হাসিম পণ্ডিত নামে পরিচিত ছিলেন। হাসিম উনিশ শতকের প্রথমার্ধ অবধি জীবিত ছিলেন। তার পুত্র আলি মিয়াও কবি ছিলেন। অপরিণত বয়সে এঁর মৃত্যু হয়। আমাদের পদকার আলি মিয়া ভিন্ন ব্যক্তি।

মুহম্মদ হানিফ—পরিচয় অজ্ঞাত।

রজব আলী—পরিচয় অজ্ঞাত।

রেয়াছক বা রেয়াস খাঁ—'রেয়াছক' সম্ভবত রেয়াস খাঁ'র বিকৃতি। যেমন 'গেয়াস খাঁ' বিকৃতি 'গ আছক' মুকিমের গুলে বকাউলিতে দেখা যায়। (পুথি পরিচিতি: পৃ:১০১)

লালবেগ—পরিচয় অজ্ঞাত।

শমসের—এক শমসের আলাকে 'গুল ও হরমুজ' ও অসমাপ্ত রেজওয়ান শাহ (পরে আসলাম সমাপ্তি দান করেন) উপাখ্যান রচয়িতা বলে জানি। শমসের আলী সত্তের

শতকের শেষ পাদে কিংবা আঠার শতকের প্রথম পাদে বর্তমান ছিলেন। পদকার শমসের ও উপাখ্যান রচয়িতা শমসের আলী অভিন্ন কিনা বলবার উপায় নেই।

শেখচান্দ—পদটি সের চান্দের ভণিতায়ও পাওয়া যায়। সের চান্দ সম্ভবত লিপিকর প্রমাদ জাত বিকৃতি। শেখ চান্দ সাধক পীর শাহদৌলার সাগরেদ এবং নিজেও সাধক ছিলেন। ত্রিপুরা জেলার বাকসার গ্রামে শেখচান্দের দরগাহ আছে। তাঁর পীর শাহ দৌলার জন্মস্থান ত্রিপুরার কাসবা পরগনার ছুড়ুয়া গ্রাম। এই গ্রামেই তাঁর কবর আছে। তিনি কিছুকাল পাটিকারায় বাস করেন। শেখচান্দ 'রসুল বিজয়' নামে বিরাট কাব্য, তালিব নামা বা শাহদৌলা পীর, কেয়ামত নামা ও হরগৌরী সংবাদ নামের তত্ত্ব গ্রন্থ রচয়িতা। তাঁর কেয়ামতনামায় রচনার দুটো তারিখ পাওয়া গেছে, একটি :

১ ক এক শও বাইশ পুস্তক রচন

খ এগারশ বাইশ সন রচিল প্রবন্ধে।

এতে অনুমান করা হয় : ১১২২ ত্রিপুরাব্দ।

এবং অপরটি (২) এক সহস্র বাইস সনে পুস্তক রচন।

এতে ১০২২ ত্রিপুরাব্দ পাওয়া যায়।

প্রথম তারিখটি নির্ভুল হলে ১৭২২ খ্রীঃ হয়, আর দ্বিতীয়টি যথার্থ হলে ১৬১২ খ্রীঃ পাওয়া যায়। অতএব শেখচান্দের আবির্ভাব কাল সম্বন্ধে সম্প্রতি কিছুই নিঃসংশয়ে বলা যায় না।

শেখ ভিকন—পরিচয় অজ্ঞাত।

শেখ লাল—পরিচয় অজ্ঞাত। পদকার 'লালবেগ' বোধ হয় ভিন্ন ব্যক্তি।

সর্ফতুল্লাহ—কবি আলী রজার পুত্র। নিবাসও ওশখাইন। পিতার কাছেই মুরিদ হন। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে প্রায় আশী বছর বয়সে মৃত্যু বলে প্রকাশ।

সাল বেগ বা সালেহ বেগ—ইনি উড়িষ্যা বাসী ছিলেন। 'দার্ঢ্য ভক্তি' গ্রন্থে এঁর পরিচিতি আছে। মুসলমান সেনাধ্যক্ষের ঔরসে ও হিন্দু বিধবার গর্ভে এঁর জন্ম। ইনি বৈষ্ণব ছিলেন বলে লোক-শ্রুতি আছে। মিথিলার বিদ্যাপতি যেমন বাংলারও কবি উড়িষ্যার সালেহ বেগও তেমনি বাঙলার বৈষ্ণব কবির অন্যতম বলে স্বীকৃত।

সিরতাজ বা সেরতাজ—পরিচয় অজ্ঞাত।

সুন্দর ফকির—চট্টগ্রামের প্রখ্যাত পীর-দরবেশের নাম করতে গিয়ে মুকিম গুলে বকাউলিতে সুন্দর ফকিরের নামোল্লেখ করেছেন :

শাহ জাহিদ, শাহ পন্থি আর শাহ পীর

হাদি বাদশা আর শাহ সুন্দর ফকির।

অতএব, সুন্দর ফকির ষোল-সতের শতকের লোক।

সেরবাজ—শেখ সেরবাজ চৌধুরী মল্লিকার হাজার সওয়াল বা ফক্করনামা, কাসেমের লড়াই ও ফাতেমার সুরতনামা রচয়িতা। পদকার সেরবাজ ও ইনি অভিন্ন ব্যক্তি। তাঁর পীর ছিলেন বদিউদ্দীন ওস্তাজ ছিলেন হাসান শরীফ এবং ফক্করনামা রচনায় আদেষ্টা ছিলেন সৈয়দ বায়েজিদ। সেরবাজ চট্টগ্রামবাসী এবং আঠার শতকের কবি।

সৈয়দ সুলতান—ইনি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে একজন কবিগুরু। মোহাম্মদ খান, আবদুল করিম খোন্দকার, ফতেহ খান, সৈয়দ মুহম্মদ নাসির, মঙ্গলচাঁদ, সেরবাজ, শেখ পরান, মুহম্মদ মুকীম, মুহম্মদ আলী, মুজাফফর, শরীফ শাহ, মীর মুহম্মদ সফী প্রভৃতি অনেক কবিই তাঁর ও তাঁর কাব্য নবীবংশের নাম শ্রদ্ধার সাথে উল্লেখ করেছেন। ইনি চট্টগ্রামের চক্রশালা চাকলার অধিবাসী ছিলেন। তিনি নবীবংশ নামে নবী কাহিনী এবং জ্ঞান প্রদীপ নামে সুফী-যোগ সাধন তত্ত্বের রচয়িতা। ১৫৮৪—৮৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নবীবংশ রচনা শুরু করেন। কবি শরীফ শাহ ও মীর মুহম্মদ সফী তাঁর পৌত্র, কবি মুজফফর তাঁর দৌহিত্র এবং কবি মুহম্মদ খান তাঁর সাগরেদ ছিলেন। মীর সৈয়দ সুলতান সাধক ও পীর ছিলেন। রাধাকৃষ্ণ রূপক ছাড়া ইনি বিশুদ্ধ অধ্যাত্ম সঙ্গীত ও রচনা করেছেন। [বিস্তৃত বিবরণের জন্যে 'সত্যকলি বিবাদ সংবাদ' এর ভূমিকা সাহিত্য পত্রিকা, ৩য় বর্ষ ১ম সংখ্যা বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দ্রষ্টব্য।]

হাসমত আলী (চৌধুরী)—ইনি কম্‌রুচ রাজা ও ফগফুর শাহ তথা মলয়া-মাহমুদ নামের উপাখ্যান রচয়িতা। কাব্যে রাণী ভিক্টোরিয়ার উল্লেখ আছে। অতএব ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের পরে কোন সময়ে এ উপাখ্যান রচিত হয়। চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি থানার ভোজপুর গ্রামে এক জমিদার পরিবারে কবির জন্ম হয়। ইনি আলেফ লায়লার অনুবাদ করেছিলেন বলেও শোনা যায়।

হজরত—পরিচয় অজ্ঞাত। এটি পদকারের নাম কি-না তাও নিঃসংশয়ে বলা যায় না।

পরিশিষ্ট—ঘ

॥ বর্ণানুক্রমিক সূচী ॥

অকি অপরূপ রূপের রমণী ধনি ধনি	শেখ কবীর	২৪
অ কি সই না লো সই	মনোহর	১৫৯
অকি মাধব রোষ ক্ষেমা কর মোহে	ঐ	২৩১
অনাথের নাথ রে পরকালে করিবা পার	নওয়াজিস	৩৭৯
অরে শ্যাম গেলা কোন দেশ	মহম্মদ হাসিম	২৪৩
অরে সুজন নাইয়া	ফকির ভেলা শাহ	৩৪৬
অরে বন্ধু না চিনিলুঁ তোরে	এতিম কাসেম	২৪৪
অ বন্ধুর লাগিয়া একেলা বসিয়া রৈলুঁ	অজ্ঞাত	২১৮
অ সই কি লইয়া যাইমু নিজ ঘর রে	ঐ	৩৪৪
আইস কদম্ব তলে বৈস বিনোদিনী রাধা	ঐ	১৬৪
আইল বসন্ত ঋতু হে	ঐ	২৭৪
আঁখি যুগ প্রভাকর সুন্দর বদন	ঐ	১৯২
আগ রাই কি করিমু রে	আইনুদ্দিন	৬৮
আগ সই কানুর লাগি প্রাণ মোর কান্দে	নব বালক	৮২
আগ সই কি করি কোথায় যাইমু	অজ্ঞাত	৮৩
আগে করহ মন দেহের নিরূপণ	ঐ	৩৬০
আগো সই কি দেখিয়া কি শুনিয়া	আহ্মাণ	৬৯
আজ নিশি যাইমু বন্ধুর বাড়ী	অজ্ঞাত	১৭৪
আজু মুই কুলের বাহির হৈলুঁ	সৈয়দ মর্ত্তুজা	৫৫
আজ সই কি দেখিলুঁ স্বপনে	মনোহর	৭২
আজু সুখের নাহি ওর	আলাওল	১৭৯
আজু ল পহুঁ দেখিয়ে আনন্দ চিত	মনোহর	১৮২
আমার কাঁচা সোনারে	অজ্ঞাত	৮৩
আমি সে তোমার নাথ আমি সে তোমার	সৈয়দ মর্ত্তুজা	৩৬৪
আমি প্রাণে যদি না মরি	অজ্ঞাত	২৭৩
আর নিবা কি বন্ধুরে আর নিবা কি	সৈয়দ মর্ত্তুজা	২১৬
আর মুই ল পাসরিতে নারি	নাসির মোহাম্মদ	২৩৯
আর তরিতে উপায় নাই নবীজির পদ বিনে	এর্শাদুল্লাহ	৩৪১
আরে ভরিয়া সুবর্ণের ভরা	বদিয়ুজ্জামান	৩২৫

আরে মোর একি পরমাদ হইল	ফতন	১৪৫
আল রে মুই রূপের নিছনি মরি যাই	সৈয়দ নাসিরুদ্দিন	৬৫
আল রে পরাণের পোতলি	নাসিরুদ্দিন	৬৬
আল সজনি তরু অবলম্বনে কে	আলাওল	১০৪
আ ল সইরে চলিলুম হাটের কারণ	অজ্ঞাত	১৫৬
আল সই প্রেম আনলে দহে হৃদেতে	কমর আলী	২৫২
আলো সজনি ওকে মুরলী বাজায়	ব্রজরায়	১১৬
আ লো সজনি ঘরে গিয়া কি বোল বুলিমু	নাসিরুদ্দিন	১৪১
আ লো রাই সঙ্গে নিবানি মোরে	গোলাম হুসেন	১৮৭
আ লো সখি কহ মুঝে কৈসে মিলায়ব কান	আলাওল	২২৫
আলো রে পরাণের সই	মির্জা কাঙ্গালী	২৩১
আল্লা ভাব, ভাব করিম রহিম	অজ্ঞাত	৩০৪
আল্লা অন্তকালে কি বোল বুলিম	মানিক দাস	৩৪৯
আবের পত্তন ঘর খাকের বন্ধন	গোলাম হোসেন	৩২৮
আহারে যৌবন ফুল বৃন্দাবন	নাসিরুদ্দিন	১৪০
আহা কৃষ্ণ প্রাণনাথ কে নিল হরিয়া	মীর ফয়জুল্লাহ	২২৪
আহা রে মোহাম্মদ	অজ্ঞাত	৩৮৭
আয় দীনবন্ধু এ দুঃখ সিন্ধু	মোহাম্মদ খান	৩৬৮
আয় মুরশিদ দিল নাই তোর	অজ্ঞাত	৩০৫
আড়াসা চাউলের ভাত ক্ষীর নদীর পানি	সৈয়দ মর্তুজা	২১৬
উদ্দেশ না পাইলাম বন্ধু করিবারে সেবা	গয়াস	২২৬
এ পন্থ দি'গেলে বুঝি এয়ার পাত্তস্থা রে	হাসমত আলী	৩৫১
এই মোর কপালে ছিল	আলিমুদ্দিন	২৬১
একি মিত. কি কহবমুই তুঝে ধাম	আলওল	৩৫
এখানে রহিও রাধা এখানে রহিত	অজ্ঞাত	১৯
এত রাতে কেন রাজ পন্থেরে	ঐ	১৭৩
এবে শুনিয়াছি কানু আরের বন্ধু হইলা	ঐ	২১২
ওকি অপরূপ দেখিলুঁ বিপিন মাঝে	মোহাম্মদ	১২
ওকি হালি চলি পড়ে রাধে কালিন্দীর তীরে	মনোহর	৭০
ওকি নাগর কালা বিনে	সৈয়দ মর্তুজা	২৮৫
ও কুলের বধূরে	ঐ	১৩৯
ওগো সখি, মুই কেন আইলাম জলে	ফাজিল নাসির	৭৩

ওগো সই, কে বলে কালিয়া সোনা	সৈয়দ মর্ত্তুজা	৯৮
ও মন দেখরে সতত মুরলী ফুকে কে	সর্ফতুল্লাহ	১২৮
ও মন পাগলারে	অজ্ঞাত	৩৬১
ওরে প্রেম-তুফানে পড়ি আমার প্রাণ গেল	ঐ	১৫২
ওরে সোনা বন্ধুরে কৈও ওইরাঙ্গা চরণে	ঐ	২৭২
ওরে নিরঞ্জণ জাতে দরবেশ	সৈয়দ সুলতান	২৯৪
ও সই করি হাউসে পিরীতি	লাল বেগ	১৪৭
ও হে প্রাণনাথ মোরে নিদয়া হৈও না	এবাদত	১০০
ওহে পরাণ বন্ধু তুমি	সৈয়দ মর্ত্তুজা	৩৬২
কত কত মোহন মোহনি জান	সৈয়দ সুলতান	৩৩
কত না সাধ হি মান	অজ্ঞাত	২৮০
কত কত মোহন মোহনী জান	সৈয়দ সুলতান	২৯৬
কত পন্থ কুল অন্ত নাই	ঐ	২৯৭
কতকাল রাখিমু ভাও দিয়া বানিজের নাও	এতিম কাসেম	৩২২
করিম রহিম তোর নামরে আল্লা	ঐ	৩২০
করুনা' দধি কালার বরণি	আলি রজা	৩৭৩
করুণা সাগর পীর বদর আলম	নাসির	৩৭০
কংসপুর রাজভগ্নী তোমার নেতের অঞ্চলে	অজ্ঞাত	২০
কহ সখি জীবনের উপায় রে	ঐ	১৩১
কহিতে দুঃখে ফাটে বুক	খলিল	৩৫৯
কালা চান্দে আকুল কৈল	কমর আলী	১৪৮
কালা মনোহর বন্ধু রস গুণনিধি	সৈয়দ মর্ত্তুজা	১৭২
কালারে মোর মনোহর রসের গুণনিধি	সৈয়দ আইনুদ্দিন	১৭১
কালা চান্দ কালা চান্দ চিকণ কালিয়া	অজ্ঞাত	১৮৯
কালা চান্দে আকুল কৈল	কমর আলী	২৬৮
কালারূপ কেনে উপজিল গোকুল কুলে	সৈয়দ মর্ত্তুজা	২৫
কালিয়া নাচেরে রমণী সমাজে ভাল	মীর্জা কাঙ্গালী	৩৭
কার ঘরের রসবতী জলে নামিয়াছ	অজ্ঞাত	৮৪
কামিনী না কর গুমান ধনি	মছনতাজ	১৯৯
কার ঘরের নাগর তুমি কালিয়া সোনা	হীন পোতন	২০৯
কানু বিনে রাধার না লয় আন চিত	আলী রজা	১২৫
কানুরে দেখিলা নি যাইতে	অনন্ত	২৪৫

কানু হে নিকুঞ্জ মন্দিরে আইস	অজ্ঞাত	২৫৭
কান্দি কান্দি বলিতেছে শ্রীমতী রাই	কমর আলী	২৫৪
কাহে কাহে ধনি রাগ বানায়া	সুলতান	২৯০
কি আজু কুদিন ভেলিএ	মর্ত্তুজা গাজী	২১৮
কি করিল সখী সবে মোরে নিন্দে	লাল বেগ	১৪৬
কি কর কি কর ভাই, অবোধ চরিত	সৈয়দ আইনুদ্দিন	৩১১
কি কহিব অয়ি সখি কালা গুণনিধি	সৈয়দ মর্ত্তুজা	৩৯৭
কি দেখিলাম যমুনার ঘাটে	আলাওল	৬৩
কি দোষে ছাড়িয়া যাইবা	সৈয়দ সুলতান	২৯৫
কি রূপ দেখিলুম আজু গোপ শিরোমণি	নাসির মোহাম্মদ	৪৬
কি রূপে ধরাইমু প্রাণ প্রিয়া নাহি ঘরে	আইনুদ্দিন	২২৮
কি রূপে যমুনা হৈমু	ভুলা মিয়া	৩৩৯
কি রূপে যমুনা হৈমু পার প্রভু	অজ্ঞাত	৩৪৩
কি রে শ্যাম, এমন উচিত নহে তোমার	মীর্জা কাঙ্গালী	২০৬
কি হৈল আমারে বন্ধু কি হৈল আমারে	ফকির ওহাব	২৪১
কে কে যাইবা যমুনার জলে	সৈয়দ মর্ত্তুজা	৩০১
কেনে আ ল জলেরে	মীর ফয়জুল্লাহ	৩৯৮
কেন আইলাম যমুনার জলে সখী রে	অজ্ঞাত	১৮
কোন রসবতী লাগি চলিছ সাজিয়া	ঐ	৪২
কেনরে যমুনা আইলুম জল ভরিবার	নাসির মোহাম্মদ	৭৬
কেনে রাধার বন্ধু ডাক মোর নাম ধরি	গয়াস	৭৯
কেনে পরিহার প্রভু আপনার দাসী	বোলন	৯১
কেবা রস রঙ্গে রঙ্গে অঙ্গে অঙ্গে ডালে	অজ্ঞাত	২৭১
কেনে আইলুম যমুনার জলে	মীর্জা কাঙ্গালী	৯৯
কে মিলাইবো কে মিলাইবো	আম্মান	২৩৪
কেনে মোরে দিলি অপমান	কমর আলী	২৫২
কে রে কেরে তরুয়া কদম্ব তলে কে রে	অজ্ঞাত	৯২
কৈও কৈও প্রাণ-ঋত রাধার সংবাদ	কমর আলী	২৭৫
কৈ যাম কৈ যাম	মোহাম্মদ হাসিম	৩৩৬
কৈল অন্ধকার মেঘে	সৈয়দ মর্ত্তুজা	৩৮৪
কৈলে বঁধুর কথা কৈও	এর্শাতুল্লাহ	১২৭
কোথা গেলে কালা চান্দের দেখা পাইব	কমর আলী	২৬৩
কোথায় রাখিমু লুকাইয়া রে	আলি রজা	৪০১
কোন্ বোধে উড়িমু নাথরে	অজ্ঞাত	৩০৯
কোন ঘড়ি চাপিয়া মারে ঐ সে মরম ডরে	আসক	৩৩০
ক্ষেম অপরাধীর সর্ব দোষ, করিম দাতা	এর্শাদুল্লাহ্	৩৭৪
খেবা বাঁকা ধরে নৌকা	হজরত	৩৪৮
খোস না লাগে মোর গৃহের বেভার	সৈয়দ আইনুদ্দিন	৫

গর বাচুঙ্গা রে মন-চোর প্রেয়সি	হাসমত আলী	৩৫২
গা তোল গা তোল হরি জীবন আমার	অজ্ঞাত	১৭
গা তোল পরাণের বন্ধু	ঐ	৩৯৫
গুণের নিধি তুয়া বিনে আর নাহি জানি	ঐ	৩০০
গেলা গেলা আরে শ্যাম না গেলা	সৈয়দ মর্তুজা	২০১
গোকুলে আজু আনন্দ অধিক ভেল	আসাউদ্দিন	১৮৪
গোপী-শ্যাম প্রেমের রসাগার	আলী রজা	১২৪
ঘ্রাণ না সহে সজনি রে	আফজল	১১২
চল দেখি গিয়া রূপবন্ধু চল, দেখি গিয়া	মীর্জা ফয়জুল্লাহ	৬০
চলহ সখি নাগরী মান তুমি পরিহরি	নাসির মোহাম্মদ	১১৫
চলরে মুমিন ভাই রূপ দেখি গিয়া	সুন্দর ফকির	৩৩৫
চাকরির নাই মোর সাধ	এতিম কাসেম	৩২১
চিকণ নাইয়া কানাইয়া রে পার কর তুমি	অজ্ঞাত	১৫৭
চেতাও আপনারে মনাই	আব্বাস	৩৩৪
ছি ছি চান্দের তুলনা	অজ্ঞাত	২৭৬
ছোট না রাধিকা ভরণ কলসী	আলি মিয়া	৪১
জয় জয় রাধে গোপাল গোপাঙ্গনা রে	সালেহ বেগ	৪৩
জগপতি সেবকেরে দেখ একবার	নওয়াজিস	৩৭৮
জাগ চল ঘরে যাই রে সুন্দরী রাধে	অজ্ঞাত	১৬২
জাগ জাগ অরে মন্নুরা কত নিদ্রা যাও	মীর ফয়জুল্লাহ	২৯৯
জাগ মন, আলস ছাড়িয়া	সর্ফতুল্লাহ	৩৫৩
জাগরে অবোধ মন জাগরে	সৈয়দ আইনুদ্দিন	৩১৩
জাগরে জাগরে প্রিয়া নিদের কাতর	চম্পা গাজী	৩১৭
জানি জানি আ গ রাই	সৈয়দ মর্তুজা	১০৭
জানিলাম জানিলাম বন্ধু	অজ্ঞাত	৩৯৬
জ্বালাইয়া রাখরে বাতি জীবা যতদিন	সৈয়দ আইনুদ্দিন	৩৯৫
জীউ জীউ মেরে মন চোর গোরা	শাহ্ আকবর	৩৮৮
জীবের ধন, আমায় ছাড়ি গেলা কোন দোষে	নাসির মাহমুদ	২৪০
ঝলক নাচে মোর রঙ্গ শ্যাম	আলাওল খান	১৭০
ঝামর দেখি নন্দের কানাই	সৈয়দ মর্তুজা	১৭৭
ডুবাই এ দুখিনীরে তোর মা এই দুঃখিনীরে	অজ্ঞাত	২৭৭
তুই বন্ধুর সুরতের বালাই লৈয়া	চম্পাগাজী	২৪৯
তুই যদি না দিস রে দেখা	বহরাম	৩২৪
তুয়া বিনু আর নাই জানি রে	সৈয়দ মর্তুজা	৪০১
তোমা নাম ঠামে ঠামে রে নাম	মোহাম্মদ হাসিম	৩৩৭
তোমার পদে লইলুঁ শরণ	নওয়াজিস	৩৯৩
তোমার মনের কালি দূর করি	কমর আলী	৩৬৫
তোর নি বাঁশীর রব শুনি গো কালা	সৈয়দ মর্তুজা	১১০

তোর শরীরে দয়া নাই	কমর আলী	১৯৪
দহে শ্রীরাধিকার প্রাণ	কমর আলী	২১৫
দহে শ্রীরাধিকার প্রাণ	ঐ	২৬৯
দয়া কর দয়াময় আমি পাপী অধীনেরে	মমতাজ	৩৭৬
দয়াল বিধিরে পরকালে দেখাইবা দায়	নওয়াজিস	৩৯১
দারুণ কালা	সৈয়দ মর্তুজা	৩০
দারুণ প্রিয় হামো না বানাএ	ঐ	২১৭
দিনে দিনে আইসে রে নাথ মোর	নসির মোহাম্মদ	৩১৯
দীন বন্ধু, কর পরিত্রাণ	আলাওল	৩৬৯
দুখিনীর যাদু আয়	অজ্ঞাত	৩৮০
দুনিয়ায় আখের ফানা	ঐ	৩৪০
দূরে থাকি রাজাও বাঁশি ঘরে বসে শুনি	ঐ	১৯৩
দে দে নবনী দে খাই	ঐ	৩৯৪
দেখ সখি তরুমূলে ঐ না নাগর রে	নসির মোহাম্মদ	১
দেখ দেখি ও নাগর মন মোহনিয়া	নজর মোহাম্মদ	৮
দেখ সই অপরূপ নন্দ গোপাল	ফকির হাবিব	১৪
দেখ সখি শ্যাম মোহনিয়া	মীর ফয়জুল্লাহ	৩২
দেখ রে সই কালিন্দীর কূলে শ্যামরায়	অজ্ঞাত	৩৯
দেখ সই কালিন্দীর কিনারে শ্যামরায়	সৈয়দ মর্তুজা	৫৪
দেখ সখি আজু নিশি রঙ্গ	অজ্ঞাত	১৯১
দেখা দিয়া জুড়াও পরাণ	বদিউদ্দিন	১১০
ধনি ধনি সুবদনী কর অবধান	অজ্ঞাত	১৬
ধনি ধনি চলিতে খঞ্জন ধরএ	ঐ	২৫৬
ধীরে ধীরে নীরে কর পার	দুলামিয়া	১৬৭
ননদিনী ওরে রস বিনোদিনী	আলাওল	৬২
নন্দ আসি জন্ম দেয় রে, আমার গোপাল আইসে ঘরে	সৈয়দ সুলতান	১৭৮
নন্দ তুমি আ গ বড় রাগিয়া	অজ্ঞাত	৩৮৩
নবীর কলেমা পড় মুখে মোমিন ভাইরে	হাসমত	৩২৯
নবীজি প্রভুরে কহিবা মোর লাগি	নওয়াজিস	৩৫৮
নাইহরের বন্ধু রে দেখি আজি কেনে মান	সৈয়দ আইনুদ্দিন	১৭০
নাইহরের বন্দা কি লৈয়া যাইমু	সৈয়দ মর্তুজা	২৮৪
নাগর যায় রে রাধার মন্দিরে	ঐ	১০৬
নাগর কানাই রে	মুহম্মদ আলি	১৪২
নাগরী, নাগরী, নাগরী	সালেহ বেগ	৩
নাচে কানু ঘুমি ঘুমি রমণীর সমাজে	মনোহর	৩৮
না জানি ওরে গুণনিধি	সৈয়দ মর্তুজা	২৬
না জানোঁ না চিনোঁ। কে বা যমুনার কূলে	মোঃ হাসিম	১২৬
না দেখি রহিতে নারি ছটফট করে হিয়া	আইনুদ্দিন	২২৯

না বাজাইও না বাজাইও বাঁশি রে মুরারি	অজ্ঞাত	১৩৩
না যাইমু মুই মথুরার হাটে	পীর মোহাম্মদ	১৬৬
না যাইমু রে মুঞি মথুরার হাট	অজ্ঞাত	১৬৮
না ল সজনি সই তুঝে বলম মুই নাকো	আলাওল	৩৬
নিকুঞ্জ বনে বাঁশী বাজিল	অজ্ঞাত	১৩৫
নিত্য নিত্য যাচ রে ভোমরা	ঐ	৮৫
নিদ্রাতেজি উঠ প্রভাতে মুমীন ভাই রে	এর্শাদুল্লাহ	৩৮৫
নিল মোর নাগর কে হরিয়া	মনোহর	২৩২
নিশি হৈল শেষ রে প্রাণের বন্ধু	ফকির ওহাব	১৮৫
পন্থ চিনি না রে আরে মনা	ভেলা শাহ্	৩৪৭
পন্থ ছাড় হাটে যাই নিলাজ কানাই	সৈয়দ মর্ত্তুজা	১৬৫
পলকে সখি রে নিশি না পোহায়	মর্ত্তুজা আলী	২১৯
পরাণ বেদনি সই	আবছুল মালী	৩৩৩
পবনা হে গমনেত না করিও বাধা	গয়াস	২২৭
পহুঁ মাধব পরিহর কৈতব বাদে	অজ্ঞাত	১০১
পড়েছি বিষম পাকে, ছুই আঁখি মোর দেখে	নূর মহম্মদ	৩৩২
পার কর পার কর মোরে নাইয়া কানাই	সৈয়দ মর্ত্তুজা	১৬৫
পার কর মোরে কল্পতরু	অজ্ঞাত	৩৭৭
পাষাণ মনরে তুমি আমার কথা ধর	মোহাম্মদ আলী	৩৫৪
পিরীতি অমূল্য ধন	কমর আলি	৩৫০
পিরীতি অমূল্য ধন এবে সে জানলুম সই	অজ্ঞাত	৩০৭
প্রথম বৈশাখ রাধার মনে শোক	হাসিম	২৬০
ঐ	ঐ	৩৮৯
প্রভু দয়াল হের লো মোরে	আলাওল	৩৬৭
প্রাণ সই কি কথা হাম হত ভাগী	ফতে খান	২২৩
প্রাণনাথ ব্রজে না আইল	কমর আলি	২৭০
প্রাণি হরি নিল কানাইয়া	সৈয়দ মর্ত্তুজা	৪৯
প্রাণি মোর কান্দে	অজ্ঞাত	১৩৬
প্রাণে ধৈরজ না মানে	কমর আলি	৯৬
প্রাণের সজনি সই রে	অজ্ঞাত	১৩৬
প্রেম-নগরে আমারে লোকে বলে কলঙ্কী	ঐ	১[illegible]৫
ফুলের মালা গলে রে চম্পার মালা দোলে	হাসিম	১৫০
বদলে থুইয়া যাও বাঁশীরে রাধার বন্ধু	মীর্জা কাঙ্গালী	১১৮
বন্ধু আমার কালিয়া সোনা	সৈয়দ মর্ত্তুজা	৫৩
বন্ধুয়া মোর পরাণের পরাণ	আইনুদ্দিন	৬৭
বন্ধু মোরে ছুঁইওনা ছুঁইওনা রে	সৈয়দ মর্ত্তুজা	১০৮
বন্ধু মোরে কি করিল রে	অজ্ঞাত	২৮৩
বন্ধুয়া বলিমু কোন্ লাজে রে সজনি সই	ঐ	১১৯

বন্ধু বিনে না রহে জীবন	গয়াস	১৫৮
বন্ধুর ভাবে জাগিতে চাপিল কাল ঘুমে	সৈয়দ মর্ত্তুজা	১৭৫
বনমালী শ্যাম তোর মুরলী জগপ্রাণ	আলি রজা	১২২
বরজ কিশোরী ফাগু খেলত রঙ্গে	কবীর	১৮৩
বল দেখি কি বুদ্ধি করিব	নাসির মাহমুদ	১৪৪
বংশী স্বরে পুরে যন্ত্র রাধা হৃদান্তরে	আলি রজা	১৩১
বাহির হইয়া দেখরে রাধা বিনোদ রায় সাজে	গয়াস	৯
বায়ে সখিগণ বিবিধ বাজন	সালেহ বেগ	১৮৮
বিনোদিনী জলদ-বরণ কালা গো সই	আইনুদ্দিন	৬
বিনোদিনী সাজিছে কতেক ভাতি	অজ্ঞাত	৪৪
বিনোদিনী ঐ সে কালিয়া কানু	ঐ	৪৫
বিনোদ কানাই	ঐ	১৩২
বিনোদ আজু যাও ঘর	সৈয়দ আইনুদ্দিন	১৬৯
বিনোদ আমার বাড়িত আয়	সৈয়দ মর্ত্তুজা	৩৬৩
বিনোদ রায়	অজ্ঞাত	৪০০
বিপথ লোক রে ধর্মপন্থ করিলা লোপ	নওয়াজিস	৩৫৭
বাঁশী বাজান জান না	চাঁদ কাজী	১০৫
বৃন্দাবনে রাধা কানু রঙ্গের রঙ্গিয়া,	সৈয়দ আইনুদ্দিন	১৮০
ভকতি করিএ তুয়া পায় করিম	এর্শাদুল্লাহ্	৩৭৫
ভজ সখি নন্দ কিশোর	সৈয়দ মর্ত্তুজা	২২১
ভজহোঁ নজর কর বদর দেওয়ান	অনন্ত	৩০২
ভবে আসি হইলাম অপরাধী প্রভু দীননাথ	মোহাম্মদ আলী	৩৫৫
ভরা কূলায় রে পানুয়া নাও	অজ্ঞাত	২৮৯
ভাবি মনরে, কিছু না পাই রে	নুর মহম্মদ	২৫০
ভাবে ভুলি রৈব কতকাল আবোধ মন	এর্শাদুল্লাহ	৩৪২
ভুবনমোহন রূপ অতি মনোহর	সৈয়দ মর্ত্তুজা	২৭
ভ্রমে অভাগিনী না চাহিলাম গুণমণি	শমসের	১৫১
মজাইলুঁ রে জাতি রসিয়া নাগর রে	সৈয়দ মর্ত্তুজা	৪৮
মজিলে তিলেক না দেয় ঠাঁই	অজ্ঞাত	৩৪৫
মথুরার বাজারে যাই	মোছন আলি	১৬১
মধুর মুরলী ধ্বনি শুনিতে সুস্বর	মোহাম্মদ হানিফ	১৩
মন মোর কি দিয়া বান্ধিমু	সৈয়দ মর্ত্তুজা	২১৩
মন চেতাও আপন	সৈয়দ আইনুদ্দিন	৩১১
মন মোর ছোড়ল এই না গৃহ আশ	মনোহর	৩২৬
মরম দগধে প্রেম বাণে	সৈয়দ আইনুদ্দিন	১৬১
মলয়ানিল বন্ধুতে কহিও পরণাম	ঐ	২৩০
মা আমারে অভয় দিলি না	আকবর আলী	৩৭২
মালিনী রে লইয়া রে তোর ফুল	সৈয়দ মর্তুজা	২১৫

মুঞি কেনে পিরীতি রে কৈলু	সৈয়দ মর্তুজা	৪৭
মুনি মন মোহন মানিনী মনে	পির মোহাম্মদ	২০৮
মুমীনগণরে প্রভুর পদে	নওয়াজিস	৩৯২
মুরলী আনিয়া দেয় রাই মোরে	আবাল ফকির	৮১
মুরশিদ মনেতে বড় ভয় লাগে রে	অজ্ঞাত	৩৫৬
মুমীন ভাইরে না কর বড়াই	নওয়াজিস	৩৯০
মোর কালিয়া যায় রে নিদারুণ হৈয়া	অজ্ঞাত	২৭৯
মোর পিয়া নিমায়া অতি বেদনি সই রে	এতিম কাছিম	৩২৯
যাই কোন্ ঠাঁই, সজনি সই	এতিম নাসির	২৩৮
যাইবানি রে মন সাঁচানি রে মন	সৈয়দ সুলতান	২৯৮
যৌবন গেল মোর রে	সৈয়দ মর্তুজা	৩৯৯
যাদবেরে দেখলানি	অজ্ঞাত	৩৮১
রহিয়াছে প্রভু করতার	ফকীর শাহ	৩৩১
রঙ্গের বারই অরে মুরশীদ	অজ্ঞাত	৩০৩
রাই রাই কর কর অবধান	মীর ফয়জুল্লাহ	৬১
রাখিমু তোরে হিয়ার মাঝারে	চম্পাকাজী	৭৭
রাধা মাধব নিকুঞ্জ বনে	মীর ফয়জুল্লাহ্	৩১
রাধা কানু নিকুঞ্জ মন্দির মাঝে রে	অজ্ঞাত	৯৪
রাধের ভাবে কানুর মন	চামারু	৭৮
রূপের নিছনি যাই	সৈয়দ আইনুদ্দিন	৬৪
রে মন কত না কহিমু	সুলতানি	২৯২
রে মোর বনবাসে বাস	নাসিরুদ্দিন	৩১৮
রে শ্যাম বিশেষ চাতুরী ছোড়	আফজল	২০৪
রৈয়া রৈয়া উঠে মনে ওহি বিনোদিয়া	মনোহর	৭০
লালসা দি যৌবন লুটিল	কমর আলি	১৫৩
শরমে শরম পালায়ে গেল	গরীব	১৮৬
শুন লো সজনি কিছুই না জানি	শেখলাল	২৩৫
শুন সখী সার কথা মোর	আলি রজা	২৪৬
শুন প্রাণনাথ নিবেদন পদে	আলি রজা	২৫১
শুন সইরে কাহে লাগি	তুফানুদ্দিন	২৫৯
শ্যাম, আন না লয় মনে	সৈয়দ মর্তুজা	২৯
শ্যাম বন্ধু চিত নিবারণ তুমি	ঐ	৫২
শ্যামল সুন্দর তনু দেখিলুঁ স্বপনে	ঐ	৫৭
শ্যাম বন্ধু মোর আয় রে আয়	অজ্ঞাত	৮৬
শ্যাম বন্ধুরে হৃদে থাকি দেখা দাও মোরে	ঐ	৯০
শ্যাম অঙ্গে বংশী রব হে অমিয়া তরঙ্গ	আলাওল	১২৪
শ্যাম কি করব তোর পিরীতে	করম আলি	১৯৬
শ্যাম আছিল তোর মনেতে	অজ্ঞাত	২০০

শ্যাম বিনে আঁধার আমার হইয়াছে বৃন্দাবন	কমর আলী	২৬৪
শ্যাম বিনে বাঁচে না আর অবলার প্রাণ	ঐ	২৬৭
শ্যাম মোর বন্ধুয়া না রে	সৈয়দ মর্তুজা	২০২
শ্যাম মোরে করিও দয়া	সৈয়দ সুলতান	৩৬৬
শ্যামের বাঁশীএ মান রবে না	অজ্ঞাত	১৩৪
শ্যামের মুরলী আকুল কৈল রে	ঐ	১২৯
শ্রীমুখ দহে বিরহ আগুনি	মোহাম্মদ হাসিম	৮০
সই দেখ রে রঙ্গ কেলি	সৈয়দ আইনুদ্দিন	৪
সই সই কহিতে খাঁধার প্রিয়ের বেভার	সিরতাজ	২০৫
সইগণ বড় অপরূপ সাজে	আলাওল	৩৪
সই বোল কি উপায়	আলাওল	২৫৬
সই বোলম মুই জীব না রে	সৈয়দ সুলতান	৫৮
সই রে কতদিন জীবনা	সৈয়দ আইনুদ্দিন	৩১২
সই সই কহিতে খাঁধার পিয়ার বেভার	সিরতাজ	৭৫
সই দেখ রে রঙ্গ কেলি	সৈয়দ আইনুদ্দিন	১৮১
সখি নাগর কানাই বিনে	সৈয়দ মর্তুজা	২১৪
সখি দেখ নাগর ব্রজরায়	অজ্ঞাত	১৫
সখি হে কি কহব হামো অবোধে	ঐ	২৭৮
সখি প্রাণি হরিয়া নিল কানাইয়া	ঐ	২১
সখি সুন্দরী ও আসুক মঙ্গলদাতা	ঐ	২৩
সখি নাগর কানাই বিনে আর জীব না	সৈয়দ মর্তুজা	৫৬
সখিগণে লয়ে সঙ্গে রাধিকা চলিলা রঙ্গে	অজ্ঞাত	৯৫
সখী সব নিদে তু জাগাই কি করিল মোরে	ঐ	২১১
সজনি সই কানু সে প্রাণ ধন মোর	মীর্জা ফয়জুল্লাহ	৫৯
সজনি বোল এমন হৈল বা কেনে	অজ্ঞাত	৮৭
সজনি সই বন্ধুয়া বোলিমু কোন্ লাজে	ঐ	৮৯
সজনি গো সই তুমি কি আমারে বোল	সৈয়দ মর্তুজা	১০৯
সজনি সই কেনে আইলুঁ যমুনার ঘাটে	অজ্ঞাত	১৬৩
সব ঋতু সঙ্গে আইল রস রঙ্গ সহিত	আফজল	২২২
সবে বলে কালা কালা আমি বলি শ্যাম	সৈয়দ মর্তুজা	৩০
সবাই বলে রাধার পরাণ কানাই	শেখ ভিখন	২০০
সহন না যায় দুঃখ সহন না যায়	এবাদুল্লা	২৬২
সহিম কত বিরহে আগুনি	মোহাম্মদ হাসিম	২৪২
সামাল কাল সাহা কাতাল ভুপাল	সৈয়দ অফজল	৩১০
সাধ নাই রে সাধ, এ ঘরের বসতি আল্লা	সৈয়দ মর্তুজা	২৮৮
সাধুর ভরারে ডুবাইলুম মনের বেহার	সৈয়দ সুলতান	২৯৩
সাঁই, এক বিনে মাওলা এক বিনে	সৈয়দ মর্তুজা	২৮৬
সাঁজ হৈল বেলা গেল প্রতি ঘরে বাতি	সৈয়দ সুলতান	২৫৮
সুন্দরী, তুমি নাগর ভুলাইতে জান	সৈয়দ মর্তুজা	৫১

সোনা বন্ধুরে ওরে আমার প্রাণের ধন	অজ্ঞাত	৮৮
সোনা বন্ধুরে আমার প্রাণ বন্ধু	চম্পা গাজী	৩১৬
সোনা বন্ধুর লাগিয়া সদায় পোড়ে হিয়া	অজ্ঞাত	৯৩
সোনা বন্ধুর এ-দেশে বসতি	সৈয়দ মর্তুজা	২৮৮
সোনা বন্ধুর কি হৈল বেয়াধি	ঐ	১৪৩
হরি মাধব হে সদায় মিনতি তুয়া পায়	অজ্ঞাত	৩৮৬
হরির অরিপতি তাহান সন্ততি	মোহাম্মদ পরাণ	১০
হরিয়া লই গেল জাতি কুল	আলি রজা	১২০
হাম ভিখারি পাঁহু পরম দেব দাতা	সৈয়দ সুলতান	২৯১
হাম নারী অভাগিনী নিদের কাতর	অজ্ঞাত	৩০৮
হামো নারী অতি হরি প্রেমের দাস	আলি রজা	৭৪
হামো নিলক্ষিণীর প্রাণ	অজ্ঞাত	৩৮২
হালিমা তুয়া বর ভাগ্য এ বিশেষ	খান গয়াস	৭
হাসিয়া বোলান দিতে আর সোনার বন্ধু	অজ্ঞাত	১০২
হাসি বুলি কণ্ঠ ধরি বাড়াই মিছা পিরীতি	বকসা আলি	১৯৫
হাহারে বন্ধুর বাঁশি চিকন ফাঁসী	আলাওল	১১৩
হায়রে মরি রে প্রেমের যন্ত্রণা	কুমর আলি	১৪৯
হৃদয়ের মাঝে মন-ভোমরা	হাসিম	৩৩৮
হের দে কালারে নয়ন ভরিয়া রূপ দেখি	রেয়াছক	১১
হের হো নিলগিরি রাজহি	সালেহ বেগ	২
হেলায় হারাইলুম বনমালী	সৈয়দ মর্তুজা	৫০